রসচিকিৎসা

Vol I

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ
মহামণ্ডলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়,
ঝাঁসী আয়ুর্ব্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় ষ্টেট ফ্যাকালটী অব
আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন এর ভূতপূর্ব পরীক্ষক, অখিল ভারতীয়
আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের সংরক্ষক সদস্য, আয়ুর্বেদ
সংশোধন ভবনের ট্রষ্টীবোর্ডের ডাইরেক্টর, নাগার্জ্জুন
সম্পাদক সভার সভ্য, আয়ুর্বেদের "নবীন যুগ"
প্রবর্ত্তক, উত্তর প্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক
তিনবার পুরস্কৃত, লুপ্তপ্রায় শুদ্ধায়ুর্ব্বেদের
পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা,

আয়ুর্ব্বেদ লেখকরত্ন, রাজবৈদ্য, প্রাণাচার্য্য, কবিরাজ,

ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়,

র্বেদ বৃহস্পতি; এম, এ, (ক্যাল) ডি, এস-সি, (জে, এ, ইউ), রসসিদ্ধ
জ্যোতির্ভূষণ, ভিষগাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক :—
শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন
১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
টেলিফোন ৩৪-৪০৩৯

মুদ্রক :—
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ পত্র

যাহাতে আমি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারি, তাহার জন্য
যিনি চিরকাল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন ও নানাপ্রকার ক্লেশ
সহ্য করিয়াছেন এবং যাঁহার আগ্রহাতিশয্য না থাকিলে
আমি কখনও বিদ্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতাম
না, ভূলোকে সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ মদীয় পরমারাধ্য
পিতৃদেব পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত রাখালরাজ**
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণাম্বুজে
মল্লিখিত **"রসচিকিৎসা"** নামক
গ্রন্থ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ
করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ইতি বিনীত

গ্রন্থকার

ওঁ তৎসৎ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

মুখবন্ধ

জগদীশ্বরের কৃপায় 'রস-চিকিৎসার' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 'রস-চিকিৎসা' বঙ্গভাষায় রচিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের এতাদৃশ পুস্তক ইতিপূর্বে কখনও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। "রস চিকিৎসা" ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। বৈদিক যুগ হইতে রস-চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধযুগে রস-বিদ্যা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-রসায়নশাস্ত্র ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবনতির চরমসীমায় আসিয়া উপনীত হয়। বড়ই সুখের বিষয় বর্ত্তমান সুধীসমাজ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুচারুরূপে শিক্ষা দিবার জন্য আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এই বিদ্যালয়গুলিতে রস বিদ্যা শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। পূর্ণাঙ্গ রসশাস্ত্র শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকও লিখিত হয় নাই। যে সকল পুস্তক বর্ত্তমান সময়ে বাজারে প্রচলিত আছে, তাহাতে রস সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই। রসচিকিৎসায় পারদ-ভস্ম সর্বপ্রধান দ্রব্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত রসগ্রন্থে পারদভস্মের শাস্ত্রীয় বিধি নিয়মিত ভাবে লিখিত হয় নাই। পারদভস্ম ব্যতিরেকে স্বর্ণ লৌহাদি

ধাতুসকল যথার্থরূপে ভস্মীভূত হয় না। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে-বর্ত্তমান সময়ে রোগিগণ ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া প্রকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন না। হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের বহুল প্রচার এবং উক্ত অভাবসকল দূর করিবার নিমিত্ত এই 'রস চিকিৎসা' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতীয় লুপ্তপ্রায় রসায়নশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাতে যাবতীয় রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কি প্রকারে সহজে পারদভস্ম, হরিতাল ভস্ম প্রভৃতি তান্ত্রিক মহৌষধগুলি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে স্বর্ণ পারদের সহিত নিঃশেষরূপে মিশ্রিত হইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। কি প্রকারে বিনা অগ্নিযোগে স্বর্ণ, রোপ্য, লৌহ, তাম্র, পিতল, কাংস্য, বঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সকলের নিরুত্থ ভস্ম হইতে পারে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে তাম্র, প্রভৃতি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় রত্নশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট বিচার প্রদান করা হইয়াছে। পারদের অষ্টাদশ সংস্কার হিন্দু-রসায়ন শাস্ত্রের পরম গৌরবের বস্তু। ইহা বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট অবিদিত। আমরা এই গ্রন্থে পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রাচীন হিন্দু-রসশালার যাবতীয় উপকরণ সমূহের বিবরণ, যন্ত্র, মূষা ও পুটের পরিচয়, রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসক, চিকিৎসার্থী ও শিক্ষার্থী সকলেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। এই পুস্তক পাঠ না করিলে হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ জানা হইবে না।

রস, উপরস, ধাতু উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষের জারণ, মারণ,

ভস্মীকরণ, দ্রাবণ ও স্বত্বপাতনের নানাপ্রকার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রণালীগুলির মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান সময়ে বহু আয়াসসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আমরা সেই সকল প্রণালীগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সহজসাধ্য প্রক্রিয়াগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা আমাদের লিখিত প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটীই হাতে কলমে করিয়াছি। সুতরাং আমাদের লিখিত নিয়মানুসারে রসক্রিয়া সম্পাদন করিলে কোন ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও ঝঞ্ঝাট ও সুখসাধ্য প্রণালীর অজ্ঞতা হেতু রসক্রিয়া সম্পাদন করিতে অর্থাৎ মকরধ্বজ, লৌহভস্ম, পারদভস্ম, হরিতালভস্ম প্রভৃতি আয়ুর্বেদোক্ত অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি অনেকে প্রস্তুত করিতে সাহসী হন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং মনে বিশেষ অশান্তি ভোগ করেন। ইহাদিগের সুবিধার জন্য আমি সহজে মকরধ্বজ ও রসসিন্দুর পাকবিধি, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, কাংস্য প্রভৃতি ধাতুসকলের ভস্মবিধি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার মত বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম সূত্রগুলি বৈদিকযুগে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সামরিক শল্য-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানানুযায়ী নগর নির্ম্মাণ, রোগবীজানুতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি প্রাচীন বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তত্ত্বগুলি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হওয়ার পর আরব দেশে প্রচারিত হয়। আরব হইতে গ্রীস্‌, গ্রীস্‌ হইতে রোম; রোম হইতে সমগ্র ইউরোপ এবং পরে পৃথিবীর চতুর্খণ্ডে উহা প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে সম্মানার্হ হইয়াছে, আয়ুর্বেদ তাহার কোন অংশে পশ্চাদ্‌পদ নহে। আয়ুর্বেদীয়

ভৈষজ্য-ভাণ্ডার, আয়ুর্বেদীয় রসচিকিৎসা জগতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অতুল্য এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রকার ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বৈদিকযুগের পর বৌদ্ধযুগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান—বিশেষতঃ রসবিদ্যা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

রসবিদ্যা ত্রিধা প্রোক্তা ধাতুবাদশ্চিকিৎসিতম্।
দুর্লভা ক্ষেমবিদ্যা চ সর্ববিদ্যাসু তা বরাঃ॥
চিকিৎসা দ্বিতয়া জ্ঞেয়া ব্যাধীনাং জরসস্তথা।
জরাব্যাধিবিনাশিনী চিকিৎসা হি রসায়নম্॥

অর্থাৎ রসবিদ্যা তিন প্রকার ক্ষেমবিদ্যা, রসচিকিৎসাও ধাতুবিদ্যা। ইহার মধ্যে রসচিকিৎসা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—রোগচিকিৎসা ও রসায়ন চিকিৎসা। বৌদ্ধযুগে রসবিদ্যার এই সকল অঙ্গই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রকারগণ পারদ লৌহ অভ্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানযুগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই সময়ে পারদের অষ্টাদশ সংস্কার আবিস্কৃত হইয়াছিল। কি প্রকারে স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্যাদি ধাতুসমূহ সহজে ভস্মীভুত হইয়া মানব শরীরের উপযোগী হইতে পারে, কি প্রকারে মরিচাবিহীন লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, কি প্রকারে মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে স্বর্ণ নিঃশেষরূপে পারদের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে, কি প্রকারে স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু সকলের বিনা অগ্নিসংযোগে নিরুত্থ ভস্ম হইতে পারে, এবং কি প্রকারে পারদ অন্যান্য ধাতু সকলকে গ্রাস করিতে পারে, তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা সকল আবিস্কৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির পর ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের

ইতিহাসে এক অন্ধকারের যুগ উপস্থিত হয় এবং অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের সর্বপ্রধান অঙ্গ রসচিকিৎসা লুপ্ত প্রায় হইয়া পড়ে (মৎপ্রণীত **"আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস"** নামক বৃহৎ পুস্তকে আমি এ বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি)। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের কোন কোন অংশে আংশিক ভাবে রসচিকিৎসা প্রচলিত থাকিলেও বিগত পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে বঙ্গদেশে রসচিকিৎসা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কবিরাজগণ রস-শাস্ত্রের যথার্থ আলোচনা করেন না। পূর্ণাঙ্গ রসশাস্ত্র শিক্ষা দিবার গুরুও দুর্ল্লভ। সকলের উপযোগী ভাল পুস্তকও লিখিত হয় নাই। যে সকল পুস্তক বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে, তাহাতে রসসংস্কার সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা করা হয় নাই। রসচিকিৎসায় পারদ ভস্মই প্রধান দ্রব্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত রসগ্রন্থে পারদ-ভস্মের শাস্ত্রীয় বিধি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্যকরূপে শোধিত পারদ এবং পারদভস্ম ব্যতিরেকে স্বর্ণ লোহাদি ধাতু সকল যথার্থরূপে ভস্মীভূত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবিরাজগণ অধিকাংশস্থলে রসচিকিৎসায় প্রকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন না। কেন না—

"লৌহানাং মারণং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং রসভস্মনা।
মূলীভির্ম্মধ্যমং প্রাহুঃ কনিষ্ঠং গন্ধকাদিভিঃ॥
অরিলৌহেন লৌহস্য মারণং দুর্গুণপ্রদম্॥"

অপরঞ্চ

পারদেন বিনা লৌহং নিহতং জ·য়েৎধ্রুবম্।
উদরে ভোক্তুঃ কীটানি রসজ্ঞানামিদং মতম্॥

অর্থাৎ সমুদায় ধাতুরই পারদভস্ম সংযোগে যে মারণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। মূলবিশেষের স্বরসাদির দ্বারা যে মারণ-ক্রিয়া

সম্পাদিত হয়, তাহা মধ্যম, আর গন্ধকাদির দ্বারা যে মারণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। যে ধাতুভস্ম পারদ ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সেবন করিলে উদরে কীট জন্মিয়া থাকে। সুতরাং রসভস্ম ব্যতিরেকে ধাতুভস্ম ব্যবহার বিড়ম্বনা মাত্র। হরিতাল-ভস্ম, পারদ-ভস্ম সম্বন্ধে দেশে নানারূপ কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে। অনেকের ধারণা যে হরিতাল ভস্ম পারদ-ভস্ম প্রস্তুত করিলে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু আমরা বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সমগ্র রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কোথাও সেরূপ নিষেধ বাণী দেখিতে পাই নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশক্ষেত্রে পারদভস্ম স্থলে রসসিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং লৌহভস্ম স্থলে লৌহ-চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং রোগিগণ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পান না। আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমি, হাইড্রোপ্যাথি ইত্যাদি নানাপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছে।

উল্লিখিত অভাবগুলি দূর করিবার জন্যই রসচিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় রসচিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ এবং প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেণীর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সর্ব্ব প্রধান উপজীব্য।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

অল্পমাত্রোপযোজ্যত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্যদায়িত্বাদোষধিভ্যোঽধিকো রসঃ॥
অসাধ্যা ব্যাধি যা প্রোক্তা ঔধধিভিশ্চিকিৎসয়া।
সাধ্যা সা প্রায়শো দৃষ্টা রসচিকিৎসনেন হি॥
উপরসং লৃহং বিষং সম্ভূতং রস উচ্যতে।
রসাৎ পরতরং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভেষমম্।

অর্থাৎ রস সেবনে অরুচির সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প মাত্রায় সেবনে অতি অল্পকাল মধ্যে অধিক ফল পাওয় যায় এবং অন্যান্য সকল প্রকার চিকিৎসা দ্বারা অসাধ্য রোগ সকল রস চিকিৎসা দ্বারা সত্বর বিনষ্ট হয় বলিয়া রসচিকিৎসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(ক) রসৌষধি সকল খুব অল্প জায়গায় অধিক রাখা চলে।

(খ) তাহাদের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব কম।

(গ) যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল ঔষধের অপচয় হইবার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা রসৌষধি যতই পুরাতন হয়, ততই অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

(ঘ) রসৌষধি সেবনে অনুপানের হাঙ্গামা খুব কম।

(ঙ) রসৌষধির প্রয়োগ ব্যর্থতা অতি অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়।

(চ) রসৌষধি, তৈল, ঘৃত, জীব, জন্তু ও গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ অপেক্ষা অধিক শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

(ছ) রসৌষধি সকল প্রস্তুত করিতে বিশেষ হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না।

(জ) ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক লোকের ও স্থানের প্রয়োজন হয় না এবং সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা চলে।

(ঝ) রসচিকিৎসায় দোষের সাম্য, নিরাময়তা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল, ইহাদের কিছুই বিচার আবশ্যক করে না।

(ঞ) গাছগাছড়ার দ্বারা রোগ চিকিৎসায়, প্রত্যহই প্রভূত পরিমাণে গাছগাছড়ার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অধিকাংশ-ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। রসচিকিৎসা-ক্ষেত্রে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন দ্রব্যের অভাব নাই। রস-চিকিৎসার সকল উপকরণ সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তজ্জন্য রসচিকিৎসা অবলম্বনই বর্ত্তমানে সর্ব-বিষয়ে বাঞ্ছনীয়।

(ট) বর্ত্তমানে পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিনের যুগে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে স্ফীত বক্ষে দণ্ডায়মান হইবার পক্ষে রসচিকিৎসাই প্রধান সহায়ক।

রসচিকিৎসার তৃতীয় সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সমগ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের একটী প্রামাণ্য ইতিহাস সংযোজিত হইয়াছে। ইতি

পূর্বে বঙ্গভাষায় আয়ুর্বেদীয় সাহিত্যের এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর - বিরাট ইতিহাস একটি চিকিৎসা গ্রন্থের ভূমিকা রূপে লিখিত হয় নাই।

উপসংহারে গুণগ্রাহী সুধীগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমার কার্য্যবাহুল্য ও সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটী থাকা সম্ভব। সেইজন্য সকলের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকালে এই গ্রন্থের যে স্থানে ত্রুটী বা দোষপরিলক্ষিত হইবে, আমার নিকট জানাইলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত উহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। এই পুস্তকখানি রসচিকিৎসার বহুল প্রচারকল্পে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই ভূমিকার পাণ্ডুলিপি নির্ম্মান কল্পে আমার ঔষধালয়ের চারজন কর্ম্মচারী শ্রীমান সুনীলকুমার দাস, শ্রীমান অভয়পদ চক্রবর্তী, শ্রীমান মধুসূদন সেন ও শ্রীমান তারকেশ্বর ত্রিবেদী প্রভৃত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। প্রতিভা আর্ট প্রেসের সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় দক্ষতার সহিত রসচিকিৎসার তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার অকৃত্রিম সুহৃদ ও সতীর্থ কবিরাজ ডক্টর শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাংশ পাঠ করিয়া সর্ব্বদা আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার পুত্রোপম স্নেহভাজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র শ্রীমান পীযূষকান্তি মজুমদার, এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে আমাকে সহায়তা করায় আমি তাহাকে আন্তরিক আশীর্বাদ করিতেছি। ইতি

১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২
১৩৬৬ সাল ১৩ই আশ্বিন

বিনীত
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত রসগ্রন্থের ইতিহাস

বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় যে সকল রসগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বিবরণ প্রদান করিতেছি। বটতলার প্রিণ্টারগণই বঙ্গদেশে উনবিংশতি শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে অনেক হিন্দুশাস্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ছাপান খারাপ, কাগজ খারাপ, প্রুফ সংশোধন ব্যবস্থা খারাপ, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও আমরা বটতলার প্রেসের মালিকগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বটতলার প্রেসে একশত বৎসর পূর্ব্বে রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসরত্নাকর, রসেন্দ্রচিন্তামণি, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ভাবপ্রকাশ প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভাব প্রকাশান্তর্গত রসচিকিৎসার বিষয়গুলি লোকে জানিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সি, কে সেন এণ্ড কোং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ ও রসরত্নসমুচ্চয় প্রকাশিত করেন। কিন্তু রসরত্নসমুচ্চয়কে কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ কবিরাজগণ, গ্রহণ করেন নাই বা সুলিখিত টীকার অভাবে উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কালক্রমে শুদ্ধায়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রয়োগের অভাবে এবং রাজকীয় প্রভূত সাহায্যপুষ্ট এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল প্রচারের জন্য বটতলার পুস্তকগুলি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। সি. কে. সেন এণ্ড কোং দ্বারাও কেবল মাত্র রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ছাড়া রসরত্নসমুচ্চয়েরও আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। এশিয়াটিক সোসাইটী সিদ্ধ নাগার্জ্জুন কৃত রসার্ণব মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাও আর পুনর্বার মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র রসেন্দ্রসারসংগ্রহ ছাড়া রসশাস্ত্রের সহস্রাধিক প্রমাণ্য গ্রন্থের একখানিও বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মুদ্রিত হয় নাই।

আত্রেয় সম্প্রদায় ভুক্ত চিকিৎসকগণের প্রাধান্য হেতু রসচিকিৎসা

বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করে নাই। কেবল মাত্র বাঙ্গালী কবিরাজ শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত রসেন্দ্রসারসংগ্রহ অমাবস্যার অন্ধকারে ক্ষীণালোক প্রদীপের সল্‌তের ন্যায় টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল। এইরূপ সময়ে আধুনিক বঙ্গের একমাত্র রসসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক রসচিকিৎসা নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমগ্র ভারতের তথা সিংহল ও ব্রহ্ম দেশের সহস্রাধিক সিদ্ধবৈদ্য প্রকাশিত যাবতীয় রসগ্রন্থ মন্থন করিয়া রসচিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে এমন কোন রস গ্রন্থ নাই, যাহাতে রসশাস্ত্রের শিক্ষণীয় বিষয়-গুলি এইরূপ সুসম্বদ্ধ ভাবে লিখিত হইয়াছে। কেবল মাত্র রসচিকিৎসা পাঠ করিলেই যে কোন চিকিৎসক, ছাত্র, ও শিক্ষক আয়ুর্ব্বেদীয় রসবিদ্যায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের সদম্ভোক্তি নহে। পরন্তু নিছক সত্য কথা। পাঠক বাজারে প্রাপ্তব্য ও প্রকাশিত যে কোন রসগ্রন্থ খুলিয়া দেখুন এবং তাহার সঙ্গে রসচিকিৎসা মিলাইয়া দেখুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন এই উক্তি যথার্থ কিনা! রসচিকিৎসার এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-বৈদ্যর লিখিত গ্রন্থ নহে বলিয়া বঙ্গদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য তালিকায়, এই পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহাতে লেখকের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ এই পুস্তকের হিন্দি সংস্করণ ইউ. পি. গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছে এবং বিগত দুই সংস্করণে পাঁচ সহস্রাধিক কপি বিক্রি হইয়াছে। কেবলমাত্র বঙ্গীয় বৈদ্যগণ নামে মাত্র স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করিয়া গুণগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে গুণ গ্রাহক না থাকিলে গুণীর অভ্যুদয় হইতে পারে না।

"গুণবানপি সম্পন্নঃ কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
যদি ভারসহো ন স্যাৎ তদগুণগ্রাহকোঽপরঃ॥"

বঙ্গবাসী বহুদিন হইতে তাহার গুণ গ্রহণ প্রবৃত্তির অনুশীলন বন্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে বঙ্গ দেশে আর গুণীর অভ্যুদয় হইতেছে না। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে রসচিকিৎসা ক্ষেত্রে বঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক রস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র "রসচিকিৎসা" ছাড়া আর কোন পূর্ণাঙ্গ রসচিকিৎসা গ্রন্থ বঙ্গ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গদেশে প্রচলিত "রসেন্দ্রসার সংগ্রহের" সহিত পণ্ডিতগণ "রস-চিকিৎসার" তুলনা করুণ এবং বিচার করুণ। বিচারে যদি "রসচিকিৎসা" শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকাশকের কোন ক্ষোভ নাই। কিন্তু বিচারে সর্বদিক দিয়া যদি "রসচিকিৎসার" শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে "রসচিকিৎসা" কেন গ্রাহ্য হইবে না?

আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ সূত্রকার বাগভট্টাচার্য্য অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক মহাগ্রন্থ লিখিয়া, তিনি ঋষি নহেন বলিয়া লোকে যদি তাঁহার গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করেন এই ভয়ে লিখিয়াছিলেন :—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ
ভেড়াদ্যা কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্‌গ্রাহ্যং সুভাষিতম্"

ঋষি প্রণীত বলিয়া যদি গ্রন্থ পঠিতব্য হয়, তবে লোকে ভেলাদির গ্রন্থ কেন পড়ে না? তাহার কারণ ঐ গুলি সুভাষিত বা সুলিখিত নহে। কিন্তু তাঁহার লেখা গ্রন্থ সুলিখিত এবং সুভাষিত, সেই জন্য লোকের নিশ্চয়ই উহার আদর করা কর্ত্তব্য। বাগভট্টের সদম্ভোক্তি মিথ্যা হয় নাই। আধুনিক আয়ুর্বেদ জগতে বাগভট্ট ঋষি না হইয়াও—শ্রেষ্ঠ সূত্রকার রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি :—

নিদানে মাধব শ্রেষ্ঠঃ সূত্রস্থানে চ বাগভটঃ।
শারীরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তঃ চরকস্তু চিকিৎসিতে ॥"

আমরা আশা করি যে রসসিদ্ধ কবিরাজ ডাঃ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় কৃত "রসচিকিৎসা" নামক মহাগ্রন্থ কালজয়ী হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসগ্রন্থ রূপে

পরিগণিত হইবে। এই সম্পর্কে একজন বিজ্ঞ সমালোচকের অভিমতের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

"বঙ্গদেশে বিগত ত্রিশ বৎসরের রসচিকিৎসার যুগ কে "প্রভাকর যুগ" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তল্লিখিত পুস্তক সমূহই উদীয়মান বঙ্গীয় চিকিৎসক বৃন্দের একমাত্র উপজীব্য।"

কোনএকটি গ্রন্থকে কালজয়ী হইতে হইলে তাহার নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ থাকার প্রয়োজন।

১) গ্রন্থলিখিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, গাম্ভীর্য্য ও সার্ব্বজনীনত্ব।

২) বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট করিবার সুচিন্তিত প্রণালী।

৩) শ্রুতি সুখকর শব্দ সমূহের প্রয়োগ এবং শ্রুতি কটুকর শব্দ সমূহের অপ্রয়োগ।

৪) যাহা পুনরুক্তি দোষ বর্জ্জিত অথচ সম্পূর্ণার্থ প্রকাশক।

৫) যাহা আপ্ত ও শিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুমোদিত।

৬) সকল শ্রেণীর চিকিৎসক, শিক্ষক, ছাত্র ও পাঠকের সুখ পাঠ্য ও সুখবোধ জনক।

৭) বক্তব্য বিষয় সমূহ সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ভাবে সজ্জিত ও কথিত।

৮) লিখিত বিষয় সমূহের সর্বব্যাপিত্ব, ও সার্বজনীন প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইলে এবং ঐগুলির সুচিন্তিত ব্যাখ্যা সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত হইয়া দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের হৃদয় জয় করিতে পারিলে, তবে উহা কালজয়ী হইয়া থাকে।

রসচিকিৎসার প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ বৈজ্ঞানিক হইলেও উহা উল্লিখিত গুণগুলির দ্বারা সংযোজিত। সেই জন্য "রসচিকিৎসা" কালজয়ী হইবে বলিয়া আশা করি। অলমিতি বিস্তরেণ।

বিনীত প্রকাশক
শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওঁ তৎসৎ

ওঁ নমো গণেশায়

রসচিকিৎসার ভূমিকা

"সুদুর্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ"

রসচিকিৎসার প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা। প্রজা উৎপাদন করিবার পূর্বে তিনি লক্ষ শ্লোকময়ী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রসচিকিৎসা তাহার অঙ্গীভূত ছিল। তৎকৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অতি বৃহৎ ছিল। সেই জন্য তৎসৃষ্ট প্রজাগণের সুখবোধের নিমিত্ত প্রাগ্‌বৈদিক যুগে তিনি আয়ুর্বেদের অঙ্গবিভাগ করেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ বিভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া আয়ুর্বিদ্যার বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভাস্কর ও দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। তাহার পর দক্ষ প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রকে আয়ুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে আয়ুর হিত এবং অহিত বিষয়ক জ্ঞানলাভ করা যায় এবং তাহার দ্বারা শারীর এবং মানস ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া নীরোগ, দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, তাহাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে। প্রাগ্বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবতা ও ঋষিগণ আয়ুর্বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভাস্কর, দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, অগ্নি, রুদ্র, বরুণ, যম, প্রভৃতি দেবগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং আয়ুর্বেদ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

রসচিকিৎসার আদিজ্ঞাতা ব্রহ্মা, আদি বক্তা মহেশ্বর এবং শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে শিক্ষা দিয়া-

ছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে রসবিদ্যা আনয়ন করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে সমগ্র আর্য্যাবর্তের দ্বিতীয় ঋষিমহাসম্মেলনে রসবিদ্যা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঋষি সম্মেলনে পঞ্চাশজনেরও অধিক ঋষি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন এবং তপপ্রভাবে হুয়মান অগ্নির ন্থায় দীপ্তিমান ছিলেন। ভরদ্বাজ ঋষিসংঘে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ আপন আপন প্রতিভা অনুসারে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিয়য় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি, আত্রেয় পুনর্বসু কায়চিকিৎসা সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় আত্রেয় সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। রসচিকিৎসা কায়চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত হইলেও পুনর্বসু আত্রেয়, রসশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন নাই। যেমন একটি বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করেন, শিক্ষক মহাশয় বহু বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, তথাপি সকল ছাত্র সকল বিষয়ে সমভাবে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন না। ছাত্রগণ নিজ নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধি অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু গুলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেইরূপে মহর্ষি আত্রেয় বনস্পতিজাত ভেষজ দ্রব্য দ্বারা যে কায়চিকিৎসা পদ্ধতি মহর্ষি ভরদ্বাজের সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ছয়জন শিষ্যকে যথা অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীতকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছয় জনেই নিজ নামে প্রত্যেকে একখানি করিয়া সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যথা:—অগ্নিবেশ সংহিতা, ভেল-সংহিতা, জাতুকর্ণ সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ক্ষারপাণি সংহিতা ও হারীত সংহিতা।

আত্রের শিষ্য অগ্নিবেশ তাঁহার ছয় শিষ্যের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধিমান

ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার স্বনামে রচিত অগ্নিবেশ সংহিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

আত্রেয় সম্প্রদায়

মহর্ষি-আত্রেয় প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের নাম আত্রের সম্প্রদায়। মহর্ষি আত্রেয় এই সম্প্রদায়ের প্রধান চিকিৎসক। তাঁহার ছয়জন শিষ্য লিখিত ৬টি গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) **অগ্নিবেশ সংহিতা**: ইহা বাগভট্, ডল্বণ, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, চক্রপাণি এমন কি শিবদাস সেনের সময়েও বর্ত্তমান ছিল, কারণ ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অগ্নিবেশ সংহিতা হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

(২) **ভেল সংহিতা**:—এই সংহিতার অপর নাম ভালুকিতন্ত্র। বহুকাল যাবৎ ইহা তাঞ্জোর লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। স্যার আশুতোষের অনুপ্রেরণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা ছাপাইয়াছেন। হর্ণেলি সাহেবের মতে ভেল গান্ধার প্রদেশের লোক ছিলেন। অষ্টাঙ্গ হৃদয়কার ভেলসংহিতা হইতে বহুশঃ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

(৩, ৪, ৫) **জাতূকর্ণ, পরাশর ও ক্ষারপাণি সংহিতা**:—বর্ত্তমানে দুর্লভ। বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ ও শিবদাস সেন জাতূকর্ণ, পরাশর ও ক্ষারপাণি সংহিতা হইতে যথেষ্ঠ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং সুধীসমাজে তৎকালে ঐ সকল তন্ত্রের পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল।

(৬) **হারীত সংহিতা**:—পুরাতন আসল হারীত সংহিতা দুর্লভ। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে কবিরাজ কালীশচন্দ্র সেন ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের দ্বারা যে হারীত সংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অগ্নিবেশ শিষ্য হারীত প্রণীত বলিয়া মনে হয় না। ইহা কোন নিতান্ত অর্বাচীন

লোকের জীর্ণ হারীত সংহিতা অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ। পূর্বে বলিয়াছি আত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহর্ষি আত্রেয়র ছয়জন শিষ্য প্রণীত ছয় খানি তন্ত্রের মধ্যে অগ্নিবেশ তন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে এই অগ্নিবেশ সংহিতার অনেক অংশ নষ্ট হইয়াছিল। তদানীন্তন কালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, গ্রন্থগুলি হয় তুলোট কাগজে, না হয় ভূর্জ্জ পত্রে, না হয় তালপত্রে লিখিত হইত। গ্রন্থকর্ত্তার জীবিতকালে এইগুলি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও তাঁহার দেহান্তর হইলে যদি তাঁহার বংশধর কিংবা শিষ্যগণের সেই গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে উহা কিছুদিন সযত্নে রক্ষিত হইত, তৎপরে অযোগ্য বংশধরও শিষ্যেরা হস্তে পড়িলে যত্নাভাবে উহার কতক অংশ বা কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র গ্রন্থই নষ্ট হইয়া যাইত। অগ্নিবেশ সংহিতা সত্যযুগের শেষ অংশে লিখিত হইয়াছিল। সত্য যুগের অন্তে ইহার বহু অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে মহর্ষি পতঞ্জলি ইহার প্রতি সংস্কার করেন। যখন কোন গ্রন্থ প্রতিসংস্কৃত হয় তখন তাহার বহুল অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে মহাত্মা দৃঢ়বল বলিয়াছেন—

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতিবিস্তরম্
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্ণবম্,"

অর্থাৎ প্রতিসংস্কর্ত্তা গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্তের বিস্তার করেন, অতি বিস্তর বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করেন, অন্যকথায় বলিতে গেলে প্রতিসংস্কর্ত্তা পুরাতন গ্রন্থকে নূতন করিয়া নির্ম্মান করেন। কালক্রমে পতঞ্জলি প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতা বিনষ্ট হয়, উহার মধ্যে চিকিৎসিত স্থানের ১৭ অধ্যায় এবং সিদ্ধি ও কল্পস্থানের ২৪ অধ্যায় পাওয়া যায় না, অর্থাৎ পতঞ্জলি বা চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ তন্ত্রের শেষ ৪১ অধ্যায় চরক রচিত নহে।

ইহা পঞ্চনদপুর নিবাসী কপিলবল পুত্র দৃঢ়বল দ্বারা রচিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে অগ্নিবেশ সংহিতার নাম চরক সংহিতা কিরূপে হইল ? এবং এই চরক কে ছিলেন ? অনেকের ধারণা মহর্ষি পতঞ্জলিই চরক। আবার ভাবপ্রকাশের মতে আর্য্যাবর্ত্তের জীবগণের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখিয়া অহিপতি শেষ নাগ চরকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চরক সংহিতার প্রথম প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এইজন্য অগ্নিবেশ সংহিতা চরক সংহিতা নামে পরিচিত হইয়াছে। কালক্রমে চরকসংহিতার উক্ত অংশগুলি নষ্ট হইলে দৃঢ়বল উহার পুনরায় প্রতিসংস্কার করেন, এবং বর্ত্তমানে বাজারে যে চরকসংহিতা আমরা দেখিতে পাই তাহা অগ্নিবেশ লিখিত, চরক প্রতিসংস্কৃত এবং দৃঢ়বল পরিপূরিত সংহিতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং আদি ও অখণ্ড চরকসংহিতা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার সৌভাগ্য বর্ত্তমান ভারতবাসীর কখনও হইবে না। চরক সংহিতার মত সর্বতথ্য সমন্বিত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।

ইহার পংক্তি সংখ্যা ২৫০১৭ (পঁচিশ হাজার চৌদ্দ) চরক লিখিত বৃত্তি সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ)। চরকের স্থান সংখ্যা ৮টী, অধ্যায় সংখ্যা ১২০টী, এবং শব্দ সংখ্যা একলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চৌষট্টি (১,৫৬,০৬৪)। চরকের টীকাকর্ত্তৃগণের সংখ্যা ৪৩ (তেতাল্লিশ) জন। ভারতের ১৭টী প্রধান ভাষায় চরক সংহিতার অনুবাদ আছে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল ভাষায় চরকের অনুবাদ হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আরবী, ফার্সী, মিশরীয়, তিব্বতী, ভাষায় চরকের অনুবাদ হইয়াছিল। মানুষের মনের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ সকলের মধ্যে একমাত্র মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর সহিত চরক সংহিতার তুলনা হইতে পারে। ইহাতে চিকিৎসার বিষয় বস্তু গুলি ছাড়া

মানব মনের শাশ্বত আকাঙ্খার সকল বিষয়গুলি সুবিন্যস্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং কিরূপে ন্যায় ধর্মানুযায়ী জীবন যাত্রা নির্বাহ করিলে মানুষ সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং মোক্ষ লাভ করিয়া মনুষ্য জীবন সফল করিতে পারে, তাহার পূর্ণ বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্য ও তর্কশাস্ত্রের আদিকথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ষড়দর্শনের সার কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে অতি নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। পরন্তু ইহাতে বহু অভিজ্ঞ পরহিত চিন্তক ঋষিবৃন্দের সুচিন্তিত শাশ্বত সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসা গ্রন্থ হিসাবে চরক সংহিতা অদ্যাপি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞাতৃগণের মধ্যে মাধব, বাগভট্ট, সুশ্রুত ও চরক যে যথাক্রমে নিদান, চিকিৎসা সূত্র, শারীর বিদ্যা ও চিকিৎস শাস্ত্রে অদ্যাপি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্বর্থ। বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই যে, অদ্যাপি আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ চরক সংহিতার এই বিরাট স্বরূপের বিষয় অবগত নহেন, নতুবা স্বাধীনতা লাভের পরও তাঁহারা তাঁহাদের পরিচালিত ভারতের তিনটী বৃহৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের ফ্যাকালটী খুলিতে বদ্ধপরিকর হইতেন। ব্রিটীশ স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবায়ুর্বেদের স্থান হইয়াছে কিন্তু মনুষ্যায়ুর্বেদের স্থান হয় নাই।

চরকের ৪৩ জন টীকাকর্তৃগণের মধ্যে বহুব্যক্তির টীকা কালার্ক ভক্ষিত হইয়া দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সহস্রাধিক বর্ষকাল রাজাশ্রয় চ্যুত হইয়া আয়ুর্বেদের ন্যায় একটি সামাজিক সুকুমার কলাবিদ্যা এখনও স্বদেশে পরবাসী হইয়া কায়ক্লেশে কাতরে কাল যাপন করিতেছে। (১) ঈশান

দেব (২) শ্রীহরি চন্দ্র, (৩) ব্যাপ্য চন্দ্র (৪) বকুল কর (৫) ভীম দত্ত (৬) ঈশ্বর সেন (৭) নরদত্ত (৮) জিন দাস (৯) জেজ্জড় (১০) গুণাকর (১১) ভট্টার হরিশচন্দ্র (১২) চক্রপাণি (১৩) শিব-দাস (১৪) গঙ্গাধর (১৫) যোগীন্দ্রনাথ সেন (১৬) জ্যোতিষ চন্দ্র সরস্বতী (১৭) শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের চরকের টীকা বর্ত্তমানে সময়েও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে C.K. Sen & Co চক্রপাণি ও গঙ্গাধরের টীকা প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্তব্য টীকাগুলি যদি ছাপা হয়, তাহা হইলে চরক সংহিতার মর্ম গ্রহণ অতি সহজ হইবে। কিন্তু ইহা কোন একজন পণ্ডিত অধ্যাপকের সাধ্যের বাহিরে। রাজ সাহায্য ব্যতীত লক্ষাধিক পংক্তি বিশিষ্ট চরকটীকা ছাপান কোন একজন দরিদ্র আয়ুর্ব্বেদ সেবীর সাধ্যায়ত্ত নহে।

বাগভট্ট—আত্রেয় সম্প্রদায়ান্তর্গত অপর গ্রন্থকর্ত্তৃগণের মধ্যে বাগভট্টের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাগভট্ট সিন্ধুদেশবাসী ও সিংহ গুপ্তের পুত্র। আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রন্থকর্ত্তৃগণের মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি চরক ও সুশ্রুত উভয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং স্বলিখিত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ নামক প্রথম গ্রন্থে উভয় গ্রন্থ লিখিত মতবাদ গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে কায় চিকিৎসা গ্রন্থ। বাগভট্ট লিখিয়াছেন: "সংগৃহীতং বিশেষেণ যত্র কায়চিকিৎসিতম্" অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ লেখার বহুদিবস পরে বাগভট্ট "অষ্টাঙ্গ হৃদয়" নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এইরূপ সুলিখিত গ্রন্থ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিরল। এই গ্রন্থ প্রভাবে বাগভট্ট "সূত্রস্থানেচ বাগভট্টঃ" এই চিরস্মরণীয় আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বাগভটের অপর গ্রন্থের নাম "রসরত্ন সমুচ্চয়" ইহা রসগ্রন্থসকলের মধ্যে কৌস্তুভ স্বরূপ। পাশ্চাত্য—প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব গণের মতে তিন জন বাগভট্ট ছিলেন।

তাঁহারা অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের লেখককে প্রথম বা বৃদ্ধ বাগভট্ট (Bagbhat the senior) এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়ের লেখককে দ্বিতীয় বাগভট বা (Bagbhat the Junior) বলেন এবং রসরত্ন সমুচ্চয়ের লেখককে তৃতীয় বাগভট্ বলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইহা যুক্তি গ্রাহ্য নহে। উল্লিখিত তিন খানি গ্রন্থের ভিতরে এরূপও প্রমান সমুহ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে বাগভট্ প্রকৃত পক্ষে একজনই ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব গণের এইরূপ মতবাদ প্রচারের কারণ স্বরূপ ইহা বলাই যথেষ্ট যে আয়ুর্বেদের মত সূত্রমুলক একখানি পারিভাষিক গ্রন্থের মুল সূত্রগুলির অসম্যক উপলব্ধিই এইরূপ মতবাদ প্রকাশের একমাত্র হেতু।

গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে আমরা বাগভট্ লিখিত তিনখানি গ্রন্থের অভ্যন্তরস্থিত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। মতবাদগুলির বিভিন্নতা যে ব্যক্তি বিশেষই সম্ভব তাহা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে লিখিত প্রথম রচনা বলী পাঠ করার পর তাঁহার শান্তিনিকেতন স্থিত মধ্যজীবনের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর রচনাগুলি পাঠ করিয়া যদি কোন বৈদেশিক পণ্ডিত তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ও রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা যেমন ঠিক হইবে না, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের লেখককে দ্বিতীয় বাগভট্ট বলা সমীচীন নহে। "ভবতিবিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" এই কবি বচনানুসারে মতবাদ ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ ও বিবর্ত্তন মানব মনের স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহার ফলে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র তল্লিখিত কৃষ্ণ চরিত্রের প্রথম সংস্করণে গোপীবল্লভ যশোদা দুলাল শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে স্বকীয় ভুল

সংশোধন করতঃ গোপাল কৃষ্ণকে "ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো বিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্" রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ যদি সর্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বিবর্জিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের আর্য্যকীর্ত্তি বিষয়ে তথাকথিত মতবাদগুলি বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা তিনটি বাভট, দুইটি সুশ্রুত ও বহু চরকের কথা বিস্মৃত হইবেন।

বাগভট্ট একাধারে তিন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, যথা আত্রেয় সম্প্রদায়, ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায় এবং রসসিদ্ধ সম্প্রদায়। আমাদের দেশে যেমন চরক ও সুশ্রুত সংহিতার প্রচার ও প্রভাবাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দাক্ষিণাত্যে বাগভট্টকৃত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের প্রচারাধিক্যদৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সৌরাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে বাগভট্ট সিদ্ধি চরক নামে বিখ্যাত। বাগভটের অষ্টাঙ্গ হৃদয় বাস্তবিকই অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদের হৃদয় স্বরূপ। ইহাতে চরক সুশ্রুতের জটীল বিষয়-গুলি অতিশয় সহজ ও সরল ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ সুভাষিত গ্রন্থ বৈদ্যশাস্ত্রে বিরল। বাগভটের অনেকগুলি টীকাকারের মধ্যে মৃগাঙ্ক পুত্র **অরুণ দত্ত, চন্দনন্দন, হেমাদ্রি** ও **ইন্দুর** নাম উল্লেখ যোগ্য।

মাধব কর—বাগভটের পর আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদীয় লেখকের নাম **মাধব**। মাধব প্রণীত রোগবিনিশ্চয় আয়ুর্বেদের সর্বোৎকৃষ্ট নিদান গ্রন্থ। তল্লিখিত গ্রন্থ মাধব নিদান নামে জনসমাজে বিখ্যাত। কেবল এই একখানিই গ্রন্থই মাধবকে চিকিৎসক সমাজে চির-স্মরণীয় করিয়াছে। **"নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ"** এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অন্বর্থ মাধবের দুইজন প্রধান টীকাকার (১) মহামহোপাধ্যায় **বিজয় রক্ষিত** ও (২) **শ্রীকণ্ঠ দত্ত** ব্যাখ্যা মধুকোষ নামক মাধব নিদানের উপর অতি

উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক টীকা লিখিয়া সমগ্র নিদান শাস্ত্রকে ছাত্র সমাজে সহজ বোধ্য করিয়াছিলেন। যদিও মাধব নিদান একখানি সংগ্রহ পুস্তক তথাপি ইহাতে স্বাধীন চিন্তা, ভূয়োদর্শন এবং অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় আছে।

মাধবের পর আত্রেয় সম্প্রদায়ের অপর উল্লেখযোগ্য লেখক বৃন্দ কুণ্ড। বৃন্দ কেবল সংগ্রহকার মাত্র ছিলেন না। তিনি চিকিৎসা জগতে অনেক স্বাধীন চিন্তা করিয়াছিলেন। তৎকৃত বিখ্যাত পুস্তক "সিদ্ধযোগে" তিনি নিজের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত বহু সিদ্ধযোগ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে চক্রদত্ত সংহিতা বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের নামান্তর মাত্র। চরক, সুশ্রুত ও বাগভটে অমুক্ত অথচ বৃন্দকর্ত্তৃক উক্ত এরূপ ২৫টী বিখ্যাত সিদ্ধ ঔষধ বৃন্দ স্বীয় সিদ্ধযোগ নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ঠ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবৈদ্যগণের মতে বৃন্দ স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন। ইহা "বৃন্দটিপ্পনী" নামে বিখ্যাত। সিদ্ধযোগের টীকার নাম "ব্যাখ্যা কুসুমাবলী।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত ইহার রচয়িতা। বঙ্গদেশে বৃন্দকুণ্ডের গ্রন্থের আদর হয় নাই। সিদ্ধযোগ বঙ্গে প্রায় অজ্ঞাত। ইহার প্রধান কারণ বৃন্দ বৈদ্যবংশসম্ভূত ছিলেন না। তিনি অখণ্ড বঙ্গান্তর্গত চট্টল নিবাসী বিখ্যাত কুণ্ড বংশোদ্ভব ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। একজন ভাল কবিরাজও হইয়াছেন। বৃন্দ তাঁহার বিখ্যাত সিদ্ধযোগ সংগ্রহে পারদের ব্যবহার করে নাই। বাগভটের সময় হইতে বাহুল্যরূপে পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইলেও বৃন্দ আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র লৌহমণ্ডুরের ব্যবহার ছাড়া সিদ্ধযোগ সংগ্রহে পারদগন্ধকাদি অন্য ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতে সাহসী হন নাই। অর্থাৎ বৃন্দের সময় পর্যন্ত আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত কবিরাজ

গণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে রসচিকিৎসা অপ্রচলিত ছিল। বৃন্দকুণ্ড মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণির পূর্ববর্ত্তী ছিলেন।

চক্রপাণি :—কায়চিকিৎসা সম্প্রদায় ভুক্ত চিকিৎসকগণের চক্রপাণি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বহুকারণে ইহার নাম জগৎবিখ্যাত হইয়াছে। ( ) প্রথম কারণ ইনি অতি উচ্চ বংশ সম্ভূত ছিলেম। (২) দ্বিতীয় কারণ সংস্কৃত ভাষায় ইহার অসাধারণ বুৎপত্তি (৩) তৃতীয় কারণ ইঁার চরক ও সুশ্রুতের উপর দুইটী জগৎবিখ্যাত টীকা। চরকের উপর আয়ুর্বেদ দীপিকা এবং সুশ্রুতের উপর ভানুমতী (৪) চতুর্থ কারণ তৎকৃত স্বনামে চক্রসংগ্রহ নামক জগৎবিখ্যাত পুস্তক এবং আরও অনেকগুলি গ্রন্থ। (৫) পঞ্চম কারণ গুণগ্রাহী উদার হৃদয়। চক্রপাণি স্ব সংগ্রহে রসপর্পটিকা তাম্রযোগ প্রভৃতি রসচিকিৎসার কয়েকটী প্রধান প্রধান ঔষধ সন্নিবিষ্ট করিয়া রসোপরসাদি ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহারে পরবর্ত্তী সংগ্রহকারগণকে প্রোৎসাহিত করতঃ আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত কায়চিকিৎসকগণের লৌহ প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পাছে লোকে প্রক্ষিপ্ত মনে করে, এইজন্য তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে "রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা" অর্থাৎ চক্রপাণি নিজেই সজ্ঞানে ইহা স্বসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। (৬) ষষ্ঠ কারণ একমাত্র গঙ্গাধর ছাড়া চক্রপাণির পরবর্ত্তী আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসকগণ সকলেরই অবাধে রসৌষধি ব্যবহারে মনোনিবেশ করেন। রসচিকিৎসার গৌরব যখন দেশব্যাপী, রসচিকিৎসা যখন গৃহে গৃহে আদৃত, সেই সময়ে চরকের বিখ্যাত "জল্পকল্পতরু" টীকাকার কবিরাজ গঙ্গাধর রায় রসসম্বলিত ভেষজ দাতাকে "বড়ে কবিরাজ" বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় কায় চিকিৎসকগণের বেড়াজাল কতদূর দৃঢ় ছিল।

চক্রদত্ত সংগ্রহ বঙ্গে সুপ্রচলিত এবং বিশেষ ভাবে আদৃত। কিন্তু

ইহা সম্পূর্ণরূপে বৃন্দের **সিদ্ধযোগ সংগ্রহ** অবলম্বনে লিখিত। চক্রপাণি কেবলমাত্র বৃন্দের সিদ্ধযোগের সহিত নিজের বাছা বাছা কতগুলি সিদ্ধ যোগ সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বনামে চক্রদত্ত সংগ্রহ সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

চক্রদত্ত আপনার এই দুর্বলতার বিষয়ে সর্বদা সজাগ ছিলেন। তজ্জন্য উভয় গ্রন্থ উপাদেয়তায়তুল্য হইলে, প্রাচীনত্ব হেতু বৃন্দকৃত গ্রন্থের অধিক আদর হইলে স্বকীয় গ্রন্থের লোপাপত্তি ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থের উপসংহারের প্রক্ষেপ্তা ও উর্দ্ধতা উভয়কেই শাপ দিয়া লিখিয়াছিলেন :—"যে চক্রসংগ্রহ হইতে যদি কেহ কোন শ্লোক উদ্ধৃত করেন, কিংবা উহাতে নূতন কিছু প্রক্ষেপ করেন, তাহা হইলে উভয়ের মস্তকের উপরে ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভিশাপ পতিত হইবে।" চক্রের অভিশাপ প্রদান নিস্ফল হয় নাই। তাঁহার অভিশাপ দেখিয়া মনে হয় যে তৎকালে বৈদ্যসমাজে অন্যকৃত সংগ্রহে কিঞ্চিৎ যোগ বিয়োগ করিয়া নূতন সংগ্রহ গ্রন্থ প্রচারের বাসনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। চক্রের শাপ প্রভাবে কেবল তাঁহার স্বজাতীয় বৈদ্য ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রণেতা গোবিন্দ দাস সেন্ ছাড়া অন্য কেহ তাহার গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ যোগের উপাদান সংগ্রহ করেন নাই।

চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ দত্ত। ইনি গৌড়াধিপতি নয়পালের পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নয় পাল মহীপালের বংশধর, এবং ১০৪০ খৃষ্টাব্দে গৌরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চক্রপাণির অনুজের নাম ভানু দত্ত, চক্রপাণি বিখ্যাত রোধ্র বলী নামক দত্ত কুলোৎপন্ন। চক্রপাণির জন্মভূমি বীরভুম জেলার অন্তর্গত ময়ুরেশ্বর গ্রামে। তথায় অদ্যাপি চক্রপাণি প্রতিষ্ঠীত চক্রপাণীশ্বর, শিব আছেন। চক্রপাণি স্বীয় প্রতিভা বলে গৌরেশ্বরের রাজবৈদ্য এবং পরে রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠীত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরেশ্বরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

চক্রসংগ্রহের, রত্ন প্রভা নামক একটি টীকা ছিল, উহা বর্ত্তমানে দুর্লভ। শিবদাস প্রাচীন টীকা রত্নপ্রভাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক চক্র সংগ্রহের একটি উপাদেয় টীকা লিখিয়াছেন। উহা বর্ত্তমানে সুলভ এবং আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ্যগণের সুখবোধ কল্পে পরম উপযোগী। শিবদাস চরক সংহিতার উপরে চরকতত্ত্ব প্রদীপিকা নামক একটি উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছিলেন। বাগভট লিখিত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের উত্তর তন্ত্রের উপরেও শিবদাস একটি অতি উত্তম টীকা লিখিয়াছিলেন। শিবদাসের সংস্কৃত ভাষা অতিশয় সুললিত। কেবলমাত্র শিবদাসের টীকা পাঠ করিলে যে কোন আয়ুর্ব্বেদীয় ছাত্র আয়ুর্বেদীয় বিষয় বস্তু গুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিতে ও বলিতে সমর্থ হইবেন। শিবদাসের পিতার নাম অনন্ত সেন। ইনি গৌড়েশ্বরের রাজবৈদ্য ছিলেন। শিবদাসের পৈত্রিক নিবাস মালঞ্চিকা। মালঞ্চিকা বরেন্দ্রভূমি পাবনার অন্তর্গত। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকর গ্রামের কতগুলি বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট আমি শুনিয়াছি যে শিবদাস সেন একদা বৈদ্যপ্রধান মানকরের অধিবাসী ছিলেন এবং সমগ্র রাঢ়ে তাঁহার চিকিৎসাখ্যাতি ছিল। এখনও বর্দ্ধমানের লোক বলে, যে "শিবুকোবরেজ কেটে জোড়া দিতে পারত।" মরামানুষকে বাঁচাতে পারতো" ইত্যাদি। হায়! হায়! বর্ত্তমানে কোনো কবিরাজের সম্পর্কে এইরূপ গালভরা প্রশংসা সূচক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যগণ মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। কোনও আকর গ্রন্থের টীকা অধ্যয়ন করেন না। সুতরাং আয়ুর্বিদ্যার মর্ম্মস্থলে তাহাদের প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। এই জন্য জটিল রোগের চিকিৎসার সময়ে তাঁহারা রোগীর সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারেন না এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। কেবল

মাত্র অনধ্যায়, অনভ্যাস এবং শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ভেষজ সমূহের অপ্রস্তুতিই তাহাদের এবম্বিধ অধোগতির অন্যতম হেতু।

বঙ্গসেন—চক্রপাণির পরে নাম করিবার মত সংগ্রহকার বঙ্গসেনকে বলা যাইতে পারে। তৎকৃত সংগৃহীত গ্রন্থের নাম **চিকিৎসা সার সংগ্রহ**। ইহাতে প্রতি রোগের সনিদান চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। বঙ্গসেনের পিতার নাম গদাধর, বঙ্গসেন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি তৎকৃত সংগ্রহের রসায়নাধিকার ছাড়া অন্য কুত্রাপি পারদ ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই।

বঙ্গসেন ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কারণ ভাবমিশ্র তৎকৃত ভাবপ্রকাশে বঙ্গ সেনের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গসেন সংগ্রহ বঙ্গ দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্গ দেশের আয়ুর্বেদীয় পুস্তক প্রকাশকগণ অর্থাৎ বটতলার পুস্তক প্রকাশকগণ, কিম্বা সি, কে, সেন এণ্ড কোং বা অন্য প্রকাশকগণ বঙ্গ সেন সংগ্রহ ছাপান নাই। কেবল মাত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ইহার একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাও বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহ—বঙ্গসেন সংগ্রহের পর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদীয় সংগ্রহের নাম শার্ঙ্গধর সংগ্রহ। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে তাদৃশ প্রচলিত নহে। পরন্তু উত্তর পশ্চিম ভারতে ইহার প্রচলন বেশী। এই গ্রন্থ সংকলিত ঔষধ সংগ্রহ মাত্র, ইহা তিনটি খণ্ডে এবং বত্রিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

সমস্ত পুস্তকে ছাব্বিশ শত শ্লোক আছে, ইহাতে অন্যান্য সংগ্রহ গ্রন্থের ন্যায় রোগাধিকার অনুযায়ী ঔষধ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। পরন্তু ঔষধের বিভাগ অনুযায়ী স্বরস, কল্ক, চূর্ণ, আসব, অরিষ্ট, তৈল, ঘৃত ইত্যাদি ক্রমে ঔষধ সমূহ সজ্জিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে রসৌষধি সংগৃহীত হইয়াছে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহে লিখিত ঔষধগুলি দৃষ্টফল এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের দ্বারা বহুশঃ ব্যবহৃত এবং সকপোল কল্পিত নহে। সেইজন্য শার্ঙ্গধর সংহিতা লঘুত্রয়ীর মধ্যে পরিগণিত। বঙ্গদেশে চক্রসংগ্রহ যেরূপ সমাদৃত উত্তর পশ্চিম ভারতে শাঙ্গধর সংহিতাও তদ্রূপ।

আয়ুর্বেদ মহামহোপাধ্যায় ভাবমিশ্র শার্ঙ্গধরের নাম উল্লেখ পূর্বক তৎসংগৃহীত ঔষধাবলী নিজ সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় শার্ঙ্গধর ভাব প্রকাশের পূর্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তৎকৃত সংগ্রহ সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবগণের মতে শার্ঙ্গধর ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। **শার্ঙ্গধর সংহিতা** ছাড়াও তাঁহার "পর্য্যায় শব্দমঞ্জরী," "ধাতু মারণ" "বাজী চিকিৎসা" "তুরঙ্গ পরীক্ষা" নামক পুস্তক ছিল। শার্ঙ্গধর সংহিতার উপর অনেকে টীকা লিখিয়াছেন, বোপদেব, আঢ়মল্ল, রুদ্রধর ভট্ট, কাশীনাথ ইত্যাদি।

ভাব মিশ্র—শার্ঙ্গধরের পর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ সংগ্রহকারের নাম **ভাব মিশ্র**। তাঁহার পিতার নাম লটকণ মিশ্র, বাগ ভট্টের পর আর কোন আয়ুর্বেদ সংগ্রহকার সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ করেন নাই। এবং এই দিক দিয়া বিচার করিলে ভাব মিশ্রের সংগ্রহ সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ভাব মিশ্র সংক্ষেপে সম্পূর্ণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি কেবল প্রাচীন মতের সংগ্রহ কার মাত্র ছিলেন না। পরন্তু তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত নূতন, নূতন ভেষজাবলী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল সেইগুলিও তিনি স্বীয় সংগ্রহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গ সেনের ন্যায় ভাবমিশ্র একজন **মিশ্র আয়ুর্বেদসেবী** অর্থাৎ তিনি আত্রেয় **সম্প্রদায়, ধন্বন্তরী সম্প্রদায়** এবং **রসবৈদ্যসম্প্রদায় ভুক্ত** বৈদ্যগণের ঔষধাবলী স্বীয় সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অহিফেন, তোপচিনি, সোহাগা প্রভৃতি

দ্রব্য ভাব প্রকাশে লিখিত হইয়াছে। দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানের লেখক হিসাবে ভাব মিশ্র অদ্যাপি সকলের শীর্ষ স্থানীয়। বিভিন্ন আধুনিক রোগের নিদান ও চিকিৎসা বিধিও তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফিরঙ্গ, শীতলা, মসুরিকা, রোগের চিকিৎসা বিধি অত্যন্ত সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া ভাব মিশ্র চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ভাব মিশ্র ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাবমিশ্র বা ভবনাথ মিশ্র ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাব প্রকাশ লেখা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি মহামান্য সম্রাট আকবরের রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি টোডরমল্ল ও অদ্বৈত সিদ্ধি প্রণেতা কাশীপ্রবাসী মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীরামচরিত মানসপ্রণেতা মহা কবি তুলসী দাসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বাগভট্টের পর বহু আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত হেতুলিঙ্গ ঔষধাত্মক আয়ুর্বেদের বিভিন্ন অঙ্গের উপর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ১০০০ এক সহস্রেরও অধিক। উহাদের মধ্যে কতগুলি পাওয়া যায় পুঁথির আকারে। কতগুলি ছাপান হইয়াছে। কতকগুলি কখনও ছাপান হইবে না কারণ সেইগুলি ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিরূপে গৃহ পেটিকায় সযত্নে আবদ্ধ রহিয়াছে। কোনো মুর্খ বংশধরের হাতে পড়িয়া হঠাৎ বিরক্তিবশে তাহাদের আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কা সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বদেশীয় কীর্ত্তি রক্ষার বাসনা যদি কখনও আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের মনে জাগরিত হয়, তবে সেইগুলি দিবসের আলোক দেখিতে পারে। নতুবা কীটদষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে তুষানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। তথাপি এই সকল পুঁথি ও পুস্তকের নামগুলি যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে লুপ্ত আর্য্যকীর্ত্তি বিষয়ে গবেষকগণের মনে থাকে তাহার জন্য নিম্নে লিখিয়া রাখিতেছি।

কবি বলিয়াছেন বিত্ত, চিত্ত, জীবন, যৌবন এবং জাগতিক সকল দ্রব্যই

বিনাশশীল। কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু কীর্ত্তিনাশার কোপে বহু কীর্ত্তি ধরাতল হইতে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কেবলমাত্র **"কীর্ত্তিরক্ষর সম্বদ্ধা স্থিরা ভবতি ভূতলে"** বলিয়া যে অপর কবি প্রসিদ্ধি আছে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ বিষয়ে তাহাও নিস্ফল হইয়াছে। কারণ আয়ুর্বেদের প্রথম মুলগ্রন্থ ঋষি প্রণীত অগ্নিবেশ সংহিতার চিকিৎসা স্থানের শেষ ১৭ সপ্তদশ অধ্যায়, সিদ্ধিস্থান ও কল্পস্থান বিনষ্ট হইয়াছে। মুল সুশ্রুত সংহিতাও বিনষ্ট হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অবস্থিত বহু আয়ুর্বেদীয় পুঁথি কপি করার অভাবে পাতায় পাতায় জোড়া লাগিয়া খাস্তা কচুরীর মত হইয়াছে। হাইদরাবাদ রাজ্যের পাথর ঘাটী গ্রামের মহাম্মদ কাসিমের গৃহে ২০ লক্ষ টাকা দামের হস্ত লিখিত পুঁথির লাইব্রেরীতে অবস্থিত ভারতীয় সমগ্র অষ্টাদশ প্রকার সংস্কৃত বিদ্যা সঙ্কলিত হস্ত লিখিত পুঁথি বিদেশী ভ্রমণকারগিণের হস্তে পড়িবার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কালযাপন করিতেছে। মহম্মদ কাসিমের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন। দিল্লীর মুসলমান বাদসাহগণ দাক্ষিণাত্য বিজয় কালে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিষয় সকল ধ্বংশ করিতেছিলেন। কিন্তু যাঁহারা মুসলমান ধর্ম করিতে ছিলেন, তাঁহারা বিজয়ী মুসলমান সম্রাটগণের ধ্বংশের কবল হইতে রক্ষা পাইতেছিলেন। পাথর ঘাটির ব্রাহ্মণ জায়গীরদারগণের হস্ত লিখিত পুঁথির লাইব্রেরীটি বর্ত্তমান জগতে একটি বিস্ময়কর বস্তু। জায়গীরদারগণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই লাইব্রেরী রক্ষা করিয়াছেন। অদ্যাবধি উহা পাশ্চাত্য ভ্রমণ কারিগণের শ্যেন দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। কিন্তু আর অধিকদিন পারিবেনা। জার্ম্মান অথবা মাকিণ ভ্রমণ কারিগণ অধিক মুল্য দিয়া উহা ক্রয় করিবেন। তাহার পর ঐগুলির পাট হইতে বিলাতি সাল বনিয়া ভারতের বাজারে বিক্রী হইবে। ভারত সরকারের দৃষ্টি এত বলা সত্বে ঐ গুলির

উপর পতিত নাই। হায় ভারত বাসী! কবে তোমার রাষ্ট্র শক্তি তোমার স্বদেশীয় কৃষ্টি রক্ষায় যত্নবান হইবেন?

বৈদ্য জীবন—ভাব প্রকাশের পর অপর উল্লেখযোগ্য পুস্তক দিবাকর সুত লোলিম্ব রাজ প্রণীত। তিনি কবি ছিলেন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ঔষধগুলি অশ্লীল কবিতার মধ্য দিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের তিন খানি টীকা আছে। এক খানি বৈদ্য জীবন দীপিকা, সুখানন্দনাথ ইহার রচয়িতা। দ্বিতীয় প্রয়াগ দত্ত কৃত "বৈদ্য জীবন টীকা" এবং তৃতীয়টি রুদ্র ভট্ট কৃত টীকা। বৈদ্য জীবনে সংগৃহীত ঔষধগুলি পরীক্ষিত এবং দৃষ্টফল।

নাবনীতক—আত্রেয় সম্প্রদায় ভুক্ত অপর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ **নাবনীতক**। ইহা বাউয়ার ম্যানস্‌ক্রিপট নামক সংগৃহীত পুঁথি হইতে প্রাপ্ত কোন বৌদ্ধ ভিষক কর্তৃক লিখিত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ। ইহার বিষয় বস্তুগুলি শার্ঙ্গধরের মত ঔষধ কল্পনানুসারে লিখিত। ইহা ১৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত যথা—(১) চূর্ণ (২) ঘৃত ( ) তৈল (৪, মিশ্রঔষধ (৫) বস্তিযোগ (৬) রসায়ন যোগ (৭) যবাগু (৮) বৃষ্য যোগ (৯) নেত্রাঞ্জন যোগ (১০) কেশরঞ্জক যোগ (১১) অভয়া কল্পনাখ্য যোগ (১২) শিলাজতু যোগ (১৩; চিত্রক যোগ (১৪) শীত চিকিৎসা (১৫) বন্ধ্যা চিকিৎসা (১৬) স্ত্রীরোগ চিকিৎসা। ইহার শেষে লেখা আছে নেদং দদ্যাদ পুত্রায় অশিষ্যে প্রস্তবো ন স্যাৎ। অর্থাৎ ইহা কখনও অপুত্রকে এবং অশিষ্যকে দিবেনা। এই প্রকার তান্ত্রিক সিদ্ধবৈদ্য সুলভ উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইহা কোন বৌদ্ধ সিদ্ধ বৈদ্যের দ্বারা সংগৃহীত গ্রন্থ বিশেষ। ইহা সম্প্রতি বোম্বায়ে ছাপান হইয়াছে।

আত্রেয় সম্প্রদায় ভুক্ত বৈদ্যগণের দ্বারা সহস্রাধিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে গুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহাদের নাম নিম্নে

লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঐগুলির বিস্তৃত বিবরণ জানা থাকিলেও গ্রন্থ গৌরব ভয়ে কেবলমাত্র নামতঃ উল্লেখ করিতেছি।

১। অঞ্জননিদান—অঞ্জনাচার্য্যকৃত রোগবিনিশ্চয় বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

২। হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত রোগ নির্ণয়াত্মক পুস্তক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহার পঠন পাঠন প্রচলিত আছে।

৩। বাল তন্ত্র—শিশুচিকিৎসা গ্রন্থ। মহীধর পুত্র কল্যাণবৈদ্য কৃত।

৪। নানসাগর—কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

৫। চিকিৎসাঞ্জ—বিদ্যোপাধ্যায় কৃত রোগবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

৬। গূঢ়ার্থদীপিকা—কাশীরামকৃত শার্ঙ্গধর সংগ্রহের টীকা।

৭। যোগতরঙ্গিণী—শ্রীমল্লভট্টকৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

৮। নাড়ীপ্রকাশ—শঙ্করসেন কৃত।

৯। বৈদ্যবিনোদ—শঙ্করসেন কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

১০। নাড়ী পরীক্ষাদিচিকিৎসাকথন।—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মা কৃত নাড়ীজ্ঞান ও চিকিৎসা গ্রন্থ।

১১। বৈদ্যরহস্য বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

১২। সিদ্ধান্তচিন্তামণি—মাধবনিদানের টীকা।

১৩। মধুমতী—দ্রাবিড়বাসী নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র, রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

১৪। মূত্র পরীক্ষা—রোগীর মূত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়াত্মক পুস্তক।

১৫। কালজ্ঞান—রোগীর মূত্রমলনিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস পরীক্ষাপূর্ব্বক পীড়ার সাধ্যত্বাসাধ্যত্বাদি নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ।

১৬। শরীর নিশ্চয়াধিকার—গর্ভাবস্থায় রমণীগণের যেরূপ আহার বিহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। ভবানীপ্রসাদ কবিরাজের শিষ্য রামদাস কর্তৃক রচিত।

১৭। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়—উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদিবিষয়ক গ্রন্থ।

১৮। বৈদ্যবল্লভ।—হিতরুচিপুত্র হস্তিরুচি প্রণীত জ্বর চিকিৎসা গ্রন্থ।

১৯। চিকিৎসা কণিকা।—ত্রিশটাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

২০। মনোরমা—জ্বরচিকিৎসাগ্রন্থ।

২১। হিতোপদেশ—শিশু, স্ত্রী ও বিষচিকিৎসার পুস্তক। রচয়িতা শ্রীকান্ত দাশ

২২। যোগশতক—জ্বরাদিব্যাধিপ্রশমক যোগশতক সংগ্রহ। শ্রীকণ্ঠদাস রচিত। বররুচি রচিত ইহার একখানি টীকা আছে, টীকার নাম—অভিধান চিন্তামণি।

২৩। মোমহনবিলাস—ক্ষত্রিয় প্রয়াগদাশের পুত্র মোমহন কর্তৃক, মহাম্মদ শার পুত্র ফিরোজশার রাজত্বকালে রচিত। ইহাতে বিশিষ্ট শিশু রোগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা এবং বৃষ্যবাজীকরণ যোগাবলী লিখিত হইয়াছে।

২৪। কূটমুদ্গর—ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। অজীর্ণচিকিৎসা ও পথ্যবিষয়ক পুস্তক।

২৫। আয়ুর্ব্বেদাগমন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিবৃত্ত। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের স্বসময় পর্য্যন্ত যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব বলিয়া তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ক্ষোভের বিষয় আমরা গ্রন্থে যে আদর্শ দেখিয়াছি, তাহা খণ্ডিত। ইহা অখণ্ডভাবে সংগৃহীত হইলে আয়ুগ্রন্থের কাল বা পৌর্ব্বাপর্য্যত্ব নির্ণয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

২৬। শতশ্লোকী—বোপদেবকৃত, চূর্ণ, গুড়িকা, লৌহ, ঘৃত, তৈল এবং কাথবিষয়ক শতশ্লোকময় গ্রন্থ।

২৭। বীরসংহাবলোকন—বীরসিংহকৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

২৮। বিশ্বকোষ—মহেশ্বর কৃত বৈদ্যকশব্দাভিধান।

২৯। যোগচিন্তামণি—হর্ষকীর্ত্তিসূরিকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

৩০। বালবোধ—বামাচার্য্যকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩১। বিষোদ্ধার—বিবিধ বিষচিকিৎসাগ্রন্থ। ৩২। বৈদ্যরত্ন—গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩৩। সিদ্ধান্তমঞ্জরী—বোপদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

৩৪। ক্ষেমকুতূহল—কৃষ্ণশর্মাকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩৫। সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্যামলালকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩৬। বালচিকিৎসাপটল—শিশু-চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩৭। সারসংগ্রহ—চক্রপাণিকৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। ৩৮। যোগরত্নাবলী—শ্রীকণ্ঠকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৩৯। গৌরীকাঞ্চলিকা—চিকিৎসাসংগ্রহ বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। শাল্মলীকল্প, শ্বেতা-পরাজিতাকল্প, কৃষ্ণাপরাজিতাকল্প, বৃহতীকল্প, শ্বেতার্ককল্প। এই পাঁচখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে, বিবিধ ব্যাধিতে শাল্মলী, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণ-পরাজিতা, বৃহতী এবং শ্বেতার্কের প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে।

৪০। নিবন্ধ সংগ্রহ—বৈদ্যক পারিভাষেক শব্দার্থবিষয়ক গ্রন্থ।

৪১। বৈদ্যামৃতলহরী—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বরচিকিৎসা পুস্তক।

৪২। বাণীকরী—বাণীকরীকৃত রোগাবলীর পৃথককরণ বিষয়ক গ্রন্থ।

৪৩। উপবনবিনোদ—শার্ঙ্গধরকৃত বৃক্ষায়ুর্বেদ। ৪৪। সন্নিপাতমঞ্জরী—ভবদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৪৫। চিকিৎসাকল্পলতিকা—ত্রিশটাচার্য্যকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। ৪৬। গূঢ়বোধক—হেরম্বসেনকৃত কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক। ৪৭। বৈদ্যকল্পদ্রুম—শুকদেবকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

৪৮। বৈদ্যমনউৎসব, বৈদ্যরত্ন ও বৈদ্যসঞ্জীবনী—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশে এই সকল চিকিৎসাগ্রন্থের পঠন পাঠন প্রচলিত না থাকিলেও দেশান্তরে এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ গ্রন্থত্রয় বিলক্ষণ আদৃত।

৪৯। যোগরত্নাকর—বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। পুণানগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫০। অর্কপ্রকাশ—রাবণ প্রণীত। ইহাতে বিবিধ অর্কের গুণ বিবৃত হইয়াছে। ইহা বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫১। প্রয়োগচিন্তামণি—রামমাণিক্যসেন বিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৫২। আতঙ্কদর্পণ—বাচস্পতি কৃত মাধবনিদানের টীকা।

৫৩। অভিনবচিন্তামণি—চক্রপাণিদাশকৃত চিকিৎসাগ্রন্থ।

৫৪। গদনিগ্রহ—চিকিৎসাগ্রন্থ। ৫৫। চারুচর্যা—ভোজরাজকৃত।

৫৬। চিকিৎসামৃত—গণেশকৃত। ৫৭। চিকিৎসাসার—হরিভারতীকৃত।

৫৮। চিকিৎসারত্ন—জগন্নাথকৃত। ৫৯। চিকিৎসাদীপিকা—হরানন্দকৃত।

৬০। মুগ্ধবোধ— রঘুনন্দনকৃত। ৬১। সদ্বৈদ্যভাবাবলী – জগন্নাথদত্ত কৃত।

মাধবনিদান টীকাকৃৎ বিজয়রক্ষিতধৃত পূর্বকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

(১) গদাধর (২) বাপ্যচন্দ্র (৩) বকুল (৪) সুধীর (৫) সুকীর (৬) মৈত্রেয় (৭)সুদান্ত সেন (৮) পরাশর (৯) প্রশ্নবিধানাখ্যটীকা (১০) আষাঢ়ধর্ম্ম (১১) স্বামিদাস (১২) খরনাদ (১৩) নাগভর্ত্তৃতন্ত্র (১৪) করবীরাচার্য্য (১৫) গৌতম (১৬) চন্দ্রিকাকার (১৭) বৃদ্ধভোজ (১৮) বাৎস্যায়ন (১৯) কল্যাণবিনিশ্চয় (২০) বরাহ (২১) হিরণ্যাক্ষ (২২) আলম্বায়ন (২৩) কাশ্যপ।

চক্রসংগ্রহের টীকায় শিবদাসকৃত পূর্বে অকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

(১) চন্দ্রপ্রভা (২) প্রয়োগরত্নাকর (৩) সুদশাস্ত্র (৪) নিশ্চল (৫) চন্দ্রাট (৬) রবিগুপ্ত (৭) আয়ুর্ব্বেদসার (৮) আণুবর্ত্তটীকাকার (৯) বৈদ্য প্রসারক (১০) শালিহোত্র (১১) সিদ্ধসার (১২) চন্দ্রকলাটীকাকার (১৩) বৈদ্যপ্রদীপ (১৪) দ্রব্যাবলী (১৫) বিশ্বামিত্র (১৬) রত্নশালা (১৭) মাহেশ্বর।

বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগের টীকাকার শ্রীকণ্ঠ ধৃত পূর্বে অকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

(১) লবণগণপাঠব্যাখ্যা (২) জিনদাস (৩) মুনিদাস (৪) নাগার্জ্জুন বার্ত্তামালা (৫) হরমেখলা (৬) বৈকারণ (৭) গন্ধশাস্ত্র (৮) করাল (৯)

সাত্যকি (১০) ভদ্রশৌনক (১১) লক্ষণটিপ্পন (১২) বৈদ্যক সিদ্ধান্ত (১৩) আচার্য্য ভীমদত্ত (১৪) পাখণ্ডিকা।

সুশ্রুত, টীকাকৃত ডহ্বণ ধৃত পূর্ব্বে অকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

(১) লক্ষণ টিপ্পনীকার (২) শক্তি সঙ্গমতন্ত্র (৩) জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্ শ্রীপতি (৪) মাহেশ্বর (৫) জমদগ্নি (৬) অমর।

অষ্টাঙ্গ হৃদয় টীকাকার অরুণ দত্ত ধৃত পূর্ব্বে অকথিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :—

(১) বালাদিত্য, (২) মাঘ, (৩) দারুবাহী, (৪) আয়ুর্ব্বেদাবতার (৫) নগ্নজিৎ, (৬) নাগানন্দ, (৭) বাণভট্ট, (৮) রুদ্রট।

কাশ্যপ সংহিতা বা বৃদ্ধ জীবকীয় তন্ত্র

ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে স্বর্গীয় যাদবজী ত্রিকমজী বৈদ্য মহোদয়ের সহায়তায় নেপাল রাজগুরু শ্রীহেমরাজ শর্মা কর্তৃক নেপাল রাজ দরবারের অর্থ সাহায্যে নেপাল রাজকীয় গ্রন্থ মালার প্রথম পুষ্পরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। নেপাল রাজ লাইব্রেরীতে তাল পত্রের যে ছিন্ন ভিন্ন পুঁথি ছিল পণ্ডিত হেমরাজ শর্মা সেইগুলিকে সযত্নে সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন তাহা পুস্তকের অতি উপাদেয় অংশ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তবে ইহাতে পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব গণের প্রাচ্যকৃষ্টি বর্ণনায় তুমুখো সাপ হওয়ার বিষয়ে কিছু বলা নাই। আর্য্যকৃষ্টি বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণ যে পক্ষপাতবিহীন বিচার করেন নাই, তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিস্তৃত ভূমিকায় একটিও কথা লেখা নাই। তথাপি হিন্দু চিকিৎসার ইতিহাসে এই ভূমিকার মূল্য যথেষ্ট। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখার পরেও বঙ্গ দেশের ভূতপূর্ব শিক্ষাধিকর্ত্তা ডাঃ স্টাপলটন সাহেব লিখিয়াছেন যে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র পারস্য, ইরাক, ইরাণের রসায়ন শাস্ত্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আজকালকার ছাত্রগণ সংস্কৃত পড়েন না। সুতরাং মূল সংস্কৃত গ্রন্থে আর্য্যকৃষ্টি বিষয়ে কি লেখা আছে বা না আছে তাহা জানিবার বা বুঝিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মাত্র আই, এস, সি, পড়া স্বল্প ইংরাজী জ্ঞান দ্বারা পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণ দ্বারা প্রচারিত পক্ষপাত দুষ্ট ভারতীয় কৃষ্টির বিষয়ে অসম্যক্ প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করতঃ স্বদেশীয় কৃষ্টি বিষয়ে স্বমত গঠন করিয়া এবং সাধারণের সভা সমিতিতে সর্বজন সমক্ষে তাহা গর্বভরে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা করেন না। বৃটিশ ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থ পুষ্ট প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণ ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ে মিথ্যার যে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বত নির্ম্মান করিয়াছেন তাহাকে বিদীর্ণ করার মত ডিনামাইট বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব গণের হাতে নাই।

কাশ্যপ সংহিতায় কুমারতন্ত্র অর্থাৎ শিশুরোগ, গর্ভিণীরোগ, শিশু পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। কশ্যপ হিমালয়ের পার্শ্ব দেশে অনুষ্ঠিত ঋষি মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভরদ্বাজ প্রদত্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কুমারতন্ত্র বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্য জীবককে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং জীবক স্বলিখিত বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্রে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া ছিলেন।

সম্প্রতি হেমরাজশর্ম্মা এই তন্ত্র কাশ্যপ সংহিতা নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ইতিপূর্বে কোথাও ছাপান হয় নাই। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট সংহিতার সহিত এই গ্রন্থের লিখন ও সূত্রণ প্রসঙ্গে কোন মিল নাই। ইহার বিষয় সন্নিবেশও বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু ইহার বিষয় বস্তু অতি গম্ভীর এবং সর্বথা অধ্যয়ন যোগ্য এবং এই গ্রন্থ চরক সুশ্রুত বাগভট্ট সংহিতার ন্যায় মান্যতা পাইবার উপযুক্ত।

মাত্র ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে ইহাতে কেবল কুমার তন্ত্র নহে আয়ুর্বেদ বিষয়ে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুথির আকারে এই গ্রন্থের ভারত বর্ষে একদা বহুল প্রচার ছিল। কিন্তু কাল প্রভাবে কালার্ক ভক্ষিত বহু বিধ লুপ্তপ্রায় আর্য্যকৃষ্টির মত কাশ্যপ সংহিতাও লুপ্ত হইত। কিন্তু নেপাল রাজগুরুর কৃপায় এইরূপ লুপ্তপ্রায় মহারত্নের পুনরুদ্ধারে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মী আচার্য্য যাদব শর্মাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ধান্বন্তরীয় সম্প্রদায় (২)

পূর্বে বলিয়াছি যে হিমালয় পর্বতের শুভ পার্শ্ব দেশে অনুষ্ঠিত ঋষি সম্মেলনে সমবেত ঋষিগণ মহর্ষি ভরদ্বাজের বক্তৃতা শুনিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিভিন্ন অঙ্গের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি শল্য তন্ত্র বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য গোপুর রক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য, গালব এবং ভোজ এই দ্বাদশ জন শিষ্যকে শারীর ও শাল্যতন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সুশ্রুত লিখিত তন্ত্রের নাম সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত সংহিতা। কাল ক্রমে বৃদ্ধ সুশ্রুত সংহিতা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা এক্ষণে সুশ্রুত সংহিতার নামে যে গ্রন্থ পাঠ করি বা বাজারে বিক্রি হইতে দেখি তাহা বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক সৌশ্রুত তন্ত্রাবলম্বনে এক খানি প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ মাত্র। সুশ্রুত সংহিতায় কুত্রাপি নাগার্জ্জুন আপনাকে সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই। সুশ্রুতের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার ডল্বণ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন। ধন্বন্তরির অপর একাদশ শিষ্যগণও স্বনামে পৃথক পৃথক শল্যতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

এমন কি পঞ্চদশ শতকে শিবদাসের সময়েও ঔরভ্র পৌষ্কলাবত বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিতে টীকাকারগণকে দেখিতে পাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে বর্ত্তমান সময়ে উক্ত একাদশ তন্ত্রের লোপাপত্তি ঘটিয়াছে।

সুশ্রুত সংহিতার বিষয় সন্নিবেশ বিধি সুসংবদ্ধ ও রচনা সংযত। ইহার মৃত নরদেহ খণ্ডন পূর্বক অঙ্গ বিনিশ্চয়ের উপদেশ, প্রধান কর্ম্মে বিদ্যার্থীর যোগ্যতা লাভের জন্য শিষ্যোপনয়ন বিধি, অস্ত্র শস্ত্রের বর্ণন ও ব্যবহার বিধি, বিবিধ প্রকার ব্রণবন্ধনের যথাযথ বিবরণের সহিত ব্রণ বন্ধন বিধি, ব্রণ বন্ধনের দ্রব্যাবলীর বিবরণ, ব্রণিতের বিশেষ পথ্যাপথ্য নির্দেশ, পূর্বকর্ম, প্রধানকর্ম্ম, ও পশ্চাৎ কর্ম্মের বিশেষ বিবরণ, তাহাদের পূর্ববর্ত্তি এবং পরবর্ত্তি বিষয়ের বিশেষ বিবরণ, মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, অর্শ, অস্থিভগ্ন, বিদ্রধি, প্রভৃতির শস্ত্রোপচার এবং গণ্ড হইতে মাংস লইয়া কর্ণ পালিতে সংযোজন পূর্ব্বক কর্ণ পালি বর্দ্ধনের ব্যবস্থা পাঠ করিলে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে যে সুশ্রুত সংহিতা রচনা কালে ভারতে শস্ত্র চিকিৎসা তৎকালোচিত উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল।

সুশ্রুতের সময়ে ভারতে প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছিল। আপ্তবচন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অধিকতর আদৃত হইত। শাস্ত্র বচন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা অধিকতর বলীয়ান ছিল। অনুমান এবং আপ্তোপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষের দ্বারা পরীক্ষিত হইত। তখনকার চিকিৎসক ও ছাত্রগণ শব ব্যবচ্ছেদ করার পর সূর্য্য দর্শনেই শুদ্ধ হইতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে কাল ক্রমে এই সকল স্বাস্থ্যকর বিধি ব্যবস্থা গুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সমাজ পরিচালন ব্যবস্থার ফল স্বরূপ শল্যতান্ত্রিক গণের সহিত পংক্তি ভোজন বন্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সন্তান গণের

আয়ুর্ব্বেদ পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলঃ জলমা-বিশেদিতি।" এই স্মার্ত্তবাক্য প্রভাবে মূর্খ হস্তে পড়িয়া আয়ুর্বেদের চরম দুর্গতি হইয়াছিল।

যে শল্য (Surgery) জ্ঞানের উপদেশ দিয়া মহর্ষি সুশ্রুত আশা করিয়াছিলেন যে "কুশলেনাভিপন্নং তদবহুধাভিপ্ররোহতি" অর্থাৎ তৎ কর্ত্তৃক উপ্তবীজ কুশল ব্যক্তির মানস ক্ষেত্রে কাণ্ড শাখা পল্লবান্বিত মহান মহীরুহে পরিণত হইবে। কিন্তু মহর্ষির আশা ফলবতী হয় নাই। শল্য তন্ত্রের যে বীজ ভারত ভূমিতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল,তাহা আমাদের দেশের দূষিত আবহাওয়ার গুণে অকালে শুষ্ক হইয়াছে। এবং তাহাই সমুদ্র পারে গিয়া সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়া তরুতে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সুশীতল তরুছায়ায় সমগ্র পৃথিবীর জনগণ মহানন্দে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন।

সুশ্রুতের টীকাকারগণ

চরক সংহিতার ন্যায় সুশ্রুতের অনেক গুলি টীকা টিপ্পনী, পঞ্জিকা ও ভাষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে জেজ্জট, গয়াদাস ও ভাস্কর পঞ্জিকাকার, শ্রীমাধব ও ব্রহ্মদেব টিপ্পনকার, ইহাছাড়া "গূঢ়পদভঙ্গ টিপ্পনী নামক একটি টিপ্পনী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু টিপ্পনীকারের নাম অজ্ঞাত, সোমটিপ্পন নামে আর একটি টিপ্পনী হইতে সুশ্রুতের শ্রেষ্ঠ টীকাকার ডল্বণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

সুশ্রুতের অপর উল্লেখযোগ্য টীকাকারের নাম কার্ত্তিক তাঁহার পর গোমী, গয়ী ও গদাধরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সকলের টীকা হইতে ডল্বণ প্রচুর পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। চক্রপাণি রচিত সুশ্রুত টীকার নাম ভানুমতী। চক্রপাণি ডল্বণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব ডল্বণ চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তি। মুদ্রিত ভানুমতী অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য। প্রাতঃস্মরণীয়

কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয় ডল্বণের নিবন্ধ সংগ্রহ ও চক্রপাণির ভানুমতী নামক টীকার সহিত সুশ্রুত সংহিতার যে অত্যুত্তম সংস্করণ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় বৈদ্যগণের দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। জার্মানীতে ভানুমতী ছাপান হইয়াছে। তাহার কপি বাংলা গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় কৃষ্টির অতি উজ্জ্বল রত্নের পুনরুদ্ধার কল্পে সংগ্রহ করা উচিত। নিশিকান্ত সংগৃহীত ভানুমতীর পাণ্ডুলিপি কুমার টুলীতে কাহারও নিকট লুক্কায়িত আছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার খোঁজ পাই নাই। নিশিকান্ত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কর্ত্তব্য তৎকৃত আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা এবং সুশ্রুতের নির্দ্দেশানুযায়ী যন্ত্র শস্ত্রাদির সহায়তায় শল্য তান্ত্রিক সৃষ্টি করা। কিন্তু এই সম্পর্কে আধুনিক বঙ্গের বৈদ্যসন্তানগণকে কখনও একটি কথা বলিতে শুনি নাই। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে বৈদ্যজাতি স্বজাতি প্রতিপালক ও স্বগোষ্ঠী পরিপোষক। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহাদের জাতীয় বিদ্যা আয়ুর্বেদের ক্রমাবনতি ও নিদারুণ হীনাবস্থা দেখিয়া আমাদের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চপদারূঢ় বৈদ্য সন্তানগণ তাঁহাদের স্বজাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির সমাদর করেন নাই। জাতীয় কৃষ্টিকে অবহেলা করিয়া পৃথিবীতে কোন জাতি সমৃদ্ধ হইতে পারেন নাই।

সুশ্রুতের আধুনিক টীকাকারগণের মধ্যে পূর্ববঙ্গ নিবাসী কলিকাতা প্রবাসী পরলোক গত স্বনাম ধন্য কুশাগ্রবুদ্ধি কবিরাজ হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। তৎকৃত সুশ্রুতার্থসন্দীপন নামক সুশ্রুত টীকা" আয়ুর্বেদ সেবিগণের পরম আদরের বস্তু। এই টীকার প্রতি ছত্রে হারাণ চন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অসাধারণ শল্যতান্ত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শারীরে সুশ্রুত বিনষ্ট হন নাই। পরন্তু অদ্যাপি

সুশ্রুতই যে শারীরে শ্রেষ্ঠ স্থান এবং আদি স্থান দখল করিয়া রহিয়াছেন ইহা ধন্বচনভূমি হারাণ চন্দ্র ও তাহার প্রিয়তম প্রধান শিষ্য সম্প্রতি পরলোকগত আয়ুর্বেদীয় শারীরবিদ্যা বিশারদ কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী মহাশয় তল্লিখিত আয়ুর্বেদ জগতের দুর্ভাগ্য বশতঃ অপ্রকাশিত "শারীর বিনিশ্চয়" নামক মহাগ্রন্থে প্রমাণিত করিয়াছেন। জ্যোতিষচন্দ্র কৃত "শারীর বিনিশ্চয়" বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী মতিলাল বাণারসী দাস কর্ত্তৃক ছাপান হইয়া বান্ধিবার সময়ে দেশ বিভাগকালে লাহোর দাঙ্গায় ভস্মীভূত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ পুস্তকের একটি ফাইল কপি আমার নিকট আছে। পুস্তকখানি অতি উপাদেয়। জ্যোতিষ চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে উহার পুনর্মুদ্রণ অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান বঙ্গের বৈদ্যগণ দরিদ্র সুতরাং বাংলার কৃষ্টি রক্ষাকল্পে বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

ভোজ কৃত ভোজ সংহিতা, ভাস্কর ভট্টকৃত "শারীর পদ্মিনী" এবং শ্রীমুখকৃত শারীর শাস্ত্র "শারীর বৈদ্যক" এবং কবিরাজ গননাথ সেন কৃত "প্রত্যক্ষ শারীরম্" নামক গ্রন্থচতুষ্টয় শল্য তন্ত্রের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্র তন্ত্রদ্বয়ের নাম মাত্র শুনা যায়। উহাদের পুঁথি কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। জর্মন প্রাচ্যবিদ্যা ধুরন্ধরগণ উক্ত পুঁথিদ্বয় তাঁহাদের সংগ্রহালয়ে রাখিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না।

সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত তন্ত্র কবিরাজ শিবদাস সেনের সময়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কি জানি অধুনা লব্ধ হেমরাজ শর্মার কাশ্যপ সংহিতার মত কোন অখ্যাত পণ্ডিতের পর্ণকুটীরে ঝাঁপির ভিতরে ইহাকে পুনরায় দেখিতে পারি। ভারত স্বাধীন হইয়াছে, এক্ষণে আর একবার ইংরাজ সরকারের মত ভারতের প্রত্যেক পল্লীতে গ্রন্থাগারে পুরাতন পুঁথি

সংগ্রহের জন্য অভিযান চালান উচিত। অপর উল্লেখযোগ্য শল্যতন্ত্র পৌষ্কলাবত তন্ত্র চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কারণ চক্রপাণি ভানুমতীর টীকায় উহা হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু ঐগুলি অধুনা লভ্য নহে। করবীর্য্য তন্ত্র, গোপুররক্ষিত তন্ত্র, ভানুমতী তন্ত্র, কপিল তন্ত্র ও গৌতম তন্ত্রের বিষয় আমরা নামে মাত্র অবগত আছি। ডল্বণ ও চক্রপাণির টীকা না থাকিলে আমরা তাহাদের নামও জানিতে পারিতাম না। কাল প্রভাবে রত্নপ্রসূ ভারতের কত রত্নই যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাও দুষ্কর। হায় ভারতবাসী তোমরা কি পুনরায় তোমাদের লুপ্তরত্নোদ্ধারের চেষ্টা করিবে না ?

শালাক্য সম্প্রদায় (৩)

প্রাচীন ভারতে শল্য তন্ত্রের মত শালাক্য তন্ত্রের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ. নাসিকা, গলরোগ, দন্তরোগ ও শিরোরোগের বিশেষ চিকিৎসায় জন্য একদল চিকিৎসক ছিলেন, তাহাদিগকে শালাকী বা শালাক্য তান্ত্রিক বলা হইত। উহারা উক্ত সকল রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তক্ষশীলা, নালন্দা, বল্লভী, বিক্রমশিলা সারনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৌপালিক, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য, গালব, কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি আয়ুর্বেদাচার্য, শালাক্যতন্ত্রের উক্ত বিষয়গুলির অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং বিশ্ব বিদ্যালয় সংলগ্ন আতুরালয়ে (হাসপাতালে) সমাগত রোগীগণের চিকিৎসা করিতেন বৈদ্যকগ্রন্থ পাঠে যে সকল শালাক্য তন্ত্রের বা তন্ত্রকর্ত্তার নাম বা গ্রন্থের নাম আমরা পাইয়াছি, নিম্নে স্থানাভাব বশতঃ অতি সংক্ষেপে তাহাদের নামগুলির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

(১) বিদেহতন্ত্র (২). নিমিতন্ত্র (৩) কাঙ্কায়নতন্ত্র (৪) গার্গ্যতন্ত্র (৫) গালব্যতন্ত্র (৬) সাত্যকিতন্ত্র (৭) শৌনকতন্ত্র (৮) করালতন্ত্র (৯) চক্ষুষ্যতন্ত্র (১০) কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র (১১) কৌপালিকতন্ত্র।

গ্রন্থকারগণের নাম (১) বৃদ্ধ ভোজ (৩) মহাবিদেহ (৪) বৃদ্ধ কাশ্যপ (৫)

নিমি (৬) কাঙ্কায়ন (৭) গার্গ্য (৮) গালব (৯) কৃষ্ণাত্রেয় (১০) চক্ষুঃ সেন (১১) কৌপালিক। বৃদ্ধত্রয়ী ও লঘুত্রয়ীতে উক্ত রোগের চিকিৎসা লিপিবদ্ধ থাকিলেও উহাদের ব্যাপক এবং বিস্তৃত চিকিৎসা বিধি উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ ছিল।

অগদ তান্ত্রিক সম্প্রদায় বা বিষ বৈদ্য সম্প্রদায় (৪)

প্রাচীন কালে বিষ তান্ত্রিকগণ অতিশয় সাফল্যের সহিত ভারতে সর্বত্র বিষ চিকিৎসার দ্বারা ভারতীয় জনগণকে রোগ মুক্ত করিতেন। তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম উভয় প্রকার বিষ ব্যবহার করিতেন এবং উভয় বিষোৎপন্ন রোগের চিকিৎসা করিতেন। মেগাসথিনিস তাহার ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে রোগে কদাচিৎ লোকের মৃত্যু হইত। তিনি ভারতে কেবল মাত্র সর্পাঘাতে লোক মরিতে দেখিয়াছিলেন। সর্পাঘাতের চিকিৎসাও তাহারা অতিশয় সাফল্যের সহিত করিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে মহর্ষি কাশ্যপ মহারাজ পরীক্ষিৎকে সর্প-দংশন জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন কালে পথে তক্ষক কর্তৃক প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কাশ্যপ্যের অগদ তন্ত্র বিষয়ে একখানি উত্তম গ্রন্থ ছিল। উহার নাম কাশ্যপ সংহিতা। কাশ্যপ সংহিতা হইতে ডল্বণ চক্রপাণি ও চক্রপাণিদত্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উহাদের সময়েও উহা বর্ত্তমান ছিল। যে কাশ্যপ সংহিতা সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহা কৌমারভৃত্য তন্ত্র বিষয়ে লিখিত। বিষ তন্ত্রের উপর চারিখানি প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম (১) অলম্বায়ন সংহিতা (২) উশনঃ সংহিতা (৩) সনক সংহিতা (৪) লাট্যায়ান সংহিতা। কিন্তু ইহাদের বিবরণ আমরা সুশ্রুতের টীকাকারগণের পাঠোদ্ধার হইতেই পাইয়া থাকি। এই গ্রন্থ গুলির অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের কোন সংবাদ নাই। সুতরাং ইহারা যে কালর্ক ভক্ষিত তাহা নিঃসংশয়।

অতি অল্পকাল পূর্ব্বে বিষ চিকিৎসার দ্বারা কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কত দুরারোগ্য জটীল রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন। তাহাদের বিবরণ এখন কিংবদন্তীরূপে সর্ব্বভারতে প্রচারিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসকগণ বিষ চিকিৎসা করেন না। সেই জন্য তাঁহারা আর চমকপ্রদ চিকিৎসা করিতে পারেন না। কালক্রমে অগদ তান্ত্রিকগণ তাহাদের জাতিগত পেষা ছাড়িয়া দেন। তাহার ফলে বিষ বৈদ্যগণ কালক্রমে ওঝা বা সাপুরিয়া রূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সর্পাঘাতের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ভারতীয় বিষবৈদ্যগণের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণতি আর কি হইতে পারে? রাজকীয় প্রোৎসাহ ও হস্তাবলম্বন না পাইলে দেশীয় কৃষ্টীগুলির ক্রমশঃ কাল সাগরে বিলীন হওয়াই স্বাভাবিক।

ভুতবিদ্যা তান্ত্রিক সম্প্রদায় (৫)

ভূতবিদ্যা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের একটি অঙ্গ। চরক সুশ্রুত বাগভট্টে ইহার বর্ণনা অদ্যাপি দেখা যায়। ভুতবিদ্যা শব্দের অর্থ মানব শরীরে ভূতাবেশ বা অশরীরী আত্মার প্রভাব হেতু বায়ু বৃদ্ধি হইয়া যে চিত্তের অবসাদ বা উন্মাদনা ঘটে বা যে চিত্ত বিকৃতি ঘটে তাহার বিস্তৃত বিবরণ যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম ভূতবিদ্যা। সহজ কথায় ইহার নাম উন্মাদ রোগ-চিকিৎসা। প্রাচীন ভারতে যাহারা উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করিতেন তাহাদিগকে ভূত বিদ্যা তান্ত্রিক বলা হইত। ইহাদের একটি স্বতন্ত্র দল ছিল। ইহাদের আধুনিক কালের নারসিং হোমের ন্যায় উন্মাদ রোগ চিকিৎসার জন্য আতুরালয় ছিল। সেখানে তাহারা পাগল-দিগকে বদ্ধ রাখিয়া বহু দিন ধরিয়া চিকিৎসা করিতেন এবং তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন। এই সকল চিকিৎসকগণের লেখা বহুবিধ গ্রন্থ ছিল কিন্তু কালক্রমে সেইগুলি লুপ্ত হইয়াছে। বৃদ্ধত্রয়ী বর্ণিত ভূত বিদ্যার প্রধান উপদেশগুলি এখন ভূত বিদ্যা তান্ত্রিকগণের প্রধান উপজীব্য। বৃদ্ধ বৈদ্য

বর্ণিত ভূত বিদ্যার অথর্বন তন্ত্রও বর্ত্তমানে দুর্লভ। অতি অল্পকাল পূর্বে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, চট্টগ্রাম জেলায় উন্মাদ চিকিৎসার ছোট ছোট কেন্দ্র ছিল। সেখানে পাগল দিগকে দীর্ঘ কাল আবদ্ধ রাখিয়া আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করা হইত।

উন্মাদ রোগের চিকিৎসা বিদ্যা ছাড়া ভূত বিদ্যা তান্ত্রিক গণের আর একটি বিদ্যাও আয়ত্ত ছিল। উহা মন্ত্রবলে অশরীরী আত্মার—বা প্রেতাত্মার উপরে প্রভাব বিস্তার করা এবং তাহাদিগকে স্ববশে রাখিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লওয়া। ভূত বিদ্যা তান্ত্রিকগণ মন্ত্রবলে অপমৃত্যু জনিত অমুক্ত অশরীরী আত্মাকে ধরিয়া স্ববশে রাখিতে পারিতেন এবং মন্ত্রবলে তাহাদিগকে আহ্বান ও বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। তাঁহারা মন্ত্রবলে আকাশে উড্ডীয়মান দুষ্ট প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাইতেন। এবং মন্ত্রবলে ঐ দুষ্ট প্রেতাত্মা যাহাতে কাহারও অনিষ্ট সাধন না করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। জনসমাজে ইহারা পিশাচসিদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে চর্চার অভাবে ভূতবিদ্যা তান্ত্রিকগণ "ঝাড় ফুঁকের ওঝা" শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন।

কৌমারভৃত্য তান্ত্রিক সম্প্রদায় (৬)

পূর্বে কৌমার তান্ত্রিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির লেখা কাশ্যপ সংহিতার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। অনেকে স্ত্রী রোগ চিকিৎসার বিষয়বস্তুগুলিকে কৌমার তন্ত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অসৃগ্দর ও যোনি ব্যাপদ প্রভৃতি স্ত্রী রোগ চিকিৎসা কুমার তন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কায় চিকিৎসার অঙ্গীভূত বিষয়।

কৌমারভৃত্য তন্ত্র বিষয়ে বৃদ্ধ জীবকীয় তন্ত্রই প্রধান। তাহার পর পার্বতক ও বন্ধক তন্ত্র নামক অপর দুইখানি তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী টীকায় উহাদের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র নামক আর একখানি তন্ত্র, কৌমারভৃত্য বিষয়ে প্রচলিত ছিল। শ্রীকণ্ঠ দত্ত হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শ্রীকণ্ঠ দত্তের সময়েও হিরণ্যাক্ষ কৌমারভৃত্য তন্ত্র প্রচলিত ছিল। কালার্ক আয়ুর্বেদের কত সুন্দর সুন্দর গ্রন্থের যে বিলোপ সাধন করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশু চিকিৎসা বিষয়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অতি উত্তম ধরণের ছিল। কশ্যপ মুনি শিশু চিকিৎসার আদি বক্তা। ভিক্ষু আত্রেয় শিষ্য জীবক ইহার প্রধান প্রচারক ছিলেন। তক্ষশীলা, বল্লভী, বিক্রমশিলা ও নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তর্গত আতুরালয় গুলিতে কৌমার ভৃত্যের স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল।

জীবক তক্ষশিলায় শিশু রোগ চিকিৎসা বিভাগে শিশু রোগের চিকিৎসা করিতেন। শস্ত্র চিকিৎসা বিষয়েও তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। মাথার খুলি উঠাইয়া মাথার ভিতরের অর্ব্বুদ চিকিৎসা বিষয়েও তাহার কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার কথা কিম্বদন্তী রূপে প্রচলিত ছিল।

জীবক বৃক্ষায়ুর্বেদেও অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতবর্ষে প্রাপ্তব্য সমুদয় ভেষজ, বৃক্ষ ও লতা গুল্মের গুণাগুণ বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। জীবকের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ শোক গাঁথায় লিখিত হইয়াছিল, "হে জীবক আপনার অভাবে ভারতীয় বনৌষধি, বৃক্ষ, লতা গুল্মের কি দুর্দশা হইয়াছে তাহা কি আপনি দেখিতেছেন? ঔষধ রূপে প্রয়োগের অভাবে তাহারা দিবা নিশি কাঁদিতেছে। কত কাল গত হইল ভগবান তথাগতের চিকিৎসক জীবকাচার্য্য লোকান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় বনৌষধি বর্গ অরণ্যানীতে নির্বাসিত হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে আর তাহাদের সমাদর করিনা। শিক্ষা সমাপনান্তে জীবক তক্ষশীলার চতুর্দিকে আট যোজন পরিমিত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া

গুরুকে নিবেদন করিয়াছিলেন : "গুরুদেব আমি তক্ষশীলার চারিদিকে আট যোজন পরিমিত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এমন একটি বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা দেখি নাই যাহা ভেষজ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া জীবক গুরু ভিক্ষু আত্রেয় বলিয়াছিলেন, "বৎস ! এইবার তোমার আয়ুর্বেদ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন হইতে চিকিৎসা করিতে গিয়া তোমাকে আর অনাহারে থাকিতে হইবে না। রোগীর চতুর্দিকস্থ লতা গুল্মাদি তোমার সহায় হইবেন। তুমি তাহাদের সহায়তায় ভারতের যে স্থানে যাইবে, সেই স্থানের চতুর্দিকে অবস্থিত রোগিগণকে অকুতোভয়ে অনায়াসে আরোগ্য করিতে পারিবে। কারণ সমগ্র বনৌষধির সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, "ইহ নহি কিঞ্চিদ্ ভেষজমস্তি" অর্থাৎ পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সকলই ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেবল মাত্র চিকিৎসকগণের তাহাদিগকে জানিবার আগ্রহ থাকা চাই।

রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় (৭)

"যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসী ভেষজং তদ্রসায়নম্"

যে সকল ভেষজ জরা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাধি বিনাশক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাহাদিগকে রসায়ন ভেষজ বলা হইয়া থাকে। এই সূত্রানুসারে বনৌষধি রসৌষধি, জান্তবৌষধি প্রভৃতি রসায়ন গুণযুক্ত সকল প্রকার ভেষজকেই রসায়ন আখ্যা দেওয়া কর্ত্তব্য। কাল প্রভাবে জরা ও ব্যাধি সততই মানব কুলকে গ্রাস করিতেছে। প্রতি নিয়তই প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবগণ নিয়তই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন। বকরূপী ধর্ম্মরাজ যম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জগতের খবর কি ?

তদুত্তরে যুধিষ্ঠীর বলিয়াছিলেন। "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" ?

জগতের সমস্ত ভূতগণকে কাল পাক করিতেছেন। ইহাই জগতের প্রধান বার্ত্তা। অর্থাৎ সকল জীবগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন। আয়ুর্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির এই নিত্য কর্ম বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই জন্য ভারতের সর্ব্বপ্রধান আয়ুর্বেদ সংহিতাকার মহর্ষি অগ্নিবেশ তৎকৃত অগ্নিবেশ সংহিতার চিকিৎসা স্থানের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে রসায়নতন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তল্লিখিত ব্রাহ্ম রসায়ন, আমলকী রসায়ন, চ্যবন প্রাশ ভল্লাতক রসায়ন ঐন্দ্র রসায়ন ইত্যাদি বহুবিধ রসায়ন ক্ষয় নিবারণার্থ নির্মিত হইয়াছিল। প্রথমে ধাতুক্ষয় হইয়া পরে শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং রসায়ন প্রয়োগ করিলে ক্ষয় পূর্ণ হইয়া অনেক ব্যাধি বিনা ঔষধেই আরোগ্য হইয়া থাকে। সেই জন্য মহর্ষি চরক চিকিৎসার প্রারম্ভে রসায়ন প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। আজকাল এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণযুক্ত ঔষধের প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যায়। আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল পূর্বে এই বিষয় অবগত ছিলেন এবং ছাগলাদ্য ঘৃত, ফলঘৃত, কল্যাণঘৃত, অশ্বগন্ধারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট, অশ্বগন্ধা ঘৃত, শতাবরীঘৃত, বসন্তকুসুমাকররস, মকরধ্বজ, শ্রিগোপালতৈল, হিম সাগরতৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈল প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিয়া খাদ্য প্রাণ-যুক্ত ঔষধের সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতেন। ৪ সের মধ্যম নারায়ণ তৈলে ষোল সের দুগ্ধ, ষোল সের শত মূলীর রস, ষোল সের সুপুষ্ট পাকা আমলকীর রস অন্তর্নিহিত থাকে। ইহা খাদ্যপ্রাণ-যুক্ত বিশিষ্ট গুণ বহুল ভেষজের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। চরক সুশ্রুত, বাগভট্টে বহুবিধ রসায়ন প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। রসরত্নসমুচ্চয় রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসকাম ধেনু, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসার্ণব, রসহৃদয়সুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বহু বিধ রসায়নের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় অর্থে কেবল মাত্র রসবৈদ্য সম্প্রদায়কে বুঝায় না। সমগ্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বর্ণিত বিভিন্ন

সম্প্রদায় প্রচলিত রসায়ন অংশকেই বুঝায়। কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রন্থে রাসায়নিক ঔষধের নাম ও তাহাদের প্রস্তুতি বিধির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে রসায়ন বিভাগ বলিলে রসশাস্ত্রকে বুঝায় না। রসশাস্ত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সর্ববৃহৎ অঙ্গ। এই বিষয়ে পরে পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় তল্লিখিত প্রত্যক্ষ শারীরের ভূমিকায় রসায়নতন্ত্র ও রসতন্ত্রকে একই বিষয়ান্তর্গত করিয়াছেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি পাতঞ্জল তন্ত্র, ব্যাড়ি তন্ত্র, মাণ্ডব্য তন্ত্র, বশিষ্ঠ তন্ত্র ও নাগার্জ্জুন তন্ত্রকে রসায়ন তন্ত্র ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে। কারণ রসতান্ত্রিকগণ কেবলমাত্র রসায়ন ঔষধ লইয়াই আলোচনা করেন নাই। পরন্তু তাহারা জ্বর কাসাদি সর্ব্বরোগের চিকিৎসা বিষয়ে ঔষধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুশ্রুত রসায়ন তন্ত্রের প্রত্যঙ্গ লক্ষণ বর্ণনা করিবার সময়ে লিখিয়াছেন। রসায়ন তন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমায়ুর্মেধাবকরং রোগাপহরণ সমর্থঞ্চ। অর্থাৎ যে তন্ত্রের সহায়তায় আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী বয়স বা যৌবন স্থির রাখিয়া দীর্ঘজীবন মেধা ও বল বৃদ্ধি করিয়া রোগ দূর করিতে পারি তাহাকে রসায়ন তন্ত্র কহে। চিকিৎসা স্থানের প্রারম্ভে মহর্ষি চরক যে রসায়ন বিধির ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা তাহাই। অন্য কিছু নহে। চরকোক্ত চিকিৎসা স্থানের প্রথম অধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুনর্ব্বার পাঠ করিলে পাঠক আমার সহিত একমত হইবেন সন্দেহ নাই।

বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায় (৮)

মহামতি ভাবমিশ্র বলিয়াছেন, "জায়তে শরীরে নৃণাং নিত্যং সুরতস্পৃহা" অর্থাৎ মানব শরীরে প্রতিনিয়ত সম্ভোগেচ্ছা বর্ত্তমান। মানুষ তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা প্রতিনিয়ত সম্ভোগ ইচ্ছার বিরুদ্ধে

সংযমের কঠোর বিধান প্রয়োগ করিয়াছে। বহু নিয়ম কানুনের বেড়া-জালে তাহার অসংযত চিন্তাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি মানুষ উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা পায় না।

শীর্য্যতে ইতি শরীরম্।" অর্থাৎ শরীর ক্রমশঃই শীর্ণ হয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য ইহার নাম শরীর। শুক্র ক্ষয় শরীর ক্ষয়ের সর্বপ্রধান কারণ। ইহা হইতেই অগ্নিমান্দ্য উৎপন্ন হয়। এবং অগ্নিমান্দ্যই সর্ব্ব রোগের আদি কারণ। চরক লিখিয়াছেন, "আহারস্য পরং ধাম শুক্রং তদ রক্ষ-মাত্মনঃ। ক্ষয়ো হ্যস্য বহূন্ রোগান্ মরণং বা নিযচ্ছতি"॥ অর্থাৎ তাহার দ্বারাই পরিণামে শুক্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীর রক্ষায় যত্নবান হইয়া শুক্র রক্ষা করিবেন। শুক্রক্ষয়ে বহুরোগের উৎপত্তি হইয়া অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে।

কি ভাবে শুক্র রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কি ভাবে কখন শুক্র ক্ষয় করা কর্ত্তব্য, কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীরে শুক্রের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বাজীবৎ মৈথুন সামর্থ্য জন্মে, এই সকল বাজীকরণ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অতি প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগেরও অনেক পূর্বে মহাদেব এই শাস্ত্র বিষয়ে পার্ব্বতীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার শিষ্য নন্দী এই বিষয়ে বৃহৎ গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন। উপনিষদের যুগে শ্বেত কেতু উদ্দালক ও ব্রাভব্য প্রভৃতি এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

তাহার পর কুচুমার নামক ব্যক্তিবিশেষ স্বনামে কুচুমার তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আচার্য্য বাৎস্যায়ন বা কৌটিল্য কাম সূত্র নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কাল ক্রমে তাহাও আয়ুর্বেদীয় বাজীকরণ তন্ত্রে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাজীকরণ তন্ত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ।

নাড়ী বিজ্ঞান

নাড়ী বিজ্ঞান আয়ুর্বেদীয় রোগ চিকিৎসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

প্রাগবৈদিক যুগ হইতে নাড়ীবিজ্ঞান প্রচলিত আছে। নাড়ীবিজ্ঞানের বক্তা মহেশ্বর এবং শ্রোতা মহেশ্বরী। তৎকৃত "নাড়ী বিজ্ঞান" এই শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। মহেশ্বরের শিষ্য লঙ্কেশ রাবণ এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রণেতা। রাবণকৃত নাড়ীবিজ্ঞান অতি উত্তম গ্রন্থ। ইহা বর্ত্তমানে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যদেব বাসিষ্ঠ অতি বিস্তৃত এবং উপাদেয় টীকা ও ভাষ্যের সহিত ইহা মুদ্রিত করিয়াছেন। মহাদেবকৃত নাড়ী বিজ্ঞান অতি উত্তম গ্রন্থ। রাবণের পরে কণাদ ও গৌতম নাড়ী বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্মান করেন। তাহার পর, প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ গঙ্গাধর রায় রাবণ, কণাদ ও গৌতমের নাড়ী বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি একত্রিত করিয়া "নাড়ী বিজ্ঞান" নামক একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন।

ইহাতে তিনি একটী অতি উত্তম টীকা সংযোজিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহার পর দত্তরাম চতুর্বেদী প্রণীত নাড়ীদর্পণ নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য। নাড়ীজ্ঞানতরঙ্গিনী, নাড়ীপরীক্ষা, প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় হিন্দি অনুবাদের সহিত লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন ও ডাক্তার আশুবাবু ইংরাজী ভাষায় নাড়ীবিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বাংলা অনুবাদের সহিত একখানি নাড়ীবিজ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছে। তৎপূর্বে শক্তিগোত্রজ আনন্দ সেন বংশজাত শঙ্কর সেন কর্তৃক "নাড়ী প্রকাশ" নামক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। গঙ্গাধর এইগ্রন্থেরও একটি টীকা করেন। বর্ত্তমান ভারতে নাড়ী বিজ্ঞান বিষয়ে সবশ্রেষ্ঠ পুস্তক রাজবৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় লিখিত ভারতীয় নাড়ী বিজ্ঞান নামক গ্রন্থ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নাড়ীবিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন না। আধুনিক কবিরাজগণও সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকেন। যুক্তি স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে (ক) নাড়ী

বিজ্ঞানের কথা বৃদ্ধত্রয়ীতে নাই। (খ) ইহাতে গণিত শাস্ত্রের মত সত্য সংবাদ প্রকাশিত হয় না। (গ) ইহা ব্যক্তিগত অনুভবসিদ্ধ বিষয়। (ঘ) ইহা অনুভব কারীর ব্যক্তিগত কুশলতার উপরে নির্ভরশীল। (ঙ) নাড়ী বিজ্ঞানে শিরা, ধমনী প্রভৃতি তত্ত্বতঃ পৃথকার্থক হইলেও একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকতা নাই। (চ) সেই জন্য ইহার সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত নহে। সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা চলে না। (ছ) সিদ্ধান্তের দিক হইতে ইহা অশাস্ত্রীয়। (জ) উহা কেবল মাত্র হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা জ্ঞাপক। উহার দ্বারা সর্ব্বাবয়বের স্বরূপ জ্ঞান নিণিত হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত মিশ্র আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় নাড়ীবিজ্ঞানকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। বঙ্গ দেশের মিশ্রায়ুর্বেদ বিদ্যালয়গুলিতে নাড়ী-বিজ্ঞান পাঠরূপে নির্দ্ধারিত ও প্রচলিত হয় নাই, বলিয়া বাংলার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ কলেজগুলিতেও রোগ পরীক্ষার অপূর্ব প্রধান উপকরণ নাড়ীবিজ্ঞানের স্থান হয় নাই। কারণ উক্ত পাঠ্যতালিকা নির্ম্মানের সময় বৃদ্ধ, শুদ্ধ ও সিদ্ধ বৈদ্যগণের মত গ্রহণ করা হয় নাই। তথাকথিত মিশ্র আয়ুর্বেদ সেবিগণের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনু-সারে উহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি বিচারের ধোপে টিকে না। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে সর্ব্বভাবে সাহিত্যের এবং চারুকলা বিদ্যার সহিত সম্পর্ক শূন্য নহে। সকল সময়ে কেবল মাত্র গাণিতিক সত্য নিরূপণের দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। শাস্ত্রবিদও কর্মকুশল চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চিকিৎসা নৈপুণ্য, বুদ্ধি ও রোগ নির্দ্ধারণ করিবার দক্ষতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদ্দণ্ডে সুভেষজ প্রয়োগের ক্ষমতা কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সর্বক্ষেত্রে রক্ত, মূত্র, পুরীষ নিষ্ঠিবন পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয়ের সুযোগ, সুবিধা, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সর্ব্বোপরি সর্বত্র দক্ষ রাসায়নিক ও কর্ম কুশল চিকিৎসকের

অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। বহু ক্ষেত্রে তদ্দণ্ডেই চিকিৎসকের ব্যক্তিগত কুশলতা ও ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নিবাচন করিতে হয়। ভারতীয় নাড়ী বিজ্ঞান এই কার্য্যে সুচিকিৎসকের প্রধান সহায়ক। নাড়ীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য :—

(১) নাড়ী বিজ্ঞানের সহায়তায় তৎক্ষণাৎ ত্রিদোষ তত্ত্বের স্বরূপ দ্বারা রোগ নির্ণয় সহজ সাধ্য হইয়া থাকে।

ইহার দ্বারা অতি সহজেই রোগীর আভ্যন্তরিক প্রকৃতিগত বৈষম্যের ও স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। (৩) রোগের স্বরূপ এবং রোগোৎপাদক দোষেরও স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্রানুসারে দোষের সমতা রূপ আরোগ্য সাধন সহজ সাধ্য হইয়া থাকে।

যদি ষ্টেথস্কোপের সাহায্যে আকর্ণনের দ্বারা হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের স্বরূপ জ্ঞান সহজ সাধ্য হইয়া থাকে, যদি টেলিগ্রাফের দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে শব্দ গ্রহণ সম্ভব হইয়া থাকে, যদি কেবল মাত্র টরে টক্কা, টরে টক্কা, টরে টক্কা, টরে টরে ইত্যাদি শব্দ মাত্র শ্রবণ করিয়া শব্দ প্রেরক ও শব্দ গ্রাহকের মধ্যে ভাবের ও সংবাদের আদান প্রদান কেবল মাত্র শব্দের বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গী দ্বারা, সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানব দেহের অভ্যন্তরস্থিত ধমনী বিশেষের আভ্যন্তরিক গতির তারতম্যানুসারে সঠিক রোগ নির্ণয় করা নাড়ী গতিজ্ঞের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। ইহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ষ্টেথস্কোপের সাহায্যে যখন কোন চিকিৎক কেবল মাত্র শব্দ গ্রহণ সাহায্যে কোন রোগ নির্ণয় করেন, বা কোন রোগীর বা ব্যক্তি বিশেষের শরীরাভ্যন্তর স্থিত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেন, বা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তিনি উহা কোন তুলাদণ্ডের সাহাযে

নির্ণয় করেন না। যেমন কোন মৃদঙ্গ বিশারদ সুমধুর কীর্ত্তনের স্বরলহরী শ্রবণ মাত্রেই উদ্বেলিত হৃদয়ে মৃদঙ্গে যথা সময়ে সঙ্গত বা আঘাত করিতে আরম্ভ করেন, নাড়ী বিজ্ঞানীও তদ্রূপ নাড়ীর বিভিন্ন বিচিত্র গতির স্পর্শের দ্বারা অনুভব করিয়া রোগীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

যেমন স্টেথস্কোপ দ্বারা হৃদপিণ্ডের অবস্থা নির্দ্ধারণ করা সকল চিকিৎসকের পক্ষে সমান ভাবে সম্ভব পর নহে, সেইরূপ সকল চিকিৎ-সকের পক্ষে সমভাবে নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। পথের ধারে ড্যাফোডিলস্ ফুল ফোটে। বহু লোক পথ দিয়ে চলে যায়। কেবল মাত্র কবির হৃদয়ে তাহারা চির সুষমাময় কবিতা লিখিবার প্রেরণা জাগায়। বহু লোক ড্যাফোডিলস ফুটতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু কেবল মাত্র কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ সেইগুলিকে চিরস্মরণীয় কবিত্বের রূপ দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াছেন। শ্যামের বাঁশী "বাজে কানে বাজে না"। "বাঁশী বাজে আপন মনে, যার যেমন কান তেমনি শুনে"। কোবিদ এবং কৃতি চিকিৎসকই এই বাঁশীর গান অর্থাৎ নাড়ীর গতি জ্ঞান দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে উপযুক্ত চর্চ্চা এবং সদগুরুর উপদেশের অভাবে রোগ নির্ণয়ের এই অদ্ভুত বিদ্যা বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষ হইতে ক্রমশঃ বিদূরীত হইতেছে। নাড়ীবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার পূর্বে চিকিৎসককে কতগুলি পারিভাষিক নিয়ম কানুন আয়ত্ত করিতে হয়। কেবল মাত্র ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা দ্বারায় তাঁহার এই শাস্ত্রে প্রবেশা-ধিকার হয়। ইহার জন্য ধৈর্য্য, মানসিক শক্তি, মনোসংযোগ, অধ্যবসায় এবং কিঞ্চিৎ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন হয়। বৈদিক ত্রিদোষ বিজ্ঞানের উপর নাড়ীবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। অঙ্গুষ্ট মূলে যে জীব সাক্ষিণী

ধমনী বা নাড়ী আছে তাহার গতি বিজ্ঞানের দ্বারাই চিকিৎসক, মানব শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। বস্তি, হৃদয় এবং মস্তিষ্ক এই তিনটী মানব দেহের প্রধান মর্ম। ইহারা যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের আভ্যন্তরিক আবাসভূমি। অভিজ্ঞতা জন্মিলে নাড়ী গতির দ্বারা ইহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র নাড়ী বিজ্ঞানই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের রোগ পরীক্ষা করিবার একমাত্র উপায় নহে। ইহা ছাড়া, দর্শন, স্পর্শন, পরিপ্রশ্ন, রক্ত, মূত্র, কফ ও পুরীষাদির পরীক্ষার দ্বারাও রোগ পরীক্ষার বহু প্রকার বিধি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে। অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগন রোগ পরীক্ষা ক্ষেত্রে সেই গুলির ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বীজাণু বিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ত্ব বিজ্ঞান

আয়ুর্বেদ বীজাণুতত্ত্বে বিশ্বাসী কিন্তু ক্ষেত্র তত্ত্বানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে উষর ক্ষেত্রে বীজাণু সংক্রামিত হয় না। উর্ব্বর ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। দোষ ধাতু মলের সমতা সম্পাদনই চিকিৎসকের একমাত্র কাম্য বস্তু। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ রোগবীজাণুর উপর নিক্ষিপ্ত হইলে বীজাণু মরে না। কিন্তু ঔষধগুলি মানব শরীরে প্রদত্ত হইলে, উহারা শরীরকে রোগমুক্ত করিতে সমর্থ হয়।

অনেক সময় দেখা যায় মানব শরীরে বীজাণু আছে কিন্তু রোগ নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে শরীরে রোগ আছে কিন্তু বীজাণু নাই। এই জন্য আয়ুর্বেদীয় নিদানতত্ত্ববিদ্ বীজাণুকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দেশ না করিয়া রোগের উপসর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অরিষ্ট বিজ্ঞান

আয়ুর্বেদীয় নাড়ী বিজ্ঞানের সঙ্গে অরিষ্ট বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট সংহিতায় অরিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। আয়ুর্বেদীয় জীববিজ্ঞান বিকৃতিবিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শনের ফলেই অরিষ্ট বিজ্ঞানের উৎপত্তি। অরিষ্ট লক্ষণের উৎপত্তি না হইলে মৃত্যু হয় না এবং অরিষ্টের উৎপত্তিনা হইলে মৃত্যুর কোন কারণ উপস্থিত হয় না। সেই জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ব্যাধির সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়ের জন্য আরিষ্ট বিজ্ঞানের উপরনির্ভর করেন। অনেক সময় প্রকৃত অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত না হইয়া অরিষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহার জন্য অদূরদর্শী চিকিৎসকের অরিষ্ট জ্ঞানে ভুল হইয়া থাকে। চরক বলিয়াছেন যে ব্যাধি বিশেষের এমন কতগুলি লক্ষণ আছে যেগুলি উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি আর সেই রোগের চিকিৎসা করিতে চাহেন না। "অপি যত্নং কৃতং বালৈ বুধস্তত্র ন রমতে"। পরন্তু বালক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই সেইস্থলে কার্য্য করেন, পণ্ডিতগণ সেইখানে কোন প্রকার যত্ন করেন না। কিন্তু আধুনিক এন্টিবায়োটিক চিকিৎসার যুগে চিকিৎসকগণ রোগের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণে কালক্ষেপ করা সমীচীন মনে না করিয়া সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রযত্নে এন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন।

আয়ুর্বেদীয় নাড়ী বিজ্ঞানের একটি সূত্র কিরূপ অরিষ্ট জ্ঞাপক এবং গম্ভীরার্থ প্রকাশক তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। নাড়ী বিজ্ঞানে লিখিত হইয়াছে।

দুর্বলে সবলা নাড়ী।
সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা ॥
সবলে দুর্বলা নাড়ী।
সা নাড়ী প্রাণ ঘাতিকা ॥

অর্থাৎ দুর্বল রোগীর নাড়ী সবল হইলে উহা তাহার প্রাণ ঘাতক হইয়া থাকে। এবং সবল রোগীর দুর্বল নাড়ী হইলে উহাও তাহার প্রাণ ঘাতক হইয়া থাকে। এই দুইটি সূত্র কথিত দুইটি কাল ব্যাধি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হইয়া বৈজ্ঞানিকগণের শিঃরঃপীড়া উৎপন্ন করিতেছে।

কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ অত্যন্ত গভীর অরিষ্ট জ্ঞাপক রূপে উহাদের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের শেষ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুইটী ক্ষেত্রেই রোগীর হৃদপিণ্ডের অত্যন্ত দুরবস্থার কথা সূচনা করে। মানব শরীরে মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বস্তি এই তিনটী মর্ম্মের যে কোন একটী খারাপ হইলে এবং রোগীর শোনিতোচ্ছ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে রোগীর উক্ত প্রকার জটিল অবস্থা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। উহাদের একটির নাম High blood pressure এবং আর একটির Low bood pressure. দুইটী ব্যাধিই মারাত্মক অরিষ্ট লক্ষণযুক্ত এবং উহাদের কবল হইতে কদাচিৎ কেহ মুক্তি পাওয়া থাকে। কারণ "অরিষ্ট মরণং ধ্রুবম্" এই ঋষিবাক্যের কখনও অন্যথা হইতে দেখি নাই।

রোগভোগ কালে রোগীর শরীরে রোগভোগ জনিত এইরূপ একটি অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন রোগীর শরীরে বিভিন্ন প্রকার বীজাণু আভির্ভূত হইয়া থাকে। এই সকল বীজাণু রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে রোগীর শরীরে পুর্ব্বে কখনও ছিল না। অমিতাচার রূপ দুষ্কৃতির ফলে শরীর রূপ ক্ষেত্র বিকৃত হইলে, তাহাতে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় বীজাণুরূপ উপসর্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদীয় নিঘণ্টুর বিবরণ

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু (১) বৃদ্ধত্রয়ীতে দ্রব্যগুণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকিলেও ধন্বন্তরি আদি নিঘণ্টু বক্তা। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে ৩৭৩টী দ্রব্য, গুড়ুচ্যাদি, শতপুষ্পাদি, চন্দনাদি, করবীরাদি, আম্রাদি, সুবর্ণাদি, ও মিশ্রকাদি, এই সাত বর্গে বিভক্তীকৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে। ধন্বন্তরী বলিয়াছেন। কতদ্রব্য আছে তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল দ্রব্যের গূঢ়াগূঢ় প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভিন্ন দেশ প্রথিত নাম যে কত আছে তাহারও সংখ্যা নাই। কূপে প্রচুর জল আছে, কিন্তু যাহার যত টুকু প্রয়োজন সে ততটুকু লইয়া থাকে। অতএব নিঘণ্টু রূপ বারিধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়া আমি এই নিঘণ্টু প্রকাশ করিতেছি। জাতি, আকৃতি, বর্ণ, বীর্য্য, রস ও প্রভাবাদি অনুসারে এক দ্রব্যের বহু নাম এবং বহু দ্রব্যের এক নাম প্রথিত আছে। তাহার পর কেহ সেই ভেষজ বিশেষের একটী মাত্র নাম শুনিয়াছেন, তিনি এই একটি নামেই দ্রব্যটিকে জানেন। অন্যে উহার আর একটি নাম জানেন এবং তাঁহার নিকট উহা ঐ নামেই পরিচিত। এইরূপ তৃতীয় লোকের নিকট হয়ত আর একটি নামে ঐ ভেষজ বিজ্ঞাত।

অতএব ভিষক প্রাকৃত, সংস্কৃত বহু নাম জানিয়া, এবং বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, স্পর্শ করিয়া এবং ভেষজের জাতি লক্ষণাদি বিবেচনা পূর্ব্বক যত্ন সহকারে ভেষজের পরিচয় করিবেন। প্রাকৃত নামগুলিকে অন্যায় পূর্ব্বক উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ গোপাল, তাপস, ব্যাধ, এবং অন্যান্য বনচারিগণ অনেক ভেষজের সহিত সুপরিচিত। ইহারা প্রায় প্রকৃত নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভেষজের উল্লেখ করিয়া থাকে। হইলই বা

প্রকৃত নাম। এই প্রকৃত নামে যদি আমার পরিচয় জ্ঞান নির্বাদে হয়, তাহা হইলে প্রাকৃত বলিয়াই কি ইহা সদোষ হইবে। চিকিৎসকের পক্ষে নিঘণ্টু জ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষোক্তি করিয়া ধন্বন্তরি বলিয়াছেন সমস্ত চিকিৎসার মূলে আছে ভেষজ। সুতরাং যে চিকিৎসকের দ্রব্যগুণ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নাই, তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে হাস্য ভাজন হইয়া থাকেন।

মদনপাল নিঘণ্টু মদনবিনোদঃ—সৌরাষ্ট্রস্থিত কচ্ছের রাজা মদন পাল কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ সংগৃহীত। গ্রন্থারম্ভে মদনপাল বলিয়াছেন, যে মদন পাল পূর্ব লিখিত বহু নিঘণ্টু গ্রন্থ হইতে এই মদন পাল নিঘণ্টু সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনায় রাজা বাহাদুর অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির ও কৃষ্ণ ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মদনপাল নিঘণ্টু পশ্চিম ভারতে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা দ্রব্যগুণ বিষয়ে অতি উত্তম গ্রন্থ।

(৩) **রাজ নিঘণ্টু**—নরহরি ইহার প্রণেতা। ইহার অপর নাম অভিধান চূড়ামণি, ইহার অভিধান চূড়ামণি নাম অন্বর্থ। রাজ নিঘণ্টু পাঠ না করিলে দ্রব্যগুণাভিধানে কত শ্রম ব্যক্তিরও নিঘণ্টু জ্ঞান সর্ব্বত্র অমুঠিত ও অপ্রতিহত হইবে না। দুঃখের বিষয় যে এইরূপ সুভাষিত, বহুল দ্রব্যগুণাবিধানের বঙ্গদেশে অধিক প্রচার হয় নাই। পুনার অনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত রাজ নিঘণ্টুর সংস্করণ অতি উপাদেয়।

(৪) **দ্রব্যগুণ সংগ্রহ** অপর উল্লেখযোগ্য নিঘণ্টু চক্রপাণি রচিত "দ্রব্যগুণ সংগ্রহ"। বিবিধ খাদ্যোষধ ও কৃতান্নবর্গের গুণসংগ্রহার্থে এইদ্রব্যগুণ রচিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় তাহাদের গুণাগুণ ইহাতে লিখিত হয় নাই। চক্রপাণি গৌড়েশ্বরের রাজবৈদ্য ছিলেন। গৌড়েশ্বর প্রায়শঃই তাহাকে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের

গুণাগুণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেন। সেইজন্য তিনি এই দ্রব্যগুণ সংগ্রহ রচনা করিয়া ছিলেন। ইতিপূর্বে কোন নিঘণ্টু গ্রন্থের টীকা রচিত হয় নাই। কিন্তু চক্রপাণির উপর ভক্তির অতিশয্য বশতঃ শিবদাস সেন দ্রব্যগুণ সংগ্রহের একটী উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন।

(৫) **রাজবল্লভঃ**—রাজ বল্লভ বৈদ্যকৃত নিঘণ্টু গ্রন্থ। রাজবল্লভ বৈদ্য রাঢ় দেশীয় লোক ছিলেন। প্রভাতাদি অহিককৃতানুসারে রাজ বল্লভ অধ্যায় পঞ্চকে বিভক্ত। ষষ্ঠাধ্যায়ে ঔষধের গুণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটী ভাবে লিখিত হইয়াছে।

(৬) **ভাবপ্রকাশান্তর্গত দ্রব্যগুণসংগ্রহ**—দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কর্মভ্যাসের পক্ষে ভাবপ্রকাশান্তর্গত দ্রব্যগুণ সংগ্রহ শ্রেষ্ঠতম। মোগল সম্রাটগণের ভারত শাসনকালে এইগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইউনানী চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত দেশান্তরাগত কতগুলি ভেষজের গুণ ভাব প্রকাশে বিবৃত হইয়াছে।

চক্রপাণির পৃষ্ঠপোকেতায় ভাব মিশ্রের সময়ে রস চিকিৎসা ভারতে প্রকাশ্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ভাব প্রকাশোক্ত দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানে রসৌষধি সমূহের গুণাগুণ বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই অংশে ভাব প্রকাশ রাজ নিঘণ্টু অপেক্ষাও উপাদেয়।

বৈদ্যকোক্ত কতগুলি দ্রব্যগুণাভিধানের নাম এখানে লিখিত হইল। (১) লক্ষণ টিপ্পন, (২) হলায়ুধ, (৩) চন্দনন্দন কৃত গণনিঘণ্টু (৪) ভোজ রাজনিঘণ্টু (৫) বোপদেবকৃত হৃদয় দীপ, (৬) মুদগলকৃত দ্রব্য রত্নাকর নিঘণ্টু (৭) কেয়দেবকৃত কেয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু (৮) কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র (৯) বিশ্বনাথ কৃত পথ্যাপথ্যনিঘণ্টু (১০) ত্রিমল্লভট্ট দ্রব্যগুণ-শতশ্লোকী (১১) রত্নাবলী (১২) রত্নমালা (১৩) মাধবকৃত দ্রব্যাবলী (১৪)

জুনাগড় নিবাসী রঘুনাথজী ইন্দ্রজী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নিঘণ্টু সংগ্রহ (১৫) মুরদাবাদ বাসী শালিগ্রাম বৈদ্য সঙ্কলিত বৃহন্নিঘণ্টু রত্নাকর। (১৬) শেষ রাজকৃত কেয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু।

ইউরোপীয় চিকিৎসক ও উদ্ভিদ বিদ্যাবেত্তৃগণ এবং ভারতীয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাবলীর গুণবর্ণনা করিয়া কতগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি। ১। মেটিরিয়া মেডিকা পাটনা—ডাঃ আরভিনকৃত, ২। পাঞ্জাব প্লাণ্টস—ডাঃ ফটুয়াট কৃত, ৩। বোম্বে ড্রাগস্—ডাঃ শঙ্করণ অর্জ্জুন, ৪। ইউজফুল আণ্টস অব ইণ্ডিয়া—ডাঃ হিবার ডোরি, ৫। বেঙ্গল ডিসপেনসেটরী—ডাঃ ওসেনশী, ৬। বাজার মেডিসিন ডাঃ ওয়ারিং কৃত, ৭। ইণ্ডিয়ান হার্ব্বালিষ্ট—শ্রীনবীনচন্দ্র পাল, ৮। ফার্ম্মাকো গ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ডিমক, ওয়াডেন ও হুপার, ৯। মেট্রিরিয়া মেডিকা অব ইণ্ডিয়া এণ্ড দেয়ার থেরাপিউটিক রস্তমজী ও নানাভাই নস্রনজী কৃত, ১০। এ, ডিকসনারী অব দি ইকোনমিকা প্রডাকটস অব ইণ্ডিয়া—ডাঃ ওয়াট কৃত, ১১। ইণ্ডিজেনশ ড্রাগস অব ইণ্ডিয়া—ডাঃ কানাইলাল দে, ১২। দি মেটিরিয়া মেডিকা অব দি হিন্দুস—ড়াঃ উদয় চাঁদ দত্তকৃত। ডাঃ নাদকর্ণী ও কর্ণেল চোপরা কৃত গ্রন্থ দুইখানি হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

উল্লিখিত পুস্তকগুলিতে ভারতীয় ভেষজ দ্রব্যের গুণাগুণ আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে আয়ুর্বেদের এবং নব্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাণত হইয়াছে। ত্রিদোষ বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া দ্রব্যের রস বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবানুসারে তাহাদের গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদের ত্রিসূত্র বিজ্ঞানে প্রবেশাধিকার না হইলে, আয়ুর্বেদ বর্ণিত দ্রব্যগুণাবলীতে প্রত্যয় হয় না। এইজন্য বহু ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ বর্ণিত দ্রব্যগুণাবলীর সহিত আধুনিক

নব্য বিজ্ঞানানুমোদিত গুণ সমূহের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নব্য বিজ্ঞানানুমোদিত ভেষজ গবেষণাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ভারতীয় ভেষজ বিষয়ে নিত্য গবেষণা হইতেছে। কিন্তু এই সকল ভেষজানুসন্ধানের মূল সূত্রগুলি গবেষকগণ কোন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিতেছেন। ভেষজ গবেষনার উৎস সন্ধান করিতে হইলে পৃথিবীর আদি গ্রন্থ চতুর্বেদের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। কেন না প্রাগ্‌বৈদিক যুগের গ্রন্থ সমূহ নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাদের কোন অস্তিত্ব বর্ত্তমানকালে পাওয়া যায় না। প্রাগ্‌বৈদিক যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান পরম্পরা ক্রমে বৈদিক যুগে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিগণ স্বতন্ত্রভাবে ভেষজদ্রব্যের গুণাগুণ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের একটী স্বতন্ত্র প্রারম্ভিক রূপ বৈদিক ঋষিগণের প্রদত্ত বিবরণের মধ্য হইতে আমরা দেখিতে পাই। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন পৃথিবীতে যতদ্রব্য আছে সমস্তই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। সুতরাং আয়ুর্বেদের ঔষধ ভাণ্ডার সর্বদায় সম্পূর্ণ। কারণ অধিকাংশ দ্রব্যের গুণ আয়ুর্বেদ মতে বৃদ্ধত্রয়ী এবং অন্যান্য নিঘণ্টু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। চরকের পঞ্চাশৎ মহাকষায় এবং সুশ্রুতের সপ্তত্রিংশৎগণ নির্দ্ধারণে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুসন্ধিৎসা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা অন্যত্র দুর্লভ। দ্রব্যগুণ নির্দ্ধারণে আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্রই দোষানুগ।

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা প্রণালীও দোষানুগ। আয়ুর্বেদের রোগ বিনিশ্চয় ও বিকৃতিবিজ্ঞানও দোষানুগ। সেইজন্য ত্রিদোষ সিদ্ধান্তে অকৃতশ্রম ব্যক্তিগণ সহজে ইহার মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ নহেন। সেইজন্য ব্যাধি বিশেষে আয়ুর্বেদের দ্রব্য বিশেষের প্রয়োগ বিষয়ে খবর পাইয়া তাঁহারা সেই-দ্রব্যের সেই রোগের ক্রিয়া বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য নব্য

বিজ্ঞানানুযায়ী গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার গবেষণায় আয়ুর্বেদের কোন উপকার হয় না। পরন্তু ব্রিটীশফার্মাকোপিয়ার কলেবরও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমানে আয়ুর্বেদের গবেষণার নামে যে গবেষণা হইতেছে তাহাতে আয়ুর্বেদের কিছু মাত্র উন্নতি না হইয়া এলোপ্যাথির বিকাশ হইতেছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কিন্তু কোন দিনই ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদগণের এবং দ্রব্য গুণ বিজ্ঞান বিশারদগণের নিকট হইতে গৃহীত অপরিশোধ্য ঋষিঋণের কথা কোথাও খুলিয়া বলেন নাই। ঋণ স্বীকার আর্য্যঋষির একটি প্রধান অঙ্গ। আধুনিক গবেষকগণের অনেকেই এই সনাতন আর্য্যকৃষ্টির ধার ধারেন না।

কবিরাজ বিরজা চরণ গুপ্তের বনৌষধি দর্পণ আধুনিক যুগের দ্রব্যগুণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তক। এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর ও তথ্যবহুল নিঘণ্টু গ্রন্থ আর লিখিত হয় নাই। সম্প্রতি বঙ্গের বাহিরে অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনেকগুলি নিঘণ্টু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই বনৌষধি দর্পণের অধমর্ণ। বড়ই দুঃখের বিষয় বৈদ্যশাস্ত্রের অতি গৌরবের বস্তু এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহার মাত্র দুইটী সংস্করণ হইয়াছিল। ইহাতে চরক, সুশ্রুত, বাগভট, বৃন্দ, বঙ্গসেন, চক্রদত্ত, শাঙ্গধর ও ভাবপ্রকাশ এই আটটী গ্রন্থের বনৌষধির প্রয়োগবিধি সকল অতিশয় অধ্যবসায় এবং কুশলতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়। বঙ্গের বাহিরে হিন্দিভাষায় যে সকল নিঘণ্টু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৈদ্য যাদবজী ত্রিকমজী কৃত দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বঙ্গীয় নিঘণ্টুকারগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ভাঙ্গিয়া অষ্টাদশাঙ্গ আয়ুর্বেদে পরিণত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের উহাই নিয়ম। বিজ্ঞান গবেষণার ফলে ক্রমশঃ বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে গমন করিয়া থাকে। আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গদশ বিভাগ যথা—(১) কায়, (২) শারীর, (৩) শল্য, (৪) শালাক্য, (৫) ভূতবিদ্যা, (৬) অগদতন্ত্র, (৭) কৌমারভৃত্য, (৮) রসায়ন, (৯) বাজীকরণ, (১০) নিঘণ্টা শাস্ত্র, (১১) ভেষজ নির্ম্মাণ বিজ্ঞান, (১২) স্ত্রীরোগ ও গর্ভিনীরোগ চিকিৎসা (১৩) আয়ুর্বেদের ইতিহাস, (১৪) আয়াস্বাস্থ্যবিজ্ঞান, (১৫) বিকৃতি বিজ্ঞান, (১৬) নাড়ী বিজ্ঞান, (১৭) রসচিকিৎসা, (১৮) আয়ুর্বেদ দর্শন, উল্লিখিত বিষয়গুলি আয়ুর্বেদীয় মূল আকর গ্রন্থে নিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফল স্বরূপ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ অষ্টাদশাঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কালক্রমে আরও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারে। যেমন পথ্যাপথ্য বিজ্ঞান কায়চিকিৎসার একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও বর্ত্তমানে একটী স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে বিবেচিত হইতেছে। বিগত চার বৎসর পূর্ব্বে আমি রসচিকিৎসার বা হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছি। ভগবান বাসুদেবের কৃপায় উহা মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে রসচিকিৎসার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পুনরুক্তি দোষভয়ে ঐ সকল বিষয় এখানে না লিখিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও ছাত্রগণের হিতার্থে বর্ত্তমানে প্রাপ্তব্য রসচিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত পুস্তকগুলির নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

(১) রসকৌমুদী (মাধব) (২) রসমঞ্জরী (শালীনাথ) (৩) রসেন্দ্রকল্পক্রম (রামকৃষ্ণ ভট্ট) (৪) রসপ্রদীপ (অজ্ঞাতনামা) (৫) রসেন্দ্রচিন্তামণি (রামচন্দ্র গুহ) (৬) রসসঙ্কেতকলিকা (চামুণ্ডা) (৭) রসসারামৃত (রামসেন) (৮) রসরত্নাকর (নিত্যনাথ) (৯) বৈদ্যামৃত ও (১০) বৈদ্যবৃন্দ (বৈদ্যনারায়ণ কৃত) (১১) রসরত্নসমুচ্চয় (বাগভট্ট) (১২) রসরাজমহোদধি (বো) (১৩) রসরাজমহোদয় (বো) (১৪) বৃহৎ রসরাজসুন্দর (বো) (১৫)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ (গোপাল ভট্ট) (১৬) রসচন্দ্রিকা (নীলাম্বর) (১৭) রসপ্রকাশসুধাকর (যশোধর) (১৮) রসযোগমুক্তাবলী (নরহরি) (১৯) রসেন্দ্রবারিধি (প্রভাকর) (২০) রসরত্নমালা (নিত্যনাথ) (২১) রসসার (গোবিন্দাচার্য্য) (২২) রসার্ণব (নাগার্জ্জুন) (২৩) রসযোগসাগর (হরিপ্রপন্নজি) (২৪) রসতরঙ্গিনী সদানন্দ (২৫) রসজলনিধি (ভূদেব) (২৬) রসামৃত (যাদবজী) (২৭) রসেন্দ্রপুরাণ (রামপ্রসাদ) (২৮) কূপীপক্ক-রসনির্মাণ বিজ্ঞান (হরিশরণানন্দ) (২৯) ভস্মবিজ্ঞান (হরিশরণানন্দ) (৩০) খনিজবিজ্ঞান (প্রতাপ সিংহ) (৩১) আয়ুর্বেদ প্রকাশ (গুলরাজ শর্ম্মা) (৩২) রসেন্দ্রসার (ঘনানন্দ পন্ত) (৩৩) ভারতীয় রসশাস্ত্র (ডাঃ বামন গণেশ দেশাই) (৩৪) রসরত্নপ্রদীপ বাগেশ্বর) (৩৫) রসায়নসার (শ্যামসুন্দরাচার্য্য) (৩৬) পারদসংহিতা (নিরঞ্জন গুপ্ত) (৩৭) ভারতীয় রস বিদ্যা (প্রভাকর) (৩৮) রসচিকিৎসা (প্রভাকর) (৩৯) হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (প্রভাকর) ইহা ছাড়া রসচিকিৎসার সহস্রাধিক পুঁথী আমার সংগ্রহ শালায় কীটদষ্ট হইয়া পচিতেছে। বর্ত্তমান ভারতে আয়ুর্বেদের পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি নাই। রাজাশ্রয় ব্যতিরেকে সুকুমার কলা বাঁচিতে পারে না। তাহার ফলে প্রতিদিন প্রতিপদে শুদ্ধায়ুর্বেদের মৃত্যু ঘটিতেছে। দেশের বৈদ্যগণ নির্বাক দ্রষ্টারূপে কাল যাপন করিতেছেন। মল্লিখিত হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসে রসচিকিৎসার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য উহা পাঠ করিতে পারেন। রসচিকিৎসার আদি জ্ঞাতা ব্রহ্মা এবং আদি বক্তা মহেশ্বর। তৎপরে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে উহা বিষ্ণু, ভাস্কর, দক্ষ প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গ-রাজ্যে ইহার বহুল প্রচার করেন। আর্য্যাবর্ত্তের জনগণের রোগ নিবারণ কল্পে আত্মজ ইহা ইন্দ্রের নিকট হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আনয়ন করেন এবং

ঋষি সভায় উহা বিবৃত করেন। তৎপ্রদত্ত বিবৃতি শ্রবণ করিয়া প্রশস্ত বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, শুক্রাচার্য্য প্রমুখ ঋষিগণ রসশাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া তদানীন্তন বৃহত্তর ভারতে উহার বহুল প্রচার করেন। বিশেষতঃ মহামুনি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে উহার বহুল প্রচার করিয়া রসসিদ্ধ সম্প্রদায় নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। উত্তর ভারতের মণ্ড, মাণ্ডব্য, ব্যাড়ি, আদিম, প্রভৃতি ঋষিগণ উত্তর ভারতে উহার প্রচার করেন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া মহামুনি অগস্ত্যের শিষ্যবৃন্দের নিকট হইতে রসবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া এবং হাতে কলমে রসশাস্ত্র লিখিত পদ্ধতি সকল আয়ত্ত করিয়া স্বলিখিত রামরাজীয় নামক তন্ত্রে উহা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি স্বহস্ত নির্মিত স্বর্ণদ্বারা সীতার স্বর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় রসায়ন শাস্ত্রাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাহার পর সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিয়া তিনি রাবণ প্রতিষ্ঠিত রসশালা দর্শন করিয়া হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের অনেক নূতন গুহ্যবিষয় শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার জন্য আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত রসবিদ্যাকে অনার্য্য দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতাজাত পাষাণবিদ্যা বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু উহা ঠিক নহে। রসবিদ্যা অন্যান্য আয়ুর্বিদ্যার ন্যায় ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট গ্রহণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ভারতে আয়ুর্বিদ্যার বহুল প্রচার ছিল। তাহার পর দ্বাপর যুগে বাগভট্ট, নকুল, সহদেব, ময়দানব, চন্দ্রসেন, প্রভৃতি রসবৈদ্যগণ রসশাস্ত্রকে উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর বৌদ্ধ যুগে সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে তাঁহার ৮৬ জন শিষ্য এবং প্রশিষ্যের সহায়তায় ভারতীয় রসবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়। এই উন্নতি এত অধিক ব্যাপক হইয়াছিল যে উদ্ভিজ্জ ঔষধ ও প্রাণীজ ঔষধ উপজীব্য চিকিৎসকগণ

তাহার ব্যাপকতা দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং শল্য তান্ত্রিক গণও বহুক্ষেত্রে রসবৈদ্যগণের সহায়তা লইয়া বহু ছেদ্য ও ভেদ্য ব্যধির উপসম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রসচিকিৎসার প্রচণ্ড প্রগতিই বৌদ্ধ যুগ হইতে শল্য চিকিৎসার ক্রমাবনতির একটি মুখ্য কারণ হইয়াছিল। পারদ, গন্ধক হরিতাল, দারমুজ, হিঙ্গুল, তাম্র, সীসক, প্রবাল, মুক্তা, অভ্র, বঙ্গ, দস্তা, প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে আভ্যন্তরিক, বিদ্রধি, বিস্ফোটক, ক্ষতব্রণাদি, ছেদনাদি বিনা রসবৈদ্যগণ আরোগ্য করিতে আরম্ভ করার ফলে শল্য চিকিৎসার ক্রম বর্দ্ধমান প্রয়োজনীয়তা ও গবেষণার কথা কায়চিকিৎসকগণ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ রসচিকিৎসাই সকল শ্রেণীর চিকিৎসক-গণের সকল রোগ চিকিৎসার প্রধান উপজীব্য রূপে পরিগণিত হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আত্রেয় পুনর্বসু সম্প্রদায় ভুক্ত কায়চিকিৎসকগণ ভিতরে ভিতরে রসচিকিৎসার প্রাধান্য ও অধিকতর উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করিয়াও বাহ্যতঃ উহাদের প্রয়োগ একাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। উদার হৃদয় গুণগ্রাহী চক্রপাণি স্বসংগ্রহে রসপর্পটিকা তাম্রযোগ প্রভৃতি রসৌষধি সন্নিবিষ্ট করিয়া রসাদি ব্যবহারে পরবর্ত্তী সংগ্রহকার-গণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। পাছে আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ্যগণ সহৃদয় চক্রপাণির এই উদার ব্যবহারকে দুষ্ট ব্যক্তির প্রক্ষিপ্ত প্রয়োগ বলিয়া উড়াইয়া দেবার চেষ্টা করেন, সেই ভয়ে চরকচতুরানন ও সুশ্রুত-সহস্রনয়ন চক্রপাণি লিখিয়াছেন, "রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা,"।

একাদশ শতকে চক্রপাণির এই বজ্র নির্ঘোষের ফলে রসচিকিৎসার অপ্রতিহত প্রভাব সর্বভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে বাহ্যতঃ উহার তাদৃশ প্রচার হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে সিদ্ধবৈদ্য শিরোমণি গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সর্বশ্রেণীর চিকিৎসকগণের সুখবোধের

নিমিত্ত "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" নামক রসচিকিৎসার অতি উপাদেয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরেও বাংলার আত্রেয় সম্প্রদায় ভুক্ত চিকিৎসকগণ রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত সিদ্ধবৈদ্যগণকে সিদ্ধসাধিতবৈদ্য, পাষাণবৈদ্য, বড়িয়াল,বড়ে কবিরাজ প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া অপাংক্তেয় অগ্রদানীরূপে জনসমাজে হীন প্রতিপন্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি উনবিংশতকের শেষ পর্য্যন্তও উক্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাব কবিরাজ গঙ্গাধর রায়ের মত আয়ুর্বেদ দিকপালও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় রসাচার্য্য কবিরাজ ভূদেব মুখোপাধ্যা.য়র যুগান্তকারী পুস্তক রস জলনিধির আবির্ভাবের পর এবং তাহার পর বঙ্গভাষায় আয়ুর্বেদ লেখক রত্ন, প্রভাকর কৃত "রসচিকিৎস' নামক মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্গদেশে রসচিকিৎসা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রসচিকিৎসার গৌরব এখন দেশব্যপ্ত। রসচিকিৎসা এখন গৃহে গৃহে আদৃত। বঙ্গদেশে এখন সকল শ্রেণীর বৈদ্যগণ অবাধে ও প্রকাশ্যে রসচিকিৎসা করিয়া থাকেন। এমন কি রসচিকিৎসা এক্ষণে তাঁহাদের প্রধান উপজীব্য।

রসবৈদ্যগণের বিরুদ্ধে চরকপন্থী কায়চিকিৎসকগণের অভিযোগ এই যে, -তাঁহারা সাংখ্যপাতঞ্জল ও ন্যায়বৈশেষিক সম্বলিত "পঞ্চমহাভূত-বিজ্ঞান" জানেন না "ত্রিদোষবিজ্ঞান" জানেন না, "শারীরবিজ্ঞান" জানেন না, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সম্বলিত "দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান মানেন না এবং কেবল দ্রব্যের বিশেষ প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঐ অভিযোগগুলি সত্য নহে। কারণ, মাধবাচার্য্য "সর্বদর্শন সংগ্রহ" নামক পুস্তকে "রসেশ্বর দর্শন" নামক একটি দর্শনকে স্বীকার করিয়া সিদ্ধ ব্রাহ্মণযোগিগণের দ্বারা প্রচারিত রসশাস্ত্রের প্রমাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য রসসিদ্ধগণ.ক দর্শনজ্ঞানবিরহিত বলা চলে না। দ্বিতীয় অভিযোগ শারীরজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতশিরোমণি গণনাথ সেন

মহোদয় তাঁহার "প্রত্যক্ষশারীরম্"এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে,—তান্ত্রিক সিদ্ধযোগিগণের বর্ণিত সহস্রার, কুলকুণ্ডলিনী, ষটচক্র, মূলাধার ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাদি নাড়ী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা ভিতরের খবর না রাখিয়া ঐগুলিকে কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সুতরাং বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধযোগিগণ শারীরবিদ্যায় অজ্ঞ ছিলেন না। ত্রিদোষ বিজ্ঞান বিষযে অনভিজ্ঞতারূপ তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, সিদ্ধবৈদ্যগণ বায়ু, পিত্ত, কফের প্রকৃতি ও বিকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা বাত, পিত্ত, কফ নাশক বিভিন্ন অনুপান যোগে মকরধ্বজ, স্বর্ণসিন্দুর, লক্ষ্মীবিলাস, চতুর্ম্মুখাদি বিবিধ রসৌষধির প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়া ত্রিদোষতত্ত্বাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদাণ করিয়াছেন। বিভিন্নপ্রকার রসোপরস, ধাতু উপধাতু, রত্নোপরত্নাদির জারন, মারণ, ভস্মীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের রস, চূর্ণ, ফাণ্ট, কষায়, ক্কাথ, শীতকষায় প্রয়োগ করিয়া রসসিদ্ধগণ গভীর দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানের পরিচয় দিয়া দ্রব্যগুণবিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতার অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে রসসিদ্ধ যোগিগণের প্রচারিত ঔষধগুলি গুণসংযোগ সত্ত্বেও চরক সুশ্রুতাদি পণ্ডিতগণের অনুমোদন অতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লাভ করিতে পারে নাই। উপনিষদের যুগ হইতে রসবিদ্যা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া থাকিলেও কায়চিকিৎসকগণের প্রধান উপজীব্য চরক, সুশ্রুত, বাগভট নামক গ্রন্থত্রয়ে রসৌষধির প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু কালপ্রভাবে এই বজ্র আঁটুনীর গের ফস্কা হইয়াছে। "পাষাণবৈদ্য-গণের" রসচিকিৎসাই এক্ষণে সকলশ্রেণীর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিগত একাদশ শতকে বঙ্গ গৌরব মহা- মহোপাধ্যায় চক্রপাণি স্বসংগ্রহে "রসপর্পটিকা" ও তাম্রযোগাদি রস প্রয়োগ সন্নিবিষ্ট করিয়া রসচিকিৎসার যে প্রস্তরাকীর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিযাছেন, বর্ত্তমান যুগের সর্বশ্রেণীর বৈদ্যগণ তৎপ্রতিষ্ঠিত সেই সুদৃঢ় রাজপথে অকুতোভয়ে বিচরণ করিয়া অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত যশোদ্বারে উপস্থিত হইতেছেন।

ইত্যলং পল্লবিতেন।

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বচো ময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তুতৎ ॥"

ইতি

সদ্বৈদ্য ও পণ্ডিতগণের সেবক
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
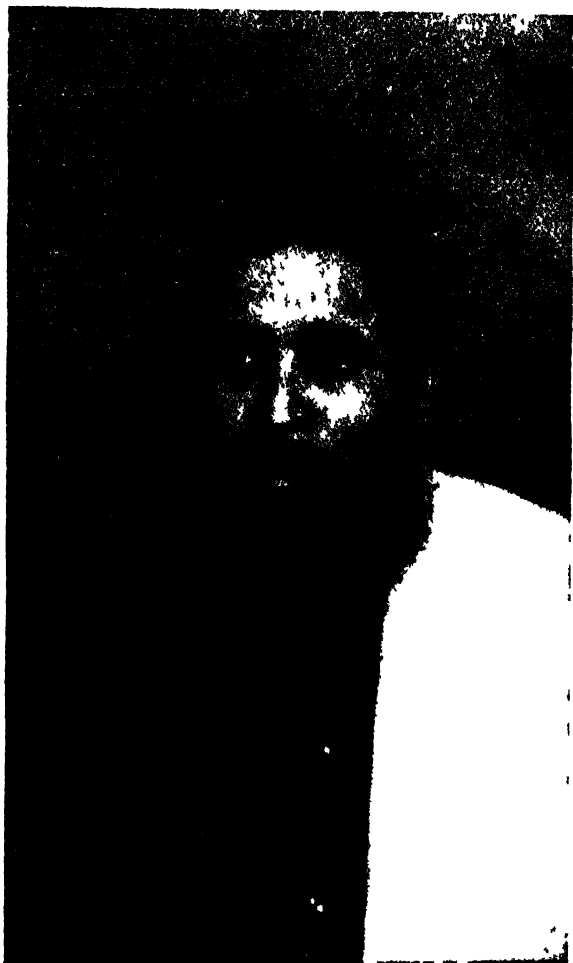
কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

রস-চিকিৎসা

—— ঃ*ঃ ——

জগদ্‌গুরু শ্রীহরির চরণে প্রণিপাত করিয়া চিকিৎসকগণের উপকারার্থে বিবিধ রসগ্রন্থ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র পরীক্ষিত, প্রত্যক্ষফলপ্রদ ও সহজসাধ্য ঔষধ ও প্রস্তুত প্রণালীগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে রস চিকিৎসার জ্ঞান লাভ হইবে।

পারদ

যে পারদের অন্তর্ভাগ উৎকৃষ্ট নীলবর্ণ এবং বহির্ভাগ মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, ঔষধকার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। আর যাহা ধূম্র, পাণ্ডুর বা বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট তাহা রসকার্য্যে অব্যবহার্য্য।

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি, ও অসহ্যাগ্নি—এই গুলি পারদের স্বাভাবিক দোষ। পারদ শোধন না করিয়া ব্যবহার করিলে নাগদোষ হইতে ব্রণ, বঙ্গদোষ হইতে কুষ্ঠ, মলদোষ ও গিরিদোষ হইতে জড়তা, বহ্নিদোষ হইতে দাহ, চাঞ্চল্যদোষ হইতে বীর্য্য নাশ, বিষদোষ হইতে মৃত্যু এবং অসহ্যাগ্নিদোষ হইতে স্ফোটরোগ জন্মে।

পর্প টী, পাটলী, ভেদী, দ্রাবী, মলকারী, অন্ধকারী ও ধ্বাংক্ষী—এই সাতটি পারদের কঞ্চুকদোষ, অশুদ্ধ পারদ ব্যবহারে পর্পটিদোষ হইতে চর্ম্মের কর্কশতা, পাটলীদোষ হইতে চর্ম্মবিদারণ (গা ফাটা), ভেদীদোষ হইতে নাড়ীব্রণ, দ্রাবীদোষ হইতে গলৎকুষ্ঠ, মলকারীদোষ হইতে ত্রিদোষবৃদ্ধি, অন্ধকারীদোষ হইতে চক্ষুহীনতা,

ধ্বাংক্ষীদোষ হইতে চর্ম্মের কৃষ্ণবর্ণতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং চিকিৎসক মাত্রেই পারদকে শোধন করিয়া ব্যবহার করিবেন।

দোষহীন, শুদ্ধ পারদ মৃত্যু ও জরানাশক এবং সাক্ষাৎ অমৃততুল্য। অল্পমাত্র প্রয়োগেই অধিক ফল পাওয়া যায়, সেবনে অরুচির সম্ভাবনা নাই এবং শীঘ্র আরোগ্যদান করে বলিয়া পারদ অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ সাধ্যরোগেই ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পারদ সাধ্য অসাধ্য সকল রোগেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মৃত পারদ অকালবলীপলিতাদি নাশক, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধিনাশক; যথারীতি বদ্ধ পারদে খেচরতা লাভ হয়। পারদ অপেক্ষা হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

ক্ষেত্রভেদে পারদ চারিপ্রকারঃ—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ রোগনাশক, রক্তবর্ণ পারদ রসায়নে, পীতবর্ণ পারদ ধাতু ভস্মী করণে, কৃষ্ণবর্ণ পারদ খেচরত্ব-দানে প্রশস্ত। ইহা ছাড়া হিঙ্গুল উর্দ্ধপাতন যন্ত্রের সাহায্যে যে পারদ পাওয়া যায় তাহা অতি বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

পারদের অষ্টাদশ সংস্কার

(১) শোধন, (২) স্বেদন, (৩) মর্দ্দন, (৪) উদ্ধৃতি, (৫) পাতন, (৬) রোধন, (৭) নিয়ামন, (৮) দীপন, (৯) অনুবাসন, (১০) গ্রাসন, (১১) মূর্চ্ছন, (১২) সঙ্কারণ, (১৩) গর্ভদ্রুতি, (১৪) জারণ, (১৫) মারণ, (১৬) ভস্মীকরণ, (১৭) রঞ্জন ও (১৮) বেধন, এইগুলি পারদের সংস্কার। প্রথম হইতে অষ্টম পর্যন্ত সংস্কার দ্বারা শোধিত পারদ ঔষধে ব্যবহার করিলে প্রকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কিন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধ পারদই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা করা উচিত নহে। কারণ, কেবল শোধনের

দ্বারা পারদের নাগবঙ্গাদি দোষ ও কঞ্চুকদোষ নিবারিত হয় না। কিন্তু হিঙ্গুলোত্থ পারদ শোধনাদি অষ্টকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়ায় সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার্য্য।

শুভ নক্ষত্রে, সুমুহূর্ত্তে একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ, পাঁচ অথবা এক পল পারদ শোধনার্থ গ্রহণ করিবে। উত্তম সংস্কারার্থ একপলের ন্যূন পারদ যেন গ্রহণ না করা হয়।

১। পারদ শোধন বিধি। (১ম সংস্কার) রস মারক দ্রব্যের ষোড়শাংশ (পারদের ষোড়শাংশ) চূর্ণ দ্বারা পারদ মর্দ্দন করিবে। প্রত্যহ প্রত্যেক বস্তু দ্বারা সাতবার মর্দ্দন করিবে।

১। ঘৃতকুমারীর রস, চিতার ক্বাথ ও কাকমাছির রস, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিলে পারদ দোষরহিত হয়।

২। রসোনের রস. পানের রস এবং ত্রিফলার ক্বাথে পারদ মর্দ্দন করিবে। প্রত্যেক রসে মর্দ্দন করিবার পর প্রত্যেকবার উহা ধুইয়া লইবে। ইহাতে পারদের সকল প্রকার দোষ নষ্ট হয়।

৩। ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথে পারদ তিনদিন মর্দ্দিত হইলে সর্ব্বদোষবিমুক্ত হয়।

হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ বিধি।—গোঁড়া লেবু অথবা লেবুর রসে হিঙ্গুল একদিন মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে কবিরাজগণ যে প্রচলিত প্রণালীতে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা পারদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা অতি কৃচ্ছ্র সাধ্য। আমরা বহু গবেষণা করিয়া নির্দ্দোষভাবে হিঙ্গুল হইতে পারদ প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বাহির করিয়াছি, তাহা অতি সহজ সাধ্য এবং অল্পকাল সাপেক্ষ। হিঙ্গুলকে বারোঘণ্টা লেবুর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণীকৃত হিঙ্গুলের সহিত সমপরিমাণ পাথরের

চূর্ণ চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। তৎপরে মিশ্রিত চূর্ণদ্বয়কে একটি মালসায় রাখিয়া তাহার উপর একটি বড় হাঁড়ি স্থাপন করিবে। হাঁড়িটির পশ্চাদ্‌ভাগে একটি বৃহৎ ছিদ্র থাকিবে, ঐ ছিদ্র মালসার মুখে বসিবে। হাঁড়ির উপর আর একটি হাঁড়ি উপুড় করিয়া বসাইতে হইবে। উক্ত তিনটি পাত্রের সংযোগস্থলগুলি মৃত্তিকা ও গোময়ের লেপ দিয়া উত্তমরূপে সংরুদ্ধ করিবে। তারপর উক্ত যন্ত্রটিকে প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট পাথুরিয়া কয়লার চুল্লীর উপর বসাইয়া দিবে। প্রবল অগ্নির উত্তাপে হিঙ্গুল মালসা হইতে উত্থিত হইয়া ভস্মাকারে উপরিস্থ হাঁড়ির গায়ে লাগিয়া যাইবে। অগ্নির উত্তাপ কমিবার পর যন্ত্র শীতল হইলে পাত্র তিনটিকে খুলিয়া হাঁড়ির গাত্রসংলগ্ন ভস্ম সংগ্রহ করিয়া পরিস্কৃত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা ছাকিয়া লইলে সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত মধ্যাহ্ন সূর্য্যতুল্য পারদ পাওয়া যায়।

পারদের স্বেদন বিধি।—(২য় সংস্কার) ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, চিতার কল্ক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে পারদের স্বেদন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। **পারদের মর্দ্দন বিধি (তৃতীয় সংস্কার)।**—ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষলোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজি—এই সকল দ্রব্য মিলাইয়া পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণ লইয়া তদ্দ্বারা উক্ত পারদ তিন দিন মর্দ্দন করিলে পারদের মর্দ্দন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪। **পারদের উদ্ধৃতি (৪র্থ সংস্কার)।**—পারদের এক চতুর্থাংশ হরিদ্রা চূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রসে পারদকে মর্দ্দন করিয়া পাতন যন্ত্রে উর্দ্ধপাতন করিলে উদ্ধৃতি ক্রিয়া নামক পারদের চতুর্থ সংস্কার সম্পন্ন হয়।

৫। **পারদের পাতন (৫ম সংস্কার)।**—এই পাতন তিন প্রকার, উর্দ্ধ পাতন, অধঃপাতন ও তির্য্যক্‌পাতন। - ত্রিকটু

ভাবে পাতনক্রিয়া করিতে হইলে এই তিন প্রকার ক্রিয়াই করা কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধ্বপাতন।—পারদকে শোধিত তাম্রের সহিত মারিয়া তিন বার ঊর্দ্ধপাতন করিলে পারদের ঊর্দ্ধপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

অধঃপাতন।—পারদকে ত্রিফলা, সৈন্ধব, চিতা ও ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে অধঃপাতিত করিলে পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

তির্য্যক্‌পাতন।—কাঁজির সহিত শোধিত অভ্র এবং পারদ একত্র মাড়িয়া একটি তাল পাকাইয়া তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্রে পতিত করিলে পারদের তির্য্যক্‌পাতন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৬। **পারদের রোধন (নিরোধ) (৬ষ্ঠ সংস্কার)**।—বিকশিত পদ্ম মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে পারদের নিরোধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। স্বেদনাদি হেতু হীনশক্তি পারদ নিরোধ ক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। **পারদের নিয়ামন (৭ম সংস্কার)**।—নিরোধ ক্রিয়ার পর পারদের চপলতা নিবৃত্তির জন্য নিয়ামন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কুঁকরোল সর্পাক্ষী পদ্ম ও ভৃঙ্গরাজ দ্বারা কাঁজির সহিত তিন দিন স্বিন্ন করিলে পারদের নিয়ামন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা পারদ গ্রাসার্থী হইয়া থাকে।

৮। **পারদের দীপন (৮ম সংস্কার)**।—যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, ভূনাগ, সজিনা, রাই সর্ষপ, অম্লবেতস, মরিচ ও কাঁজি—এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া নেপাল দেশীয় তাম্রপাত্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে পুনরায় কাঁজি দ্বারা দোল যন্ত্রে স্বিন্ন করিলে পারদের দীপন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৯। **পারদের অনুবাসন (৯ম সংস্কার)**।—প্রস্তর পাত্রে লেবুর রস রাখিয়া তন্মধ্যে পারদ নিক্ষেপ করিয়া একদিন রৌদ্রে উত্তপ্ত করিলে পারদের অনুবাসন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১০। **পারদের গ্রাসন (ধাতু ভোজন) (১০ম সংস্কার)**।—একটি বাজ (সিজ) বৃক্ষের শাখায় অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পারদ পূরিয়া মৃত্তিকা লেপ দিয়া তিনদিন ঘুটের আগুনে পাক করিলে পারদের গন্ধক, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

১১। **পারদের মূর্চ্ছন** (১১শ সংস্কার)।

(ক) এক ভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিলে পারদের মূর্চ্ছনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপে মূর্চ্ছিত পারদ দ্বারা অনুপানভেদে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিরাকৃত হয়।

(খ) **রসসিন্দুর**।—একভাগ পারদ, তিনভাগ গন্ধক এবং পারদের অষ্টমাংশ সীসক ভস্ম একত্র কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়, তাহা অনুপানভেদে সর্ব্বরোগ নাশক এবং জরা মৃত্যু নাশক।

(গ) **শ্বেতরস অথবা কর্পূর রস**।—একভাগ পারদ একভাগ সোহাগা, একভাগ মধু একভাগ লাক্ষা একভাগ গুঞ্জা ভৃঙ্গরাজ-রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে কর্পূর সদৃশ যে রস পাওয়া যায় তাহার নাম কর্পূররস। ইহাও অনুপান ভেদে সর্ব্ব-রোগ নাশক।

(ঘ) **সিন্দুররস**।—পারদ একভাগ, গন্ধক অর্দ্ধেক ভাগ বালুকা-যন্ত্রে পাক করিলে বোতলের গলদেশে যে সিন্দুর সদৃশ রস পাওয়া যায় তাহার নাম সিন্দুররস। ইহা অনুপানভেদে সর্ব্ব-রোগনাশক।

(ঙ) **পীতরস**।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া হাতীশুঁড়ার বা ভুঁইআমলার রসে সাতদিন মর্দ্দন করিয়া মুষাবদ্ধ করিয়া একদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে পীতবর্ণ যে রস পাওয়া যায় তাহাকে পীতরস বলে। পীতরস পানের রসের সহিত একরতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

(চ) **কৃষ্ণরস**।—লৌহ অথবা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে এক পল শুদ্ধ গন্ধক রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে তাহাতে তিনপল পারদ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতার দ্বারা পুনঃ পুনঃ নাড়িবে। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোময়ের উপর স্থাপিত একখানি কদলী-পত্রে উহা ঢালিয়া অপর একটি কদলীপত্র বেষ্টিত গোময়পোটুলীদ্বারা চলিয়া ধরিবে। এইরূপে কৃষ্ণরস প্রস্তুত হইবে। ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

শ্বেতরস, পীতরস, সিন্দুররস বা রসসিন্দুর ও কৃষ্ণরস, এই চতুর্বিধ রস যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

(ছ) **রসতাল**।—শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লাল দারমুজ, এই চারিদ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া একত্রে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে চারিপ্রহর পাক করিলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহার নাম রসতাল। ইহা জ্বরঘ্ন, অগ্নিদীপক, বীর্য্যস্তম্ভক, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক, বলকারক, মেধাজনক ও রসায়ন। ইহা এক যব মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

(জ) **স্বর্ণ সিন্দুর**।—স্বর্ণভস্ম এক পল, পারদ আট পল, গন্ধক ষোল পল একত্র ঘৃতকুমারী রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে ঐ শুষ্কচূর্ণ বোতলে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিবে। বোতল শীতল হইলে রক্তবর্ণ রস সংগ্রহ করিয়া লইবে। ইহা এক যব মাত্রায় পানের রসের সহিত প্রযোজ্য। অনুপানভেদে ইহা সর্ব্বরোগ

নাশকও বটে। বিশেষতঃ ইহা জ্বর, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে।

১২। **পারদের সঙ্কায়ণ (১২শ সংস্কার)**।—পারদ, স্বর্ণভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেক সমভাবে পুরাতন পুরাতন কাঁজি দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের সঙ্কারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৩। **পারদের গর্ভদ্রুতি (১৩শ সংস্কার)**—সমভাগ অভ্রসত্ব মাক্ষিকসত্ব একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুইভাগ পারদের উপর নিক্ষিপ্ত করিলে পারদের গর্ভদ্রুতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৪। **পারদের জারণ (১৪শ সংস্কার)**।—এক চতুর্থাংশ তাম্র ভস্মের দ্বারা একভাগ পারদ মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরেডমরু যন্ত্রে লেবুর রস পূর্ণ করিয়া উর্দ্ধপাতন করিবে। তাহার পর রক্তগণের দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের জারন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৫। **পারদের মারণ (১৫শ সংস্কার)**।—পলাশ বীজ, চন্দন ও লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে অথবা বালুকাযন্ত্রে পারদকে পাক করিলে উহার মারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মৃত পারদের লক্ষণ।—মৃত পারদ শুভ্র লঘু, স্থির, চাকচিক্যহীন এবং অন্য ধাতু মারণে সমর্থ।

১৬। **পারদের ভস্মীকরণ**।—(ক) অপামার্গ তৈলের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে পারদ ভস্মীভূত হয়।

(খ) অথবা পুষ্করমূল ও কাঁটানটের মূল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলেও পারদ ভস্মীভূত হয়।

মারণ ব্যতিরেকে ভস্মীকরণ বিধি।—(ক) অপামার্গবীজ ও পদ্মের কন্দের সহিত পারদকে মুষাবদ্ধ করিয়া পুটপাক করিলে মারণ ব্যতিরেকেও পারদ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

(খ) অথবা পারদ ও অভ্র সমভাগে বটের আঠায় তিনপ্রহর মর্দ্দন করিয়া কোষ্ঠিকাযন্ত্রে পুটপাক করিলে পারদ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ভস্মীভূত পারদের লক্ষণ।—ভস্মীভূত পারদ চাক্‌চিক্যহীন স্থির, লঘু, শ্বেতবর্ণ, অন্য ধাতু মারণে সমর্থ এবং ঊর্দ্ধ পাতনের অযোগ্য।

১৭। **পারদের রঞ্জন (১৭শ সংস্কার)**।—গন্ধক সংযোগে জারিত সীসককে পুনরায় তাম্রের দ্বারা জারণ করিতে হইবে। এইরূপে জারিত তিনভাগ তাম্রের দ্বারা মারিত হইলে পারদ লাক্ষা সদৃশ বর্ণ ধারণ করে।

১৮। **পারদের বেধন (১৮শ সংস্কার)**।—পারদের বেধনকার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে পারদের রঞ্জন, পরে জারণ, এবং তৎপরে পুনরায় রঞ্জন ও জারণ করিতে হইবে। এইরূপে রঞ্জন ও জারণ ক্রিয়া সাতবার করা হইলে পারদের বেধন সমাপ্ত হইবে।

এবংবিধ পারদ অন্য সকল ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। চিকিৎসাক্ষেত্রে কিন্তু পারদের রঞ্জন ও বেধনক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ভস্মীভূত পারদই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে!

পারদভস্মের অনুপান

শ্বাস, কাস ও শূলে—পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, ভার্গী এবং মধু।

রক্তদুষ্টিতে—হলুদ ও চিনি কিংবা মধু।

পাণ্ডু ও কামলায়—ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বাসকের কাথ কিম্বা যষ্টিমধু।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—শিলাজতু, এলাইচ ও মিশ্রী অথবা গোক্ষুররস ও দুগ্ধ।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—লবঙ্গ এবং পানের রস।

জ্বরে (যে কোন প্রকার)—সৌবর্চ্চল লবণ, লবঙ্গ, ভূনিম্ব এবং হরীতকী। কিম্বা লেবুর রস।

কোষ্ঠবদ্ধতায়—সৌবর্চ্চল লবণ এবং ত্রিফলা।

বমিতে—সিদ্ধি ও যমানী কিম্বা মধু, খই, চিনি ও মুদ্গযূষ।

সর্ব্বপ্রকার উদর রোগে—সৌবর্চ্চল লবণ, হলুদ, সিদ্ধি ও যমানী।

ক্রিমি রোগে—হলুদ বা আনারসের পাতার রস।

অতীসারে—অহিফেন, লবঙ্গ, হিঙ্গুল এবং সিদ্ধি।

অগ্নিমান্দ্যে—সৌবর্চ্চল লবণ ও যমানী।

সর্ব্বপ্রকার পিত্তবিকারে—আমলকী ও চিনি।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকারে—পিপুল।

সর্ব্বপ্রকার কফবিকারে—আদার রস।

ত্রিদোষজ জ্বরে—দশমূল পাচন ও পিপুলচূর্ণ।

রক্তপিত্তে—হরীতকীচূর্ণ ও মধু কিংবা পিলুলচূর্ণ ও বাসকের কাথ।

ক্ষয়কাসে—ঘৃত ও ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ পিপুলচুর্ণ অথবা ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু ও পুরাতন গুড়।

হিক্কায়—সৌবর্চ্চল লবণ, বীজপুরের রস ও মধু।

অর্শে—পুটপক্ক শূরণ, তৈল ও সৈন্ধব লবণ।

বিসূচিকায়—পিপুল ও হিঙ্গু।

প্রমেহ ও শুক্রতারল্যে—শতমুলী রস বা শিমূলমূল চূর্ণ।

প্লীহা ও গুল্মে—ন্যগ্রোধাদি বা অসনাদির কাথে মিশ্রিত হরীতকী, রসোন ও গোমূত্র।

পিত্তশূলে—কলায়যূষ ও শম্বুক ভস্ম।

আমশূলে—তিলকাথ ও ত্রিকটু।

শোথ ও পাণ্ডুরোগে—ত্রিফলার কাথ।

কুষ্ঠে—পঞ্চনিম্বের কাথ।

শ্বেতকুষ্ঠে—জারিত অভ্র ও ত্রিফলা।

বাতরক্তে—গুলঞ্চ, হরিতকী ও গুড়।

গৃধ্রসী—শুঁঠচূর্ণ ও এরণ্ডমূলসহ সিদ্ধ দুগ্ধ।

মেদরোগে—মধু ও জল।

কার্শ্যরোগে—চিনি।

উন্মাদ—ও অপস্মারে—ঘৃত, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, ত্রিকুটু ও গোমূত্র।

দুষ্টব্রণে—ত্রিফলা, পটোলমুল, ত্রিকুটু, গুগ্‌গুলু, গুলঞ্চ ও বিড়ঙ্গ।

গলগণ্ডে—মূলার রস, ত্রিফলা, পটোলমুল, ত্রিকুটু, গুগ্‌গুলু, গুলঞ্চ ও বিড়ঙ্গের লেপ।

মসূরিকা—নারিকেল জল।

বিষদোষে—তৈল, কার্পাসপত্র ও অনন্তমূলের ক্বাথ। অথবা চাউল-ধোয়া জল ও কাঁটানটের রস অথবা কর্পূর, দধি ও গোময়রস।

রসায়নে—ত্রিফলা চূর্ণ, স্বর্ণভস্ম।

বাজীকরণে—ত্রিফলা চূর্ণ, স্বর্ণভস্ম লৌহভস্ম কিংবা ঘৃত, মধু, শতমূলী রস ও দুগ্ধ কিংবা জারিত স্বর্ণমাক্ষিক ও মধু কিংবা অভ্রভস্ম,ও বকফুলের রস ও কাঁচকলার রস।

রস-সেবনবিধি

পারদ ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে একদিন প্রাতে বিরেচন গ্রহণ করিবে এবং সেই দিবস উপবাস করিয়া থাকিবে। রাত্রিতে অল্প কিছু আহার করিতে পারা যায়। বিরেচন-জনিত দুর্বলতা অপগত হইলে পারদ সেবন আরম্ভ করিবে। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক রতি।

পারদ সেবনকালে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে শয়নের পূর্ব্বে পিপুল ও গুলঞ্চের ক্বাথ সেবন করা কর্ত্তব্য। পারদভস্ম পানের রসের সহিত সেবিত হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা নাশ করে।

রস-সেবনে পথ্যাপথ্য

মুদ্গযূষ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল, মুথা, পদ্মমূল, গোধূম, শালিধান্য, গোদুগ্ধ, স্নান, মনোরমা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ, ঘৃত, যব, আদা, জীরা ইত্যাদি পারদসেবীর পথ্য।

কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, তরমুজ, করলা, কুসুমশাক, কাঁকরোল, কলমী, কাকমাছি—এই আটটি পারদসেবীর অপথ্য। তৈল মর্দ্দন, কাঁজি ভক্ষণ, মদ্য, দধি, অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, রসোন, পলাণ্ডু, মূলা কলায়, বার্ত্তাকু, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, কটু, তিক্ত, লবণাক্ত, অধিক মিষ্ট, অধিক বায়ু সেবন, শৈত্যক্রিয়া, রৌদ্রসেবা, শোক তাপ চিন্তা, সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন এবং যে সমস্ত দ্রব্য পারদ ও ধাতুসকলের মারণে সহায়তা করে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কর্পূর, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, ত্রিকুটু এবং জায়ফলও অপথ্য। অজীর্ণে ভোজন এবং ক্ষুধার বেগ ধারণ অকর্ত্তব্য।

অশোধিত পারদ সেবন জনিত বিকার নিবারণের উপায়

অশুদ্ধ পারদ সেবনে হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইলে জীরাবাটা সহ শিঙ্গি, কই, জিয়ল মাছের ঝোল, শালিধান্য এবং দুগ্ধ সেবন করিবে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে নারায়ণ তৈল ব্যবহার্য্য। মনের চঞ্চলতায় মস্তকে শীতল জল দিবে। অত্যধিক তৃষ্ণায় ডাবের জল, মুদ্গযূষ ও চিনির সরবৎ সেবা।

সীসক বঙ্গ মিশ্রিত পারদ ভক্ষণ করিয়া অসুস্থতা হইলে গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণ সেবন করা উচিত।

অশুদ্ধ পারদ সেবনে শূল, নাভিশূল, তন্দ্রা, জ্বর, অরুচি, আলস্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, শোথ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। উক্ত রোগ সকল দ্বারা আক্রান্ত হইলে সৌবর্চ্চল লবণ ও গোমূত্র তিনদিন ভক্ষণ করিবে।

অধিক অম্ল, তিক্ত কটু দ্রব্য সেবনে পারদের ক্রিয়া নষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেক কবিরাজ মকরধ্বজ বা রসসিন্দুরের সহিত কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করেন। ইহা অতিশয় গর্হিত ব্যাপার। কারণ, কুইনাইন অতিশয় তিক্ত দ্রব্য; ইহার সহিত পারদ সেবন করিলে পারদের গুণ নষ্ট হয় এবং শরীরে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

পারদসেবীর কখনও ক্ষুধা সহ্য করা বা উপবাস করা উচিত নয়।

অশোধিত পারদ সেবন জনিত সর্বপ্রকার ব্যাধি শোধিত গন্ধক সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

অশোধিত রসকর্পূর সেবন জনিত অসুস্থতায় মিছরী সহিত ধনে-ভিজান জল সেবন করিবে।

অশোধিত পারদে প্রস্তুত রসসিন্দুর সেবনেও অশোধিত পারদ সেবনের মত বিষক্রিয়া হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সাতদিন ধরিয়া গোলমরিচ সহ গব্যঘৃত পান করিবে।

পারদের গুণ

শোধিত এবং ভস্মীকৃত পারদ জরা মৃত্যু নাশক। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন, বল, বুদ্ধি, কান্তি ও মেধাবর্দ্ধক। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গন্ধক

গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। স্বর্ণ-সংস্কার বিষয়ে লোহিত বর্ণ, রসায়ন কার্য্যে পীতবর্ণ এবং ব্রণ বিলেপন কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণ সংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পীতবর্ণ গন্ধক আমলাসার গন্ধক বলিয়া পরিচিত। ইহার অপর নাম শুকপিচ্ছ। রসক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে এই গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। রক্তবর্ণ গন্ধক লৌহ মারণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। উহার অপর নাম শুক-চঞ্চু।

গন্ধক অতিশয় রসায়ন, মধুর রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য কণ্ডু কুষ্ঠবিসর্প ও দদ্রুনাশক, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক, আমদোষনাশক, শোষণ, বিষনাশক, পারদের বীর্য্যবর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক এবং স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিক গুণবিশিষ্ট।

গন্ধকের শোধনবিধি

গন্ধকে শিলাচূর্ণ এবং বিষ, এই দুই দোষ বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য ঔষধার্থে উহাকে উত্তমরূপে শোধিত করা উচিত।

১। চূর্ণ গন্ধক গব্য ঘৃতের সহিত অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া ঘৃতাক্ত বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং এক দণ্ডকাল গোদুগ্ধে ভিজাইয়া পরে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত গন্ধকের পাষাণ খণ্ড সকল বস্ত্র দ্বারা দূরীভূত হয়, বিষভাগ তুষারাকারে ঘৃতের সহিত পতিত থাকে এবং বিশুদ্ধ গন্ধকভাগ পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। শোধিত গন্ধক সেবিত হইলে অপথ্য সেবনেও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। কিন্তু অশোধিত গন্ধক সেবন করিলে অপথ্য সেবন দ্বারা তাহা পীত হলাহলের ন্যায় প্রাণনাশ করে।

২। গন্ধককে চূর্ণ করিয়া তিনদিন ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিবে। তাহার পর চুউহাকে শুষ্ক করিয়া র্ণ করিবে। পরে একখানি হাতায়

কিঞ্চিৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতাপে ধরিবে—অগ্নিতপ্ত ঐ হাতায় গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে একখানি ঘৃতাক্ত বস্ত্র দ্বারা একটি ভৃঙ্গরাজরসপূর্ণ ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ঐ দ্রবীভূত গন্ধক নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে গন্ধক ভাণ্ডমধ্যে জমিয়া যাইলে উহাকে একদণ্ডকাল উক্ত রসের সহিত অগ্নিতাপে স্বিন্ন করিবে। এইরূপে শোধিত গন্ধক অতিশয় শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার পর্পটি প্রস্তুকালে এই প্রকারে শোধিত গন্ধক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

গন্ধক সেবনবিধি

শোধিত গন্ধক ত্রিফলা চূর্ণ, ঘৃত, ভৃঙ্গরাজরস ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সিকি তোলা মাত্রায় সেবন করিলে গৃধ্রের ন্যায় দৃঢ়শক্তি হয় এবং রোগহীন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়।

ত্বগ্‌দোষে—গন্ধক সিকি তোলা ও পাকা কলা।

বলক্ষয়ে—চিতামূলচূর্ণ ও মধু সহ।

অগ্নিমান্দ্যে—ত্রিফলার কাথ সহ।

ক্ষয়কাশে—বাসকের কাথ সহ।

উর্দ্ধদেহগত সর্ব্বরোগে—ঘৃত ও মধু সহ।

গন্ধক ১, মরিচ ১, ত্রিফলা ৬—একত্র করিয়া সোঁদাল মূলের রসে মাড়িয়া সেবন করিলে এবং সোঁদাল-মূলের রসে গন্ধক পেষণ করিয়া প্রত্যহ শরীরে লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

বলবৃদ্ধির জন্য—দুগ্ধ সহ গন্ধক ।০ তোলা মাত্রায়

দুষ্টব্রণে—তিল তৈল সহ।

সর্ব্বরোগে—গব্যঘৃতসহ।

চক্ষুর্দোষে—সমপরিমাণ পিপ্পলী ও হরীতকীচূর্ণ সহ।

দুর্জ্জয় কণ্ডু ও পামা রোগে—১ তোলা গন্ধকচুর্ণ, তৈল; অপা-মার্গ রস ও মরিচের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্বাঙ্গে প্রলেপ।

শুক্রতারল্যে—গোদুগ্ধ, চর্জাত (দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর)।

গণোরিয়ায়—গুরুচী, হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, ত্রিকুটু।

অক্ষুধায়
উদরাময়ে
কুষ্ঠে
শূলে
} —ভৃঙ্গরাজ এবং আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা ক্বাথে পৃথকভাবে বিভাবিত গন্ধক ১ তোলা মাত্রায়।

গলৎ কুষ্ঠে—গন্ধক তৈল সেবনে।

গন্ধক তৈল প্রস্তত বিধি

গন্ধকচুর্ণ দুগ্ধের মধ্যে ফেলিয়া কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর সেই দধি হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম গন্ধক তৈল। এই গন্ধক তৈল গাত্রে লেপন করিলে বা সেবন করিলে গলৎকুষ্ঠ নিবারিত হয়।

গন্ধক সেবীর পথ্যাপথ্য

গন্ধক সেবী, ক্ষার দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, অধিক লবণাক্ত দ্রব্য, স্ত্রীসঙ্গ অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ, মদ্যপান, শাক ও দ্রুতযানে ভ্রমণ, দাল্ ভক্ষণ কটুদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

গন্ধকের গন্ধ দূরীকরণ

গন্ধকচুর্ণ দুগ্ধের সহিত জ্বাল দিতে দিতে যখন উহা জমিয়া যাইবে তখন উহাকে আবার সূর্য্যাবর্ত্ত-রসে ও পরে ত্রিফলার কাথে জ্বাল দিবে। এইভাবে শোধিত গন্ধকের গন্ধ নাশ হইবে।

রস-চিকিৎসা

১। **পারদের ধাতু গ্রাসনের সহজ প্রক্রিয়াঃ** নয় প্রকার বিষ ও সাত প্রকার উপবিষ দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

২। **ত্রিকটু** ক্ষার দ্বয় রাইসর্ষপ, পঞ্চলবণ, রসুন, নিশাদল, শজিনা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমপরিমাণে লইয়া তৎ সমুদায় একত্র তপ্তখলে ফেলিয়া জামীর লেবুর রসে বা কাগজী লেবুর রসে—তিনদিন মর্দ্দন করিলে পারদের ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

৩। **বিন্দুলী কীট**—(লালবর্ণের ছোট পোকা) লবণ ও লেবুর রসের সহিত তিনদিন পারদ মর্দ্দন করিলে তাহার গ্রাসন শক্তি জন্মে।

৪। পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়ামতে হিঙ্গুলোত্থ পারদের অনুবাসন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, উহাকে একটি সীজের দৃঢ় শাখাতে অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ গর্ত্তে সমপরিমিত গন্ধকসহ পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ প্রদান করিবে। পরে গুলঞ্চ ও শ্যামলতার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তিন দিবস জ্বাল দিবে। এই প্রকারে পারদের স্বর্ণাদি যাবতীয় ধাতু সকলকে গ্রাস করিবার শক্তি জন্মে। এই গ্রাসন শক্তি বিশিষ্ট পারদ মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে প্রয়োজনীয়।

পারদ শোধন ও প্রয়োগের বিশেষ-বিধি

ব্যবসায়িগণ বিক্রয়ের জন্য পারদের সহিত সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া থাকেন। এই হেতু পারদে যে কৃত্রিম দোষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম যওব দোষ। পাতনত্রয় (অর্থাৎ উর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন

ও তির্য্যক্‌পাতন) দ্বারা, এই ষণ্ডুত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। বিষ, বহ্নি ও মল এই তিনটী পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই দোষত্রয় যথাক্রমে মরণ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছার কারণ; অর্থাৎ পারদের বিষদোষ দ্বারা মানবের মৃত্যু ঘটে, বহ্নিদোষ দ্বারা সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং মলদোষ দ্বারা মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। নাগদোষ ও বঙ্গদোষ; পারদের এই দুইটি দোষকে যৌগিক দোষ বলা যায়। এই দুইটি দোষ দ্বারা মনুষ্যগণের জড়তা, আধ্মান ও কুষ্ঠরোগ জন্মে। ইহা ভিন্ন আর সাতটি পারদের উপাধিক দোষ আছে, এই সাতটি দোষ সপ্তকঞ্চুক নামে অভিহিত হয়। এই সপ্তকঞ্চুক ভূমিজ, গিরিজ ও বারিজ, অর্থাৎ ভূমিতল, পর্ব্বত ও জলের সংস্রবে ঐ সাতটি দোষ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ পারদের দ্বাদশটি দোষ নির্দ্দেশ করেন।

মেষলোম, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ, ঝুল, গোঁড়া লেবুর রস দ্বারা মর্দ্দনে নাগদোষ; রাখাল শশা ও ধলা আঁকড়ার মূলের ছাল চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বঙ্গদোষ; সোঁদাল ফলের মজ্জাদ্বারা মর্দ্দনে মলদোষ, চিতা মূলের চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা মর্দ্দনে চাঞ্চল্য দোষ, ত্রিফলার কাথ দ্বারা মর্দ্দনে বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা মর্দ্দনে গিরিদোষ, ও ত্রিকণ্টক দ্বারা মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পারদের অষ্টদোষ ও সপ্ত কঞ্চুকদোষ দূরীকৃত হয়।

মর্ম্ম ছিন্ন হইলে এবং ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, সেই সকল স্থলে পারদ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে পারদ প্রযুক্ত হইলে আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোধিত পারদ মৃদু অগ্নিতাপ সহ্য করে, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধিনাশ করে, মারিত পারদ তীব্র অগ্নিতাপেও নিষ্কম্প ও বেগহীন অবস্থায় অবস্থিত থাকে, এবং তাহা মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও আরোগ্য প্রদান করে।

রসবন্ধ

বার্ত্তিককারগণ পারদের বন্ধনার্থ অর্থাৎ চাঞ্চল্য ও দুর্গ্রহত্ব নিবারণের জন্য পঞ্চবিংশতি প্রকার রস বন্ধের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যথা :—

হঠ্, আরোট, হঠাভাস ও আরোটাভাস, ক্রিয়াহীন, পিষ্টি, ক্ষার, খোট, পোট, কল্কবন্ধ, কজ্জলি, সজীব, নির্জীব, নির্ব্বীজ, সবীজ, শৃঙ্খলা দ্রুতি বন্ধ, বালক, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ মূর্ত্তিবন্ধ, জলবন্ধ, অগ্নিবন্ধ, সুসংস্কৃত ও মহাবন্ধ। এই পঞ্চ বিংশতি প্রকার বন্ধ, কেহ কেহ জালুকা বন্ধ নামক আর এক প্রকার বন্ধ ক্রিয়া স্বীকার করিয়া ষড় বিংশতি প্রকার বন্ধ বলিয়া থাকেন।

জালুকা বন্ধ দৈহিক ক্রিয়ার উপযোগী নহে। কামিনী দ্রাবন কার্য্যে ইহা অতি প্রশস্ত। পারদ সম্যক্ শোধিত না করিয়া যদি তাহার বন্ধ ক্রিয়া করা হয় তবে তাহাকে হঠ্বন্ধ কহে। এই বন্ধ পারদ সেবিত হইলে মৃত্যু বা উৎকট ব্যাধি উৎপাদন করে। সুশোধিত পারদের বন্ধ ক্রিয়া হইলে তাহা আরোট বন্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ ক্ষেত্র করণে শ্রেষ্ঠ এবং ধীরে ধীরে ব্যাধি নাশক। ধাতু ও মূলাদি পদার্থ দ্বারা ভাবিত করিয়া বন্ধক্রিয়া করিলেও যাহার গুণ বিকৃতি হয় অর্থাৎ যদি সেই পারদ পুটপাককালে স্বভাবানুসারে অন্য পদার্থের সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইয়া যায়, তবে তাহা হঠাভাস বা আরোটাভাস বন্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অশোধিত ধাত্বাদির সহিত যে পারদ সংস্কৃত হয় তাহাকে ক্রিয়াহীন বলা যায় এই পারদ সেবনের পর অপথ্য সেবন করিলে বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়।

দ্রব্য বিশেষের সহিত পারদ গাঢ়তর রূপে মর্দ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া, নবনীত তুল্য পিষ্টি প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পিষ্টিকা বন্ধ

বলা যায়। পিষ্টিকা বন্ধ পারদ অগ্নির উদ্দীপক ও অত্যন্ত পাচক। শঙ্খ, শুক্তি ও কড়ি প্রভৃতির ক্ষার পদার্থের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে তাহাকে ক্ষারবন্ধ কহে। ক্ষারবন্ধ পারদ অগ্নির অত্যন্ত উদ্দীপক, পুষ্টি জনক ও শূল নাশক।

যে বন্ধ পারদ খোটতা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ আধ্মাপিত করিলে ক্ষয় পাইয়া থাকে তাহাকে খোটবন্ধ বলা যায়। খোটবন্ধ পারদ শীঘ্র সর্ব্বরোগ নাশ করে।

কজ্জলি দ্রবীভূত করিয়া কদলী পত্রে ঢালিবে এবং কদলী পত্রাচ্ছাদিত পোট্টলীর চাপ দিয়া তাহা চ্যাপটা করিবে, ইহাকে পোটবন্ধ কহে।

দ্রব্য বিশেষের সহিত স্বেদাদি দ্বারা পারদকে পঙ্করূপে পরিণত করিলে তাহাকে কল্কবন্ধ কহে। কল্কবন্ধ পারদ কল্ক দ্রব্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে।

পারদ, গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া মসৃণ কজ্জলবৎ পদার্থ প্রস্তুত হইলে, তাহা কজ্জলীবন্ধ নামে অভিহিত হয়।

যে বন্ধপারদ ভস্ম করিতে হইতে, অগ্নি যোগে নির্গত হইয়া যায়, তাহা সজীববন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবিত হইলে পারদ ভস্মের ক্রিয়া অথবা আশু ব্যাধিবিনাশ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

অভ্র বা গন্ধকের সহিত জারিত হইয়া পারদ ভস্মীভূত হইলে তাহা সর্ব্বধাতুর শীর্ষস্থানীয় হয়। এইরূপ ভস্মীভূত পারদ অতি শীঘ্র সমুদায় রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

চতুর্থাংশ পরিমিত স্বর্ণ ও সম পরিমিত গন্ধকের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিষ্টিকৃত করিয়া তাহা পুটপাক দ্বারা জারিত করিলে নির্বীজ বন্ধ নামে কথিত হয়। ইহা সকল রোগ নাশক।

হীরকাদি সহযোগে জারিত পারদের সহিত অপর জারিত পারদ

সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলা যায়। এই পারদ দেহের দৃঢ়তা সাধক ইহা অতিশয় গুণ সম্পন্ন।

বাহ্যক্রুতি বিশিষ্ট পারদ বদ্ধ হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইলে তাহাকে ক্রুতিবদ্ধ পারদ বলা যায়। শ্বেত সর্ষপের চতুর্থাংশ পরিমিত ইহা সেবিত হইলে দুঃসাধ্য রোগ সমূহ বিনষ্ট করে।

সমপরিমিত অভ্রের সহিত পারদ জারিত হইলে তাহা বালবদ্ধ নামে অভিহিত হয় উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে, ইহা আশু রসায়ন কার্য্য সম্পাদন করে, রোগোৎপত্তির আশঙ্কা দূর করে—এবং উপদ্রব ও অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত পীড়া সমূহও বিনষ্ট করে। দ্বিগুণ অভ্রের সহিত যে পারদ জারিত হয়, তাহাকে কুমারবদ্ধ বলা যায়। এক তণ্ডুল মাত্রায় ইহা সেবনে তিন সপ্তাহ মধ্যে যাবতীয় পাপজব্যাধি (কুষ্ঠ প্রভৃতি) নিবারিত এবং রসায়ন হইয়া থাকে।

চতুর্গুণ অভ্রের সহিত জারিত পারদের নাম তরুণবদ্ধ। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। সপ্তাহকাল এই পারদ সেবনে সর্ব্বরোগ বিনাশ হয় এবং বীর্য্য ও বল উৎপন্ন হয়।

ছয়গুণ অভ্রের সহিত জীর্ণ হইয়া যে পারদ অগ্নিসহত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অগ্নিতাপে নির্গত হইয়া যায়, তাহাকে বৃদ্ধবদ্ধ বলা যায়। দেহহিতকর ঔষধ সমূহে এবং ধাতু সমূহের সংস্কার বিশেষে এই পারদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অভ্রজারণ না করিয়া কেবল দিব্য ঔষধির মূলাদির দ্বারা পারদ অতিশয় অগ্নিসহ হইলে, তাহা মূর্ত্তিবদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পারদ জারিত করিলে অগ্নিতাপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং সর্ব্বরোগে ইহা প্রযোজিত হইলে অনুপম উপকার পাওয়া যায়।

শিলাজল দ্বারা যে পারদ বদ্ধ হয়, তাহাকে জলবদ্ধ পারদ কহে। ইহা জরা, রোগ, ও মৃত্যু নাশক এবং কল্পনা অনুসারে তত্তদ্রব্যের ফলপ্রদ।

কেবল পারদ কিংবা ধাতু মিশ্রিত পারদ আধ্মাত হইয়া গুটিকাকৃতি হইলে, এবং এই গুটিকা অগ্নিতাপে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, তাহা অগ্নিবদ্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ খেচরত্ব জনক অর্থাৎ এই পারদ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে মনুষ্য আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত পারদ আধ্মাপিত করিলে, উভয় দ্রব্য একত্র মিলিত হইয়া অতি দীপ্ত উজ্জ্বল গুটিকারে পরিণত হয়। তৎ-কালে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত গুরু হইয়া থাকে। সেই গুটিকায় আঘাত করিলে লবণের ন্যায় চূর্ণীভূত হইয়া যায় ও ঘর্ষণ করিলে মলিন হয় না। ইহাই পারদের মহাবন্ধ। এই বন্ধ যথাযত সম্পন্ন না হইলে গুটীকা ক্ষণকালেই দ্রবীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত বন্ধ প্রক্রিয়া গুলিতে অষ্টম সংস্কারে সংস্কৃত পারদ ব্যবহার্য্য কিংবা হিঙ্গুলোত্থ পারদও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

পারদ ভস্মবিধি

১ম প্রণালী

পলাশবীজ, রক্তচন্দন ও জাম্বীরের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া সজীববদ্ধ করিবে। পরে তাহা যন্ত্রে পাতিত করিলে মারিত হয়। অপামার্গ বীজ ও পদ্মবীজের কল্কের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া দৃঢ়রূপে আধ্মাপিত করিলে পারদ ভস্মীভূত হয়।

২য় প্রণালী

কাকডুমুরের আঠা দ্বারা হিঙ্গু ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটদগ্ধ করিলে পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

৩য় প্রণালী

অপামার্গ বীজ ও এরণ্ডবীজ চূর্ণ করিয়া সেইচূর্ণ পারদের নীচে ও

উপরে দিয়া মুষা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে চারিবার পুটপাক করিলে পারদ ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪র্থ প্রণালী

পানের রসে পারদ মর্দ্দিত করিয়া কাঁকরোল মূলের গর্ত্তে স্থাপন পূর্ব্বক এক মৃণ্ময় মুষায় পুটপাক করিলেই পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

পারদ ভস্ম সেবনের সাধারণ নিয়ম

পারদ ভস্ম সেবনের পর অধিক উদ্গার উদ্গত হইলে দধিমিশ্রিত অম্ল, জীরাসহ কৃষ্ণ মৎস্য ভোজন করিবে। বায়ুর আধিক্য বোধ হইলে নারায়ণাদি তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। চিত্তের অস্থিরতা হইলে মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে। তৃষ্ণা অধিক হইলে ডাবের জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া মুদ্গযূপ পান করিবে। রসবীর্য বৃদ্ধির জন্য দ্রাক্ষা দাড়িম, খর্জ্জুর ও কদলীফল, এবং দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও শর্করা ভোজন কর্ত্তব্য। রসসেবন পরিত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত বৃহতীফল বিল্ব প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুতবিধি

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীনকালে বিবিধ কলাবিদ্যা উদ্ভাবিত হইলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল যে ভারতবর্ষেই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, অধুনা জগতের যাবতীয় সুধীবর্গ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন বেদ সংহিতাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি

সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে বিবিধ ধাতু উপধাতু রস, উপরস প্রভৃতি ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ত্রিদোষ বিজ্ঞান, বৈদিক ঔষধ পথ্যপ্রয়োগ জ্ঞান এবং চিকিৎসা প্রণালী ব্যতীত তান্ত্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে জগতের অদ্বিতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র রূপে পরিণত করিয়াছে। মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদীয় তন্ত্রোক্ত মহৌষধ। বহুকাল যাবৎ এই মহৌষধ নানাপ্রকার সাধ্য অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা, এবং গন্ধক ১২৮ তোলা, প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র ও পারদ একত্র মাড়িয়া পরে গন্ধক সহ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিতে হয়, অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী সমতল বোতলে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হয়। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমানে সকলেই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উক্ত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে স্বর্ণ বোতলের তলদেশে পড়িয়া থাকে, উহা পারদের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের গলদেশে পারদ ও গন্ধক একত্র অগ্নিতাপে উত্থিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে। সাধারণের নিকট ইহাই মকরধ্বজ। আবহমানকাল হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কঠিন কঠিন রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, সে প্রণালী তন্ত্রোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত প্রকৃত নিয়মানুসারে পারদ ও স্বর্ণের যথাবিধি সংস্কার করিয়া তদ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে স্বর্ণ নিঃশেষরূপে পারদের

সহিত মিশ্রিত হইবে এবং কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই স্বর্ণকে পারদ হইতে বিভিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই স্বর্ণ পারদের সহিত মিশ্রিত হইবে।

প্রথম বিধি ঃ—

স্বর্ণভস্ম—১ পল (৮ তোঃ)

মূর্চ্ছিত পারদ—৮ পল (৬৪ তোঃ)

গন্ধক—১৬ পল (১২৮ তোঃ)

একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিনদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় তাহাতে স্বর্ণ পৃথক রূপে অবস্থান করে না।

দ্বিতীয় বিধি ঃ—

শোধিত স্বর্ণপত্র ১ পল, এবং গ্রাসনশক্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ দশম সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত পারদ ৮ পল, গন্ধক ১৬ পল একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে স্বর্ণ পৃথক করা যায় না।

উক্ত প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত মকরধ্বজ সচরাচর প্রচলিত মকরধ্বজ অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ফলপ্রদ।

ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রমতে পারদের বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে গ্রাস করিবার শক্তি আছে। তবে কেবলমাত্র শোধিত পারদের গ্রাসন শক্তি থাকে না। আয়ুর্ব্বেদীয় রসশাস্ত্রে পারদের যে অষ্টাদশ প্রকার সংস্কারের বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের অবিদিত। তাঁহারা কেবল পারদের অষ্টবিধ সংস্কার

জ্ঞাত আছেন। অষ্টবিধ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত পারদের ধাতু-ভোজন শক্তি জন্মে না সুতরাং তদ্রূপ পারদের দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে তাহাতে স্বর্ণ যে পৃথক ভাবে অবস্থান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রচলিত মতে প্রস্তুত মকরধ্বজে কেবলমাত্র শোধিত পারদের উক্ত ধাতুগ্রাসন শক্তি থাকা সুদূর পরাহত।

(১) **ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি ঃ**—গ্রাসন শক্তি বিশিষ্ট পারদ একপল গন্ধক ২ পল এবং শোধিত স্বর্ণ এক তোলা একত্রে কজ্জলি করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া সাধারণ মকরধ্বজ পাকের নিয়মে পাক করিলে যে মকরধ্বজ পাওয়া পাওয়া যাইবে তাহার সহিত পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পরিমিত গন্ধক মাড়িয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। এইরূপে পারদের ছয় গুণ গন্ধক পর্য্যবসিত হইলে অর্থাৎ ঐরূপক ছয়বার পাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে!

সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি :—

গ্রাসনশক্তি বিশিষ্ট পারদ দ্বারা সাধারণ মতে প্রস্তুত মকরধ্বজকে বিংশতিবার সমপরিমাণ গন্ধক দ্বারা মাড়িয়া বিংশতিবার পাক করিলে সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় বিধি :—

ষড়গুণবলিজারিত ও সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতের দ্বিতীয় বিধি ঃ—

ষড়গুণবলিজারণ বিধি

বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে একটি মাটির ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্নিজালে পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের

ন্যায় হইলে, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটী নামাইয়া, তাহার মধ্য হইতে পারদ ভাণ্ডটী তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটি ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে। এই পারদের নাম ষড়গুণবলিজারিত পারদ।

ইহা দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ বলে।

ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি

গ্রাসনশক্তিযুক্ত ষড়গুণবলিজারিত পারদ ১ পল (৮ তোলা) শোধিত স্বর্ণপত্র ১ তোলা, শোধিত গন্ধক (২ পল) ১৬ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিলে ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। এই ষড়গুণবলি-জারিত মকরধ্বজ অনুপান যোগে সর্ব্বরোগ হর।

যদি পারদ শুদ্ধ গন্ধক দ্বারা জারিত হয় তাহা হইলে শোধিত পারদ অপেক্ষা শতগুণ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ প্রকার দ্বিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে সর্ব্বকুষ্ঠাপহারী, ত্রিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে যাবতীয় জড়তা নাশক, চতুর্গুণ গন্ধকে জারিত হইলে বলিপলিত নাশক, পঞ্চগুণ গন্ধকে জারিত হইলে ক্ষয়রোগাপহারী এবং ষড়গুণ গন্ধকে জারিত হইলে সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

যে পারদ শতগুণ গন্ধক দ্বারা জারিত হইয়াছে যদি তাহাকে অভ্রসত্ত্ব দ্বারা জারিত করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বীর্যবান হইয়া থাকে। আবার স্বর্ণমাক্ষিক খর্পর ও হরিতাল ইত্যাদি দ্বারা জারিত হইলে তদপেক্ষাও গুণশালী হইয়া থাকে। স্বর্ণের সহিত পারদ জারিত হইলে সহস্রগুণ বীর্য্য সম্পন্ন হয়।

সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি ঃ—

বিংশতিগুণ শোধিত গন্ধক দ্বারা জারিত পারদ ১ পল (৮ তোলা) শোধিত স্বর্ণপত্র ১ তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা একত্রে বালুকাযন্ত্রে যথাবিধি পাক করিলে সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। এই সিদ্ধ মকরধ্বজ অমৃত তুল্য, ইহা অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক। সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য ব্যাধিতে, রোগিগণের মুমূর্ষ অবস্থায় ইহা যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ইহা প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। পৃথিবীর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই।

উপরে যে ষড়্গুণবলিজারিত এবং সিদ্ধমকরধ্বজের প্রস্তুতি বিধি লিখিত হইলে, তাহা অভিজ্ঞতা প্রসূত। উক্ত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে তাহাতে স্বর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করিবে না। পারদ ও গন্ধকের সহিত মিশিয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারতীয় রসশাস্ত্রের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের নিকট উক্ত প্রক্রিয়াগুলি অপরিজ্ঞাত। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময়ে খাঁটী মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় না।

অভ্র

অভ্র অমৃতস্বরূপ কষায়মধুররস, ধাতুবর্দ্ধক, ব্রণ, কুষ্ঠনাশক বাতপিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, মেধাবর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক, আরোগ্য-জনক বৃষ্য, আয়ুবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, উদর, গ্রন্থী, প্রমেহ, প্লীহা, বিষ ও কফনাশক, অগ্নির উদ্দীপক, শীতবীর্য্য এবং অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক।

খনিজ অভ্রই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা চারিপ্রকার,—পিনাক, নাগ, মণ্ডুক ও বজ্র। শ্বেতাদি বর্ণভেদে ইহারা প্রত্যেকেই আবার চতুর্ব্বিধ। পিনাক অভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে তাহার দলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; ইহা সেবিত হইলে মনুষ্যের মলরোধ করিয়া প্রাণনাশ করে। নাগাভ্র অগ্নিসন্তাপে নাগের ন্যায় ফোস ফোস শব্দ করে; ইহা সেবন করিলে মণ্ডল-কুষ্ঠরোগ জন্মে। মণ্ডুকাভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে স্ফীত হইয়া লাফাইয়া পড়ে; ইহা সেবিত হইলে শস্ত্রচিকিৎসারও অসাধ্য অশ্মরীরোগ উৎপাদন করে। বজ্রাভ্র অগ্নিসন্তাপে কোনরূপে বিকৃত হয় না; ইহা সেবনে দেহ লৌহসার এবং সর্ব্বরোগহীন হয়। বজ্রাভ্রই ঔষধে সর্ব্বথা ব্যবহার্য্য।

বর্ণভেদে অভ্র চারিভাগে বিভক্ত—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেত বর্ণ বিধানাদি কার্য্যে শ্বেত অভ্র, ও রক্তকর্ম্মে রক্ত অভ্র ও পীতকর্ম্মে পীত অভ্র ব্যবহার্য্য। রসায়ন কার্য্যে কৃষ্ণ অভ্রই সমধিক ফলপ্রদ। যে অভ্র স্নিগ্ধ, স্থূলদল, বর্ণবিশিষ্ট ও অধিক ভারযুক্ত, এবং যাহার দলগুলি অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। উত্তরদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্রই অত্যন্ত সত্ত্ববান ও গুণদায়ক।

চন্দ্রিকাযুক্ত অভ্র ঔষধার্থ প্রযোজ্য নহে। ইহা সেবন করিলে মেহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানারোগ জন্মে। অশুদ্ধ অভ্র আয়ুনাশক এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, ক্ষয়, বাত, শোথ, হৃদরোগ, পার্শ্ব বেদনা, কুষ্ঠ ক্ষয় উৎপাদক অতএব সর্ব্বকার্য্যে শোধিত অভ্র প্রয়োগ করা উচিত।

অভ্রের শোধনবিধি

১। অভ্র উত্তপ্ত করিয়া ক্রমশঃ সাতবার কাঁজিতে, গোমূত্রে ত্রিফলার কাথে, বিশেষতঃ গোদুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে বিশোধিত হয়।

২। অথবা অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া সাতবার নিসিন্দারসে স্বিন্ন করিলে উহা বিশোধিত হয়।

শোধনান্তে অভ্রকে ধান্যাভ্রে পরিণত করিবে।

ধান্যাভ্রবিধি।—অভ্রের চতুর্থাংশ শালিধান্যের সহিত অভ্রকে একত্র কম্বল বদ্ধ করিয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে অভ্রকণা নির্গত হইবে তাহার নাম ধান্যাভ্র।

ধান্যাভ্র ব্যাতিরেকে অভ্র শোধন বিধি

অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া কুলের ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহাকে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। এইভাবে শোধিত অভ্র ধান্যাভ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অভ্রের মারণ বিধি

১। হরিতাল, আমলকীর রস ও সোহাগার সহিত শোধিত অভ্রকে মর্দ্দন করিয়া একদিবস গজপুটে পাক করিবে। ছয়বার এইভাবে মর্দ্দন ও পাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে অভ্রের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। ইহা বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগে প্রশস্ত।

২। অথবা ঝোলাগুড় ও এরণ্ড পত্ররসে একদিন ভাবনা দিয়া অভ্রকে একদিবস গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তিনবার ভাবিত ও পুটপক্ক অভ্র নিরুত্থভাবে ভস্মীকৃত হয়। ইহা বিশেষভাবে অগ্নিবর্দ্ধক।

৩। অথবা একভাগ ধান্যাভ্র দুইভাগ সোহাগার সহিত মর্দ্দিত করিয়া অন্ধমূষায় প্রবল অগ্নিতে পুটপাক করিবে।

৪। অথবা দুইভাগ ধান্যাভ্র একভাগ শোধিত গন্ধকের সহিত বটের দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া এক দিন গজপুটে পাক করিবে।

অভ্রের অমৃতীকরণ—

ঘৃত ও অভ্র তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া লৌহ ভাণ্ডে পাক করিবে। যখন ঘৃত মরিয়া যাইবে, তখনই জানিবে যে অভ্রের অমৃতীকরণ হইয়াছে। উহাই সর্ব্বকর্ম্মে প্রযোজ্য।

অন্যপ্রকার—

১৬ পল ত্রিফলোত্থ কষায় অর্থাৎ ত্রিফলার কাথ, অষ্টপল গোঘৃত দশপল মাড়িত অভ্র এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহভাণ্ডস্থ করতঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তরল পদার্থ শুষ্ক হইলেই উহা গ্রহণ করিতে হয়; ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

নিত্য সেবিত জারিত অভ্রের গুণ—

নিত্য সেবিত জারিত অভ্র রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক বীর্য্যবর্দ্ধক দীর্ঘায়ুঃ ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুত্রজনক অকাল মৃত্যু-নাশক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

অভ্রভস্মের অনুপান

বিংশতিপ্রকার প্রমেহ রোগে—হরিদ্রা, পিপ্পলিচূর্ণ ও মধু অনুপান কর্ত্তব্য।

রাজযক্ষ্মারোগে—স্বর্ণভস্ম সহ অভ্রভস্ম ব্যবহার কর্ত্তব্য।

ধাতুবৃদ্ধিবিষয়ে—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভস্ম সহ।

রক্তপিত্তে—হরীতকী, গুড়, এলা ও শর্করা।

রাজযক্ষা, পাণ্ডু ও প্লীহায়ঃ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চতুর্জ্জাত (দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র ও নাগেশ্বর) শর্করা ও মধুসহ প্রত্যহ প্রাতে ১ মাত্রা সেব্য। মাত্রা দুই রতি পূর্ণবয়স্ক পক্ষে।

শুক্রমেহেঃ—গুড়চীরস ইক্ষুগুড় অথবা চিনি সহ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে:—এলা, গোক্ষুর, ভূধাত্রী, শর্করা ঘৃতসহ।

সন্তত: জ্বর ও ভ্রমে:—পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ।

দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধনে:—মধু ও ত্রিফলা সহ।

বিদ্রোধি ও দুষ্টব্রণে:—মূর্ব্বারস সহ।

অর্শে:—ভল্লাতক সহ।

বাতে:—শুঁঠ, পুষ্করমূল ভার্গী, অশ্বগন্ধা ও মধু সহ।

পিত্তবৃদ্ধিতে:—চতুর্জাত ও চিনি সংযোগে।

শ্লেষ্মা বৃদ্ধিতে:—কটফল পিপ্পলি ও মধু সহ।

পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে:—সর্ব্বপ্রকার ক্ষার সংযোগে।

মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে:—এলা গোক্ষুর, ভূধাত্রী গোদুগ্ধ ও শর্ককরা।

শক্তিবর্দ্ধনে:—গোদুগ্ধ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড সহ সেব্য।

শুক্রস্তম্ভনে:—বিজয়ার রস সহ।

বাতরক্তে:—হরীতকী ও ইক্ষুগুড় সহ।

চক্ষুরোগে ও শুক্রবর্দ্ধনে:—ত্রিফলা, ঘি ও মধু সহ।

অভ্র সেবনের সাধারণ বিধি

১ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ প্রাতে, ১ রতি অভ্রভস্ম এবং সমপরিমিত আমলকী, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত ১টী বটী সেবন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বর্ষে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ২টি করিয়া বটী এবং তৃতীয় বর্ষে প্রত্যহ তিনটি করিয়া বটী সেব্য। মানব উল্লিখিত নিয়মে একশত পল অভ্রভস্ম সেবন করিলে বলশালী ও স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পথ্য পালন করিয়া এই অভ্রভস্ম সেবন করিলে তিন মাস মধ্যে সমুদয় রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ইহা দ্বারা রাজযক্ষা, পাঁচপ্রকার কফ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, জটিল

উদরাময়, অর্শ, ভগন্দর, আমবাত, ক্ষয়, কামলা এবং অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

মৃত অভ্রের লক্ষণ

যথার্থরূপে ভস্মীভূত অভ্র নিশ্চন্দ্র এবং কজ্জল সদৃশ মসৃণ হইয়া থাকে। যে অভ্রভস্ম চন্দ্রিকাযুক্ত তাহা ঔষধে অব্যবহার্য্য।

অভ্রঅমৃতীকরণের বিশেষ বিধি

অভ্রভস্ম অরুণ ও কৃষ্ণভেদে দুই প্রকার। কেবল মাত্র কৃষ্ণবর্ণ অভ্রেরই অমৃতীকরণ প্রশস্ত।

অভ্রভস্মে পুটের বৈশিষ্ট

১। সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করিবার জন্য অভ্রকে দশ হইতে এক শতবার পুটপাক করিবে। রসায়ন কার্য্যে একশত হইতে এক সহস্রবার পর্য্যন্ত পুটপাক করা প্রয়োজন।

২। বায়ু নাশ করিবার জন্য অভ্রকে আঠারবার পুটপাক করিবে। পিত্ত নাশ করিবার জন্য উহাকে ছত্রিশবার পুটপাক করিবে; এবং শ্লেষ্মা নাশ করিবার জন্য উহাকে চুয়ান্নবার পুটপাক করিবে। অভ্রকে একশতবারের অধিককাল পাক করিলে তাহা বীজরূপে পরিণত হয়। উহা শোধিত হইলে বীর্য্য, ওজঃ, কান্তি, বল বৃদ্ধি হয়।

অভ্রমারকগণ

কাঁটানটে, বৃহতী, তাম্বূল, তগরপাদুকা, পুনর্ণবা, হিঞ্চে, থুলকুড়ি, চিরতা, আকন্দ, আদা, পলাশ, ইন্দুরকানী, ময়না, রাখালশশা, এরণ্ড এই সকল দ্রব্য দ্বারা পেষণ করিয়া পুট প্রদান করিলে অভ্র মাড়িতে হয়।

অভ্র সেবনে অপথ্য

অভ্রসেবী ক্ষার, অম্ল, সকল রকমের ডাইল, কর্কটী, বেগুন, এবং তৈল সেবন পরিত্যাগ করিবেন।

অপক্ক অভ্র সেবনের দোষ

যে অভ্র সম্যক্‌রূপে ভস্মীভূত হয় নাই তাহা ভক্ষণ করিলে সহসা মৃত্যু উপস্থিত হয়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সদৃশ গাত্র চর্ম্ম হয় এবং নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে।

অপক্ক অভ্র সেবন জনিত দোষের শান্তি

দুই তোলা পরিমিত আমলকী শীতল জলে বাঁটিয়া তিন দিন সেবন করিলে অপক্ক অভ্র সেবন জনিত দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

অভ্রের সত্ত্ব পাতন

অভ্রকে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগা দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মুসলীর রসে মর্দ্দন করিয়া কোষ্ঠীকাযন্ত্রে পুটপাক করিলে অভ্রের সত্ত্ব নির্গত হইয়া থাকে।

অভ্রসত্ত্বের শোধন বিধি

গোমূত্রে তিন দিবস ভাবনা দিলে অভ্র সত্ত্ব শোধিত হয়।

অভ্রসত্ত্বের ভস্মীকরণ

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া তিনভাগ অভ্র সত্ত্বের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যকে পিণ্ডীভূত করিয়া এরণ্ড পত্রে রুদ্ধ করিয়া এক ঘণ্টাকাল একটি তামার পাত্রে রৌদ্রে রাখিবে। তাহার পর ইহাকে তিন দিন যাবৎ ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তাহার পর বাহির করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে বিশুদ্ধ অভ্র সত্ত্ব ভস্ম পাওয়া যায়।

অভ্রসত্ত্বের সেবনবিধি

অভ্র সত্ত্ব যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত ত্রিফলার ক্কাথে ভাবনা দিবে। তাহার পর উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর ইহার সহিত ভৃঙ্গরাজের রস, আমলকীর

রস, হরিদ্রার রস, মধু, ছাগীঘৃত, গোমূত্র, মিশ্রিত করিয়া উহাকে একটি লৌহ সম্পুটে রুদ্ধ করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে এক মাস রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহাকে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। ঘৃত ও মধু সহ উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে মানব নানাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে এবং তাহার আয়ু ও বলবৃদ্ধি হয়।

অভ্রদ্রুতি

১। বিশুদ্ধ অভ্রকে সমপরিমিত কর্কোটিচূর্ণ ও পঞ্চামৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একদিন অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর উহাকে মূষারুদ্ধ করিয়া একদিন পুটপাক করিলে অভ্র পারদের ন্যায় তরল হইয়া থাকে!

২। ধান্যাভ্রকে বকফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া একটি ওলের ভিতর পুরিয়া গোয়াল ঘরে এক হস্ত পরিমিত গর্ত্ত করিয়া রাখিবে। একমাস পরে উদ্ধৃত করিলে দেখা যাইবে যে উহা পারদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে।

মাক্ষিক

মাক্ষিক—স্বর্ণশৈল হইতে উৎপন্ন এবং কাঞ্চন বর্ণ রসবিশেষ। মাক্ষিক ধাতু দুই প্রকার। স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। স্বর্ণমাক্ষিক ঈষৎ অম্লরসবিশিষ্ট, মধুররস এবং রৌপ্যমাক্ষিক কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত মধুর রস। উভয় মাক্ষিকই শীতবীর্য্য, পাকে কটু ও লঘু। ইহা সেবন করিলে জরা ব্যাধি ও বিষ দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। কান্যকুব্জ দেশজাত স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ সদৃশ এবং তপ্তী নদীর তীরভূমিজাত স্বর্ণমাক্ষিক পঞ্চ-বর্ণযুক্ত ও স্বর্ণ সদৃশ। রৌপ্যমাক্ষিক বহুপ্রকার বিশিষ্ট এবং স্বর্ণমাক্ষিক অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। মাক্ষিক সকল রোগনাশক, রসেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ, অত্যন্ত বৃর্য্য, দুর্ম্মেলক ধাতুদ্বয়ের মিলনকারক, বহুগুণযুক্ত এবং সমুদায় রসায়নের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

কোন কোন রসাচার্য্যের মতে মাক্ষিক তিনভাগে বিভক্ত। পীত-মাক্ষিক, শ্বেতমাক্ষিক ও রক্তমাক্ষিক। এই তিন প্রকার মাক্ষিকও আবার ক্ষেত্র ও আকৃতি ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—এক প্রকার কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোল, শুক্তিপুটের আকৃতি বিশিষ্ট, অঙ্গুরীর ন্যায় ও তুবরীভস্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

অশোধিত মাক্ষিক সেবনে দোষ

অশোধিত মাক্ষিক সেবন করিলে ক্ষুধানাশ, বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ব্রণ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মাক্ষিকের শোধন বিধি

এরণ্ড তৈল, ছোলঙ্গ লেবু বা কদলীমূলের রসের সহিত মাক্ষিক দুই ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। অথবা অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার কাথে নিক্ষেপ করিলেও মাক্ষিকধাতু শোধিত হইয়া থাকে।

মাক্ষিকের মারণ বিধি

শোধিত মাক্ষিক ও গন্ধক একত্র মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, পাঁচবার পুটদগ্ধ করিলে মৃত হয়। এরণ্ড তৈল, গব্য ঘৃত ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত খর্পর পাত্রে পাক করিলেও মাক্ষিক মৃত হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হয়। এইরূপে মৃত মাক্ষিক ধাতুরূপ ক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে প্রযোজ্য।

মাক্ষিকের সত্বপাতন বিধি

ত্রিশভাগ সীসক মিশ্রিত মাক্ষিক, ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মুখখোলা মূষায় রাখিয়া দগ্ধ করিলে, মাক্ষিকের সত্ব নিঃসৃত হয়। তৎপরে সেই সত্ব সাতবার গলাইয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলে মাক্ষিক সত্ব মিশ্রিত সীসক নষ্ট হইয়া যায়। মধু, এরণ্ড তৈল, গোমূত্র,

গব্যঘৃত ও কদলীমূলের রস এই সকল দ্রব্যের পুনঃপুনঃ ভাবনা দিয়া মূষা মধ্যে পুটদগ্ধ করিলেও মাক্ষিকের তাম্রবর্ণ মৃদু সত্ব নির্গত হয়। এইরূপে গলিত সত্ব শীতল হইলে, তাহা গুঞ্জা ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়।

মাক্ষিক সত্বের প্রয়োগ বিধি

মাক্ষিক সত্ব ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহার সহিত গন্ধক মিশাইবে, তৎপরে তাহাতে অভ্রসত্ব নিক্ষেপ করিয়া সমুদায় দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিবে। অতঃপর তাহার দ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া, লবণযন্ত্রে অর্দ্ধদিবস মৃদু অগ্নিতাপে তাহা পাক করিবে, এবং পাকের পর শীতল হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। এই মাক্ষিকসত্ব দুই রতি মাত্রায় মধু, ত্রিকটু চূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিবিধ রোগজনক জরা, অপমৃত্যু এবং দুঃসাধ্য ব্যাধিসমূহ সপ্তাহ মধ্যে নিবারিত হয়। ইহা অমৃতের অধিক উপকারী।

মাক্ষিকের সত্বদ্রুতি

এরণ্ড তৈল, গুঞ্জাফল মধু ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত মাক্ষিক সত্ব মর্দ্দন করিলে, তাহা দ্রবীভূত হয়।

মাক্ষিক ভস্মের অনুপান

ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ এবং ঘৃত এইসকল দ্রব্য অনুপানে মাক্ষিক ভস্ম ব্যবহার্য্য।

অশুদ্ধ মাক্ষিক ভক্ষণজনিত দোষের শান্তি

অশুদ্ধ মাক্ষিক ভক্ষণজনিত দোষে কুলথ কলায় ও দাড়িম ছালের ক্বাথ সেবন উপকারী।

বিমল

বিমল তিন প্রকার। স্বর্ণ বিমল, রৌপ্য বিমল ও কাংস্য বিমল। স্বর্ণাদির ন্যায় কান্তি অনুসারেই বিমলের এইরূপ নামভেদ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যে বিমল দেখিতে স্বর্ণের স্থায় তাহাকে স্বর্ণবিমল, যাহা রৌপ্যের স্থায় উজ্জল শুক্লবর্ণ তাহা রৌপ্যবিমল এবং যাহা কাংস্যের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট তাহা কাংস্য বিমল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিমল বর্ত্তুলাকৃতি, কোণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ এবং ফলকযুক্ত। ইহা বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য ও অত্যন্ত রসায়ন। স্বর্ণ ক্রিয়ায় স্বর্ণ বিমল, রৌপ্যকার্য্যে রৌপ্যবিমল এবং ঔষধাদিতে কাংস্য বিমল ব্যবহৃত হয়। কাংস্যবিমল অপেক্ষা রৌপ্যবিমল ও রৌপ্যবিমল অপেক্ষা স্বর্ণবিমল অধিক উপযুক্ত।

বিমলের শোধন প্রণালী

বাসকের কাথ, জামীরের রস অথবা মেষশৃঙ্গীর কাথের সহিত সিদ্ধ করিলে, বিমল ও অন্যান্য ধাতু শোধিত হয়।

বিমলের ভস্মীকরণ বিধি

গন্ধক ও মান্দারের রসের সহিত অথবা সোহাগা, মান্দারের রস ও মেষশৃঙ্গীর ভস্ম সহ বিমল মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং তাহার উপর মাটীর প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে যথাক্রমে দশবার পুটপাক করিবে এইরূপে বিমল ভস্মীভূত হয়।

বিমল হইতে সত্বপাতন

বিমলের সহিত সমপরিমিত সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, হীরাকস ও সোহাগা এবং বন্য ওল ও ঘণ্টা পারুলের ক্ষার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সজিনার রস ও কদলীমূলের রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া পুটদগ্ধ করিবে। এইরূপে বিমল হইতে উজ্জল সত্ব নির্গত হয়।

বিমল সত্বের প্রয়োগ বিধি

বিমল ১ ভাগ, পারদ ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, হরিতাল ৩ভাগ, মনঃশিলা ৫ ভাগ, রৌপ্য ভস্ম দশভাগের এক ভাগ, বৈক্রান্ত ভস্ম দশ ভাগের এক ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুচূর্ণিত হইলে বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে।

তৎপরে সেই চূর্ণ কুপী মধ্যে পূর্ণ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে এবং বিমল ত্রিকটু ও ত্রিফলার চূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত সেবন করিলে জরা, শোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, অরুচি, অর্শ, গ্রহণী, শূল, যক্ষ্মা, কামলা ও বাত পিত্তজ সর্ব্ববিধ পীড়া নিবারিত হয়।

শিলাধাতু (শিলাজতু)

স্বর্ণাদি পার্ব্বত্য ধাতু সকল সূর্য্য সন্তাপে গলিত হইয়া স্রুত হয়। তাহা হইতে লাক্ষা সদৃশ মৃদু, মসৃণ ও স্বচ্ছ যে মলপদার্থ বহির্গত হয় তাহাকে শিলাজতু কহে। শিলাজতু রসায়ন গুণ বিশিষ্ট। ইহা দুই প্রকার, কর্পূর শিলাজতু ও গোমূত্র শিলাজতু, গোমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত শিলাজতুকে গোমূত্র শিলাজতু এবং কর্পূরের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট শিলাজতুকে কর্পূর শিলাজতু কহে। তন্মধ্যে গোমূত্রগন্ধি শিলাজতু দুই প্রকার, সসত্ত্ব ও নিঃসত্ত্ব। এই উভয়ের মধ্যে সসত্ত্ব শিলাজতুই অধিক গুণশালী। হিমালয় পর্ব্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, বঙ্গ ও সীসক, গর্ভ পাদদেশ তীব্র সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে শিলাজতু নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শিলাজতুর প্রকার ভেদ—

স্বর্ণ শিলাজতু ঃ—

স্বর্ণ শিলাজতু মধুর, অল্পতিক্ত, জবাফুল সদৃশ, স্নিগ্ধ, গৈরিক বর্ণ, বিপাকে কটুতিক্ত ,ও বাতপিত্ত নাশক। ইহা স্বর্ণগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রজতশিলাজতু ঃ—

ক্ষার কটু, অম্লরস বিশিষ্ট এবং বিদাহি, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরু, পাণ্ডু, পিত্ত, মেহ, অজীর্ণ, জ্বর, শোথ, প্লীহা ও বাতনাশক। ইহা রৌপ্য গর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

তাম্রশিলাজতু ঃ—

তাম্রশিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তিক্ত, কটুরস, তীক্ষ্ণ, কটুবিপাক, মেহ, অম্লপিত্ত, জ্বরও শোষ নাশক। ইহা তাম্রগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

লৌহশিলাজতু

লৌহ শিলাজতু তিক্ত, লবণান্বিত, কটুবিপাক ও শীতল। লৌহ শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা রসায়ন এবং ত্রিদোষ নাশক।

বঙ্গশিলাজতু

বঙ্গশিলাজতু তিক্ত, কটু, ঘন, কর্দ্দমবৎ এবং বঙ্গ সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সদ্য জলোদর, প্রমেহ, জ্বর, ক্ষয়, শোষ ও বিসর্প নাশক। ইহা বঙ্গগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত।

সীসকশিলাজতু ঃ—

সীসকশিলাজতু মৃদু, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, কুসুমবর্ণবিশিষ্ট, কটুরসপ্রধান, বর্ণতেজ এবং বীর্য্যবৃদ্ধিকর। সীসকগর্ভপর্ব্বত হইতে ইহা নিঃসৃত হয়।

বিশুদ্ধশিলাজতুর পরীক্ষা বিধি ঃ—

যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নির্ধূম ভাবে দগ্ধ হইয়া লৌহ মলের ন্যায় হয়, এবং পরে তাহা জলে ফেলিলে প্রথমে ভাসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ তারের মত গলিয়া নীচে পড়িয়া যায়—তাহাই উৎকৃষ্ট শিলাজতু।

শিলাজতুর সাধারণ গুণ ঃ—

শিলাজতু অনম্ল, কষায়, কটুবিপাক, নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতল। ইহা যোগবাহি, রসায়ন, ছেদি, কফ, কম্প, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, অপস্মার, বাত, অর্শ, উন্মাদ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ক্রিমি, জ্বর, পাণ্ডু শোথ,

মেহ, অগ্নিমান্দ্য, মেদরোগ, যক্ষ্মা, শূল, গুল্ম, প্লীহা, আম, সর্ব্বপ্রকার মূত্রক ও গর্ভ রোগ, উদররোগ হৃদ্রোগ ও আমাশয় রোগ নাশক।

শিলাজতুর শোধন বিধি—

ত্রিফলার ক্বাথ, গোদুগ্ধ এবং ভৃঙ্গরাজের রস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা শিলাজতুকে একদিন মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়। বাতঘ্ন পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সকলের ক্বাথে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিলে শিলাজতুর বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

শিলাজতুর ভাবনা বিধি—

শিলাজতু, ঈষদুষ্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের ক্বাথে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং ক্বাথ শুষ্ক হইলে পুনরায় অপর ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাত দিবস করিলেই ভাবনা দেওয়া হয়। শিলাজতুর সমান ক্বাথ্য দ্রব্য চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উষ্ণাবস্থায় তাহাতে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া ও তাহা আলোড়ন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে এবং পুনরায় উক্তরূপে প্রস্তুত ক্বাথ তাহাতে দিবে। এইরূপ সপ্তাহ কাল করিবে। এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু ও জারিত লৌহ (শিলাজতুর চতুর্থাংশ লৌহভস্ম) একত্র দুগ্ধসহ সেবন করিলে সুখকর দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। ইহা জরাব্যাধি নাশক, দেহের উৎকৃষ্ট দৃঢ়তা সম্পাদক, মেধা স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক এবং ধন্য, এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধপ্রধান দ্রব্য আহার করিবে।

শিলাজতুর সেবনকাল ও মাত্রা বিধি—

শিলাজতু সেবনকাল ত্রিবিধ। যথা সাত সপ্তাহ উৎকৃষ্ট প্রয়োগ, তিন সপ্তাহ মধ্যম প্রয়োগ এবং এক সপ্তাহ অধম প্রয়োগ। ইহার

মাত্রাও ত্রিবিধ, যথা ১ পল উত্তম মাত্রা, অর্দ্ধ পল মধ্যম মাত্রা এবং এক কর্ষ অধমমাত্রা। শিলাজতু সেবনকালে বিদাহি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং কুলত্থকলায়, কাকমাচি ও কপোত মাংস ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ, শুক্ত, মাংস রস, যুষ, জল, গোমূত্র এবং নানাবিধ কষায়সহ শিলাজতু আলোড়িত করিয়া সেবন করিবে। শিলাজতুসেবী শিলাজতু সেবনের পূর্ব্বে, সেবনকালে, এবং সেবনের পরে ব্যায়াম, আতপ সেবন, বায়ু সেবন, চিন্তা, গুরুপাক দ্রব্য, বিদাহি দ্রব্য, অম্ল দ্রব্য, ভর্জ্জিত দ্রব্য এবং দুষ্পাচ্য দ্রব্য, ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সযত্ন রক্ষিত বৃষ্টিরজল, কূপেরজল ও নির্ঝরিণীজল পান করিবে।

বিশুদ্ধ শিলাজতুর পরীক্ষা ঃ—

যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে এবং যাহা হইতে ধূম উদ্গত না হয় ও যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে বিলীন হইয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ শিলাজতু।

শিলাজতুর ভস্ম বিধি ঃ—

শিলাজতুর সমপরিমিত মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল একত্র মিশ্রিত করিয়া মাতুলুঙ্গ লেবুর রসে মাড়িয়া আটখানি বনঘুটে দ্বারা পুটপাক করিলে শিলাজতু ভস্মীভূত হয়।

শিলাজতু সেবন বিধি ঃ—

শিলাজতু ভস্ম দুইরতি, কান্তলৌহ ভস্ম ২ রতি ও বৈক্রান্ত ভস্ম ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত, পাণ্ডু যক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, বহুবিধশূল ও যোনিব্যাপদ প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। রসায়ন বিধানানুসারে শিলাজতু ছয়মাস সেবন করিলে, বলী-পলিত-শূন্য দেহে একশত বৎসর সুখে জীবিত থাকা যায়।

শিলাজতুর সত্ত্বপাতন :—

দ্রাবণ বর্গ ও অম্লবর্গের সহিত শিলাজতু পেষণ পূর্ব্বক মুখারুদ্ধ করিয়া কয়লা দ্বারা হাপরে দগ্ধ করিলে শিলাজতুর লৌহ সদৃশ সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। কর্পূরগন্ধি শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ ও বালুকাকৃতি। এই শিলাজতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। বড় কইমাছের কাথে ইহা সুস্বিন্ন করিলে শোধিত হয়। পণ্ডিতগণ এই শিলাজতুর মারণ ও সত্ত্ব পাতন আবশ্যক বোধ করেন না।

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবনের দোষ :—

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবনে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পিত্তবিকার, শোণিতস্রাব, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়।

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবন জনিত বিকার নিবারণের উপায় :—

সিকি তোলা পরিমিত গোলমরিচ চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অশুদ্ধ শিলাজতু সেবন জনিত বিকার নিবারিত হয় হয়।

ঔষরাখ্য শিলাজতু

শিলাজতু দুই প্রকার; গিরিসম্ভূত ও মৃত্তিকা সম্ভূত। ঔষরাখ্য শিলাজতুকে মৃত্তিকা সম্ভূত কহে। ইহ, এক প্রকার শ্বেতক্ষার পদার্থ। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক, বর্ণ প্রসাদক এবং যাবতীয় মূত্ররোগে হিতকর। গিরি, সম্ভূত শিলাজতুর প্রকার ভেদ ও গুণ পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(তুহক) তুঁতে

তাম্র ও গন্ধক সহযোগে তুঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে তাম্রের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহা কটু, তিক্ত, ক্ষার ও কষায় রস

বিশিষ্ট, বমনকারক ও লঘু। ইহা ভেদক, লেখন গুণ বিশিষ্ট, শীত বীর্য্য, কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা ও ক্রিমিনাশক

তুঁতের শোধন বিধি (১):—একদিন লেবুর রসে মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। তাহার পর তিনদিন অম্ল দধির দ্বারা ভাবনা দিবে।

তুঁতের শোধন বিধি (২):—তুঁতের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উহাকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাকে উত্তমরূপে গজপুটে পাক করিবে। তুঁতেকে অম্লবর্গে ও তৈলে অথবা তক্রে নিসিক্ত করিয়া অশ্বমূত্রে গোমূত্রে ১ দিন দোলা যন্ত্রে পাক করিলে ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

তুঁতের সত্ত্ব পাতন:—সমপরিমাণ সোহাগার সহিত তুঁতেকে গলাইলে উহার সত্ত্ব পাতিত হইয়া থাকে।

বিনা অগ্নিযোগে তুঁতের সত্ত্ব পাতন:—তুঁতেকে চূর্ণ করিয়া লেবুরসে লৌহ পাত্রে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিলেও ইহা হইতে সত্ত্ব নিঃসৃত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ হইতে তাম্র প্রস্তুত বিধি:—ময়ূরপুচ্ছকে ঘৃত ও মধু সংযোগে ভস্ম করিবে। তৎপরে উহার সহিত উহার সমপরিমিত খইল, গুগ্‌গুলু, ক্ষুদ্রমৎস্য, সোহাগা, মধু, গুড়, অশ্বত্থ বৃক্ষের গালা ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া একটি তাল পাকাইবে। তৎপরে ঐ তালটিকে একটি অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহার দ্বারা যে তাম্র প্রস্তুত হয় তাহাকে নাগতাম্র কহে।

শূলঘ্ন অঙ্গুরীয়ক:—তুত্থকসত্ত্ব, নাগতাম্র এবং স্বর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণকার দ্বারা একটি অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিবে।

এই অঙ্গুরীয়ক ধারণমাত্র যাবতীয় শূলবেদনা সন্ত নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ ও ভূতদোষ নষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ রসাচার্য্য ভালুকি বলিয়াছেন যে তৈল মধ্যে এই অঙ্গুরীয়ক নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তপ্ত করিলে, তৈল মর্দ্দনে শরীরের যে কোন স্থানের বেদনা নিবারিত হয়, ইহা মর্দ্দনে সত্বর প্রসব বেদনাও নিবারিত হয় এবং প্রসূতি সুখে সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। এই তৈল প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

তুত্থকসত্বের ভস্ম বিধিঃ—তুত্থকসত্ব ১ ভাগ, পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ একত্র লেবুর রসে ৯ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া উহাকে ধুতুরা পত্রে বন্ধন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুট শীতল হইলে তুত্থক সত্ব চূর্ণ করিয়া লইবে। উহাই তুত্থক সত্ব ভস্ম।

অশুদ্ধ তুত্থক সেবন-জনিত বিকার নিবারণের উপায়ঃ—তিন দিন গোঁড়া লেবুর রস পান করিলে অশুদ্ধ তুত্থক সেবন-জনিত বিকার নিবারিত হয়।

সস্যক

সস্যক ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ও অতিভারশীল।

সস্যক সর্ব্বদোষনাশক এবং বিষদোষ, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শ, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, মলাদির বিবন্ধ ও শ্বিত্ররোগের উপশম কারক। ইহা রসায়ন, বমন ও বিরেচন—কারক এবং দূষীবিষ নাশক। রক্তবর্গের ভাবনা দিলে অথবা স্নেহ বর্গদ্বারা সাতবার সিক্ত করিলে সস্যক শোধিত হয়। গো মহিষ ও ছাগের মূত্রে তিন প্রহর দোলা যন্ত্রে পাক করিলে সস্যক এবং খর্পর শোধিক হইয়া থাকে। মান্দারের রস, গন্ধক ও সোহাগার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক, মূষা মধ্যে বদ্ধ করিয়া কুক্কুটপুটে দগ্ধ করিলে সস্যক মৃত হইয়া থাকে। সস্যকের ভস্ম চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগার

সহিত করঞ্জতৈলে ১ দিন ভিজাইয়া অন্ধমূষায় তিন দিন অঙ্গারাগ্নিতে হাপরে দগ্ধ করিলে, ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ অতি সুন্দর সস্তকসত্ব নির্গত হয়। অথবা অল্প সোহাগা ও লেবুর রসের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষাবদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও সস্তকের তাম্র বর্ণ সত্ব নিঃসৃত হয়।

কিম্বা শোধিত সস্তক ও মনঃশিলা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক দগ্ধ করিলেও সত্ব নির্গত হয়। এইরূপ নানাবিধানে সস্তকের সত্ব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

সস্তক সত্বের অঙ্গুরীয়কঃ—কঠিন সীসক সত্বের সহিত এই সস্তক সত্ব মিশ্রিত করিয়া তাহার মুদ্রিকা (আংটী ও মাদুলি) স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ শূল নিবারিত হয়। এই মুদ্রিকা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিষ ও ভূত ডাকিনীর দৃষ্টি জন্য পীড়া সমূহ নাশ করে। ইহা দৃষ্ট প্রত্যয় জনক। অগ্নিতপ্ত তৈলে এই মুদ্রিকা নিক্ষেপকরিয়া সেই তৈল লেপন করিলে, যে কোন স্থানের শূল তৎক্ষণাৎ নিশ্চিন্ত নিবারিত হয়। ইহা সত্বপ্রসব কারক ও আশু নেত্ররোগ নাশক।

চপল

চপল চারিপ্রকার। গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, অরুণ বর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ তন্মধ্যে স্বর্ণ বর্ণ ও রৌপ্য বর্ণ চপল বিশেষরূপে রসবন্ধন কারক। অপর দুই প্রকার অর্থাৎ অরুণ ও কৃষ্ণচপল লাক্ষারন্যায় শীঘ্র গলিয়া যায়, এবং তাহারা নিষ্ফল অর্থাৎ গুণহীন। অগ্নিতাপে বঙ্গের ন্যায় চপল শীঘ্র গলিয়া যায় এইজন্য ইহা চপল নামে অভিহিত হইয়াছে। চপল লেখনকারক, স্নিগ্ধ, দেহের দৃঢ়তাকারক রসরাজের সহায়, উষ্ণবীর্য এবং তিক্ত ও মধুররস। ইহা স্ফটিককান্তি, ষট্‌কোণ, স্নিগ্ধ, গুরু, ত্রিদোষনাশক

অতিশয় বৃষ্য ও রসের বন্ধন কারক। কাহারও মতে চপল মহারস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

জাম্বীর, কর্কোটক, (কাঁকরোল) ও আদায় রসে ভাবনা দিলে চপল শোধিত হইয়া থাকে। অথবা চপলপ্রস্তর প্রথমে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ কাঁজি, উপবিষ ও বিষের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহার পিণ্ড করিবে পরে পাতন যন্ত্রে যথাবিধি পাক করিয়া তাহাহা পাতিত করিবে। এইরূপে চপল শোধিত হয়।

রসক (খর্পর)

রসক দুই প্রকার; দুর্দর ও কারবেল্লক। দলবিশিষ্ট রসককে দুর্দর রসক, এবং দলহীন রসককে কারবেল্লক রসক কহে। ইহার মধ্যে দুর্দর রসক সত্বপাতন কার্য্যে, এবং কারবেল্লক রসক ঔষধ ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। রসক সর্ব্ববিধ মেহনাশক। কফপিত্ত নিবারক, নেত্ররোগ নাশক ও ক্ষয় নিবারক। ইহা লৌহ ও পারদের রঞ্জনকারক। রস ও উভয়বিধ রসক দেহের অত্যন্ত দৃঢ়তাকারক। রস ও রসককে অগ্নি-তাপে স্থির রাখিতে পারিলে দেহ সুদৃঢ় হইয়া থাকে। রসক তিক্ত অলাবু রসে আলোড়িত করিয়া পাক করিলে শুদ্ধ, নির্দ্দোষ ও পীতবর্ণ হয়। রসক অগ্নিতপ্ত করিয়া সাতবার মাতুলুঙ্গ রসে নিমগ্ন করিলেও নির্ম্মল হইয়া থাকে। অথবা রসককে অগ্নিতপ্ত করিয়া এক একবার নরমূত্র, অশ্বমূত্র, তক্র ও কাঁজিতে নিমগ্ন করিলেও শোধিত হয়। রসক একমাস কাল নরমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, সেই রসক দ্বারা শুদ্ধ পারদ তাম্র ও রৌপ্য বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় রঞ্জিত হয়।

হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধুনা, সৈন্ধব, গৃহধূম, সোহাগা ও ভেলা প্রত্যেক চতুর্থাংশ পরিমিত, এইসকল দ্রব্য এবং কাঁজির সহিত খর্পর মর্দ্দন করিয়া তাহা বেগুনের মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক লেপন করিবে।

শুষ্ক হইলে সেই মূষার মুখ বন্ধ করিবে এবং অপর একটি মূষায়

তাহা স্থাপিত করিয়া হাপরে পোড়াইবে। মূষা মধ্যস্থ খর্পর গলিয়া যখন নীল ও শ্বেত শিখা উদ্গত হইবে, তখন সাঁড়াশী দ্বারা সেই মূষা অধোমুখে ধরিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে আস্ফালন করিবে, যেন সেই বেগুনের মূষা ভাঙ্গিয়া না যায়। এইরূপে রসক হইতে বঙ্গের ন্যায় স্বত্ব নিঃসৃত হয়। তিন চারিবার এইরূপ দগ্ধ করিলে তাহার সমুদায় সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া পড়ে। হরীতকী, লাক্ষা, কেঁচো, হরিদ্রা, গৃহধুম ও সোহাগা এইসকল দ্রব্যের সহিত রসক মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও রসকের শুদ্ধসত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা লাক্ষা, গুড়, শ্বেতসর্ষপ, হরীতকী, হরিদ্রা, ধুনা ও সোহাগার সহিত রসক চূর্ণ করিয়া গোদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিবে। তৎপরে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া বেগুনের মূষা মধ্যে রুদ্ধ ও পুনঃপুনঃ হাপরে দগ্ধ করিয়া শিলাপাত্রে ঢালিবে। এইরূপে বঙ্গের ন্যায় মনোহর সত্ত্ব নিঃসৃত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে। এই রসক সত্ত্ব ও হরিতাল খর্পরে রাখিয়া অগ্নিতে জাল দিবে এবং লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে তাহাতে সেই সত্ত্ব ভস্মীভূত হইবে। এই ভস্ম সমপরিমিত কান্তলৌহ ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা আট রতি পরিমানে লইবে। ত্রিফলার ক্বাথে তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া তাহা একরাত্রি কান্ত লৌহপাত্রে রাখিতে হইবে, তৎপরে ঐ ক্বাথ সহ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে মধুমেহ, পিত্ত বিকৃতি, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, সোমরোগ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং স্ত্রীদিগের রক্তগুল্ম, প্রদর, যোনিব্যাপদ ও রজশূল নিবারিত হয়।

গৈরিক

গৈরিক দুই প্রকার। পাষার্ণগৈরিক ও স্বর্ণগৈরিক।

কঠিন ও তাম্রবর্ণ গৈরিককে পাষাণ গৈরিক কহে আর যাহা অত্যন্ত রক্তবর্ণ স্নিগ্ধ ও মসৃণ, তাহার নাম স্বর্ণ গৈরিক। স্বর্ণ গৈরিক স্বাদু, স্নিগ্ধ শীতল, কষায়রস নেত্ররোগে হিতকর, রক্ত দুষ্টি নাশক এবং

রক্তপিত্ত, হিক্কা, বমি ও বিষদোষ নিবারক। পাষাণগৈরিক স্বর্ণগৈরিক অপেক্ষা অল্পগুণ বিশিষ্ট। গোদুগ্ধের ভাবনা দ্বারা গৈরিক শোধিত হয়। ক্ষার ও অম্ল দ্বারা ক্লিন্ন করিলে, গৈরিক হইতে সত্ত্ব নির্গত হয়। গৈরিক সত্ত্ব পারদের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহা অধিক গুণশালী হইয়া থাকে। গৈরিক, পাংশুলবর্ণ, শুঁঠ, বচ, কটফল এবং কাঁজি, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। উক্ত প্রলেপ ত্রিদোষ এবং সান্নিপাতিক জ্বরোৎপন্ন কর্ণমূল জাত শোথে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। পিত্তোল্বন জ্বরে গৈরিক কেবল মধু সংযোগে কিংবা পারদ, গন্ধক ও মধু সহ ব্যবহার্য্য। ইহা ধনে, বেনারমূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ অনুপান করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। কিম্বা এলাইচ, চিনি, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী গৈরিক এবং রসাঞ্জন ইহাদিগকে একত্র মর্দ্দন করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া চক্ষে অঞ্জনবৎ ব্যবহার করিলে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রক্তচন্দন, লাক্ষা, মালতী কলিকা একত্রে মলম করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে নেত্রব্রণ নষ্ট হয় কাঁজিসহ সিকি তোলা পরিমিত গৈরিক দিবসে চারিবার সেবন করিলে শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। পাকা তেঁতুল ও গৈরিক একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে যাবতীয় শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। সিকিতোলা পরিমাণে গৈরিক জলসহ সেবন করিলে পিত্তজ ব্যাধি নষ্ট হয়।

পিত্ত বিকৃতি জনিত বিসর্প ও চর্ম্মরোগে গৈরিক, ঘৃতসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শরীরে কোন স্থান দগ্ধ হইলে, ইহা নারিকেল তৈল ও ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয় ও ক্ষত হইতে পারে না। আমের আঁঠিশস্য চূর্ণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটফল ইহাদের সহিত গৈরিক একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে যোনি কন্দ নিবারিত হয়।

কাসীস—(হীরাকস)

কাসীস দুইপ্রকার—বালুকা কাসীস ও পুষ্প কাসীস। বালুকা ও পুষ্প উভয় কাসীসই ক্ষার পদার্থ, অম্লরস, অগুরু ধূমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, শ্বিত্র নিবারক ও কেশরঞ্জক। তন্মধ্যে পুষ্প কাসীস অধিক প্রসিদ্ধ। ইহা উষ্ণবীর্য্য কষায় অম্লরস, নেত্রের অত্যন্ত হিতকর, কেশরঞ্জক এবং বিষদোষ, শ্বিত্র, ক্ষয়, ব্রণ ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ সমূহের বিনাশ কারক।

একবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিলেই হীরাকস শোধিত হয়। তুবরী হইতে সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে কাসীসের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়। পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিলেও কাসীস শোধিত হইয়া থাকে।

গন্ধক জারিত কাসীস এবং কাসীস জারিত বৈক্রান্ত উভয় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ চুর্ণ এবং সমপরিমিত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্বিত্র, পাণ্ডু ক্ষয়, গুল্ম, প্লীহা, শূল, বিশেষতঃ অর্শরোগও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রসায়ন বিধি অনুসারে ইহা এক বৎসরকাল সেবনে আমদোষ শোধিত হয়, মন্দ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং বলিপলিতাদি নিশ্চিতই নিবারিত হয়।

তুবরি—(সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা)

সৌরাষ্ট্র দেশের প্রস্তর হইতে তুবরী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) নামক মসৃণ মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ইহা বস্ত্রে লেপন করিলে, বস্ত্র মঞ্জিষ্ঠা রাগ রঞ্জিতের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। পীতিকা ফুল্লিকা নামক আর এক প্রকার তুবরী আছে। তন্মধ্যে পীতিকা (কাঠখড়ি) ঈষৎ পীতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, বিষনাশক, এবং ব্রণ ও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগের উপকারক। ফুল্লিকা শুক্লবর্ণ, ভারশূন্য, স্নিগ্ধ ও অম্লরস যুক্ত। এই ফুল্ল তুবরী তাম্রে লেপন করিলে তাম্র লৌহের আকার ধারণ করে।

তুবরীর অপরনাম কাঙ্খী। ইহা কটু, কষায়, অম্লরস যুক্ত, কণ্ঠ শোধক কেশের হিতকর, ব্রণনাশক, বিষনিবারক, শ্বিত্র নাশক, নেত্রের উপকারী ত্রিদোষের উপশমকারক, এবং পারদের জারণ কার্য্যে উপযোগী।

তুবরী তিনদিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়, এবং ক্ষার ও অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলে ইহার সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা ইহাকে গোপিত্ত দ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া শোধন করিবে এবং তৎপরে হাপরে দগ্ধ করিয়া ইহার সত্ত্ব পাতন করিবে।

কঙ্কুষ্ঠ

হিমালয়ের প্রচণ্ড শিখর হইতে কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার; নলিকা কঙ্কুষ্ঠ ও রেণুক কঙ্কুষ্ঠ। তন্মধ্যে নলিকা কঙ্কুষ্ঠ পীতবর্ণ গুরু ও স্নিগ্ধ এবং ইহাই উৎকৃষ্ট; রেণুক কঙ্কুষ্ঠ শ্যাম-পীতবর্ণ, লঘু ও সত্ত্বহীন, ইহা নিকৃষ্ট।

কেহ কেহ বলেন সদ্যোজাত হস্তীর বিষ্ঠা হইতে শ্যাম পীতবর্ণ কঙ্কুষ্ঠ উৎপন্ন হয় ইহা বিরেচক। অপর কেহ কেহ বলেন তেজিবাহর নাল শ্বেত-পীতবর্ণ কঙ্কুষ্ঠরূপে পরিণত হয়। তাহা অত্যন্ত বিরেচক, সত্ত্বহীন, বহু বিকারজনক এবং রসক্রিয়া ও রসায়ন কার্য্যে অনুপযোগী।

কঙ্কুষ্ঠ কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অতি বিরেচক এবং ব্রণ, উদাবর্ত্ত, শূল গুল্ম, প্লীহা অর্শ প্রভৃতি রোগনাশক।

সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে), কদলীমূল, বন্ধ্যা কর্কোটকী (তেঁত কাঁকরোল), কোশাতকী (ঘোষালতা), দেবদালী, শজিনা ছাল, বন্য ওল, নিরকনা বা নীরকনা ও কাকমাচী, এই সকল দ্রব্যের এক একটির রস দ্বারা এবং লবণক্ষার ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা বহুবার ভাবনা দিলে কঙ্কুষ্ঠ প্রভৃতি রস ও উপরস সমূহ শোধিত হয়। আর ঐ সকলেরই ভাবনা দিয়া আঘাত করিলে সমুদায় উপরসেরই সত্ত্ব নির্গত হইয়া থাকে। শুঁঠীর কাথ দ্বারা

তিনবার ভাবনা দিলেও কঙ্কুষ্ঠ শোধিত হয়। কঙ্কুষ্ঠ সত্ত্বময়, এইজন্য ইহার সত্ত্বাকর্ষণের বিধান নির্দ্দিষ্ট নাই।

বিরেচনযোগ্য ব্যক্তির বিরেচনের জন্য এক যব মাত্রায় কঙ্কুষ্ঠ মলরোধক দ্রব্যের সহিত সেবন করিবে, তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে শরীরের আমপূর্ণতা বিনষ্ট হয়। তাম্বুলের সহিত ইহা ভক্ষণ করিলে, বিরেচন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কঙ্কুষ্ঠ সেবনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, সেই বিষ নাশের জন্য বাবলা মূলের ক্বাথের সহিত সমপরিমিত জীরা ও সোহাগা বারংবার সেবন করা আবশ্যক।

স্ফটিক

তুবরী সত্ত্ব স্ফটিক নামে অভিহিত। ইহা অগ্নিতে গলাইয়া লইলেই শোধিত হয়। স্ফটিক ব্রণ, উরুক্ষত ও শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা পারদের জারণ কার্য্যে সাহায্য করে। ইহা দেখিতে উৎকৃষ্ট সৈন্ধব লবণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট।

সাধারণ রস

কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ, নবসার, কপর্দ্দক, অগ্নিজার, গিরিসিন্দুর, হিঙ্গুল ও মৃদ্দারশৃঙ্গ এই আট প্রকার সাধারণ রস। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে রসের অন্তর্ভুক্ত বলেন।

কম্পিল্ল :—কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি) ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় ও বহু চন্দ্রিকা (চাকচিক্য) বিশিষ্ট। ইহা অত্যন্ত বিরেচক। কম্পিল্ল সৌরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়। পিত্ত, ব্রণ, আধ্মান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, শ্লেষ্মা উদর-রোগ, ক্রিমি, গুল্ম, অর্শ, আমদোষ, শোথ, জ্বর ও শূল প্রভৃতি বিরেচন সাধ্য সমুদায় রোগ ইহাদ্বারা বিনষ্ট হয়।

গৌরীপাষাণ ঃ—পীত, বিকট ও হস্তচূর্ণক নামভেদে গৌরীপাষাণ তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে হস্তচূর্ণক স্ফটীকবৎ, বিকট শঙ্খের ন্যায় এবং পীত হরিদ্রাবর্ণ। হস্তচুর্ণক অপেক্ষা বিকট এবং বিকট অপেক্ষা পীত গৌরীপাষাণ অধিক গুণশালী। গৌরীপাষাণ করোলা ফলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া, হাড়ীতে করিয়া সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। হরিতালের সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে ইহার সত্ত্ব আকর্ষণ করিতে হয়। গৌরীপাষাণের শুদ্ধ সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, দোষ নাশক এবং পারদের বন্ধন কারক ও বীর্য্য বর্দ্ধক।

নবসার ঃ—বাঁশের অঙ্কুর বা পীলুকাষ্ঠ পচিলে, তাহা হইতে যে ক্ষার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নবসার কহে। ইহার অপর নাম চুলিকা লবণ। দগ্ধ ইষ্টকে যে শ্বেতবর্ণ লঘু লবণবৎ পদার্থ জন্মে, তাহাও নবসার বা চুলিকা লবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নবসার, পারদের জারণ কারক, ধাতু সমূহের দ্রাবণ কারক, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি কারক এবং গুল্ম, প্লীহা, মুখশোষ, এবং ত্রিদোষের বিনাশক। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। চুলিকালবণ বিড়দ্রব্য (রসজারণ) মধ্যে পরিগণিত।

কপর্দ্দক ঃ—যে বরাটিকা (কপর্দ্দক) পীতাভ, পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং দীর্ঘবৃত্তাকৃতি, সেই বরাটিকাই রসবৈদ্যগণ রসকার্য্যে নির্দ্দেশ করেন। ইহার অপর নাম চরাচর। সার্দ্ধনিষ্ক অর্থাৎ ৬ ছয় মাষা পরিমিত বরাটিকা উৎকৃষ্ট, নিষ্ক (চারি মাষা) পরিমিত মধ্যম এবং নিষ্কের এক অংশ কম অর্থাৎ তিন মাষা পরিমিত হইলে, সেই বরাটিকা নিকৃষ্ট। বরাটিকা পরিণামাদি শূলনাশক, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ নিবারক এবং কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা পারদ জারণে প্রশস্ত এবং বিড়দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত বরাটিকা ভিন্ন অন্যান্য বরাটিকা গুরু ও

পিত্তরোগজনক। এক প্রহরকাল কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিলে বরাটিকা শোধিত হয়।

অগ্নিজার ঃ—অগ্নিনক্রের জরায়ু সাগর তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থলে পতিত হইলে এবং রৌদ্র তাপে শুষ্ক হইয়া গেলে, তাহা অগ্নিজার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অগ্নিজার ত্রিদোষ নাশক, ধনুঃস্তম্ভাদি বাতব্যাধি নিবারক। পারদের বীর্য্য বর্দ্ধক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক ও জীর্ণকর। ইহা সমুদ্রের ক্ষার জলে পূর্ব্বেই শুদ্ধ হয়, এই জন্য ইহার শোধন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

গিরিসিন্দুর ঃ—মহাগিরির পাষাণ গর্ভে রক্তবর্ণ ও শুষ্ক যে অল্প পরিমিত রস পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই গিরিসিন্দুর নামে নির্দ্দিষ্ট। গিবিসিন্দুব ত্রিদোষ নশেক, ভেদক, বসবন্ধনে প্রশস্ত, দেহের দৃঢ়তা-সাধক এবং নেত্রের হিতকর।

হিঙ্গুল ঃ হিঙ্গুল দুই প্রকার—শুকতুণ্ড ও হংস পাক। ইহাদের মধ্যে শুকতুণ্ড অল্প গুণশালী, ইহা চর্ম্মার নামে অভিহিত হয়। আর যাহা প্রবালবর্ণ কিন্তু শ্বেত বেখা বিশিষ্ট, তাহারই নাম হংসপাক। হিঙ্গুল সর্ব্বদোষ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, অতিশয় রসায়ন, সকল রোগ নিবারক, বৃষ্য এবং জাগরণ ক্রিয়ার অতি প্রশস্ত। হিঙ্গুল হইতে যে পারদ নিঃসৃত করিয়া লওয়া হয়, তাহা জীর্ণগন্ধক পারদের সহিত সমান গুণ বিশিষ্ট।

হিঙ্গুলের শোধন বিধি—

১। আদার রসে অথবা মান্দারের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ হয়।

২। হিঙ্গুল স্বভাবতই সুন্দর রক্তবর্ণ, মেষদুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা সাত

বার ভাবিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা উৎকৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং বিশুদ্ধ হয়।

৩। হিঙ্গুলকে তিনদিন জয়ন্তী পাতার রসে, অথবা কাঁজিতে অথবা গোমূত্রে অথবা লেবুর রসে দোলযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলের সত্ত্ব পাতন—

জলবিশিষ্ট পাতন যন্ত্রে হিঙ্গুল পাতিত করিলে তাহা হইতে পারদ রূপ সত্ত্ব নির্গত হয়।

হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ বিধি—

(১) হিঙ্গুল তণ্ডুলবৎ ক্ষুদ্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে অথবা আমরুল শাকের রসে তিনদিন পুনঃ পুনঃ (সাতবার) ভাবনা দিবে। পরে একটি হাঁড়ীতে উহা স্থাপন করিয়া গোড়ালেবুর রসে ও আমরুল শাকে রসে প্লাবিত করিবে। তদনন্তর একখানি সরার পশ্চাদ্‌ভাগ খড়ি দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহা হাড়ীর মুখে স্থাপন করতঃ সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে এবং ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্র বিধানে ঐ হাঁড়ীর নিম্নে জাল ও শরাবের উপরে জল দিবে। জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতলজল দিবে এইরূপে ত্রিশবার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ায় নিম্ন ভাণ্ডস্থ পারদ দোষমুক্ত হইয়া খটিকালিপ্ত শরার তলদেশে সংলগ্ন হইবে। শীতল হইলে সন্ধিস্থল উদ্‌ঘাটিত করিয়া খটিকা সংযুক্ত পারদ সংগ্রহণ পূর্ব্বক কাপড়ে ছাঁকিয়া জলে বা কাঁজিতে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া লইবে।

(২) পারদ প্রসঙ্গে হিঙ্গুল হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য রসাকর্ষণ বিধি লিখিত হইয়াছে।

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষ—

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন করিলে কুষ্ঠ, ক্লৈব্য, ক্লম, ভ্রম, মোহ ও মস্তিষ্কের বিকৃতিজনিত নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষের শান্তি—

যোগ্য পরিমিত (সিকি তোলা হইতে অর্দ্ধ তোলা) বিশুদ্ধ গন্ধক দুগ্ধ সহ সেবন করিলে অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষের শান্তি হয়।

ভূনাগ

বর্ষা ও শরৎ কালে বৃষ্টি ক্লিন্ন মৃত্তিকা হইতে ভূনাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার মৃত্তিকা জাত ক্রিমি বিশেষ। ভূনাগ চারি প্রকার। স্বর্ণখনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ, রৌপ্য খনি নিকটস্থ মৃত্তিকা জাত ভূনাগ, লৌহখনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ এবং তাম্র-খনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভূনাগ দুর্লভ ও চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ তাম্রখনি নিকটস্থ ভূনাগ সুলভ।

সামান্য ভূমিজাত ভূনাগ অল্পগুণ বিশিষ্ট। অম্লসংযুক্ত ক্ষার জলে একদিন সিদ্ধ করিলে ভূনাগ শোধিত হয়।

ভূনাগের সত্ত্ব পাতন—

(১) শরৎ কালজাত ভূনাগকে মাৎগুড়, মধু, ঘৃত, সোহাগা, কদলী কন্দ ও শূরণ (ওল) সহ একত্র মর্দ্দন করিয়া একটি তাল পাকাইবে। পরে উক্ততাল শুষ্ক করিয়া যে পর্য্যন্ত না সত্ব নির্গত হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে আধ্মাপিত করিবে। এই সত্ত্ব কিট্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া লইবে।

(২) দুগ্ধসহ সিদ্ধ করিয়া, ভূনাগ-মৃত্তিকা দ্বারা কিম্বা সোহাগা দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তৎপরে আধ্মাপিত করিলে উহা হইতে সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। ভূনাগসত্ত্ব শীতগুণবিশিষ্ট। ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট করে। ইহা জলসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ স্থাবর ও জঙ্গমবিষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা পারদকে অগ্নিসহনক্ষম করে। ইহা ময়ূরপুচ্ছ সত্ত্ব সদৃশ গুণবিশিষ্ট।

মৃদ্দারশৃঙ্গক:—গুর্জ্জর দেশে অর্ব্বুদ গিরির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৃদ্দারশৃঙ্গক উৎপন্ন হয়। ইহা সীসকসত্ত্বের ন্যায় গুল্ম, শ্লেষ্মানাশক, শুক্র-রোগনাশক, পারদের বন্ধনক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট এবং উত্তম কেশরঞ্জন।

মাতুলুঙ্গের রস ও আদার রস দ্বারা তিনি রাত্রি ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিলে, মৃদ্দার শৃঙ্গক এবং অন্যান্য সাধারণ রস দোষশূন্য হয়। যত প্রকার সত্ত্ব আছে, তৎসমুদায়ই শুদ্ধিবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আধ্মাত করিলে শোধিত হয় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া থাকে।

রাজাবর্ত্ত:—রাজাবর্ত্ত অল্প রক্ত এবং বহুল পরিমাণে নীলিমা মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। যে রাজাবর্ত্ত গুরু ও মসৃণ তাহাই শ্রেষ্ঠ; ইহার বিপরীত, গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা মধ্যম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজাবর্ত্ত প্রমেহ, ক্ষয়, অর্শ, পাণ্ডু, শ্লেষ্মরোগ ও বায়ুরোগ নিবারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বৃষ্য ও রসায়ন।

লেবুর রস, গোমূত্র ও ক্ষার পদার্থের সহিত দুই তিনবার সিদ্ধ করিলে রাজাবর্ত্তাদি ধাতুসমূহ বিশুদ্ধ হয়। শিরীষ ফুল ও আদার রস দ্বারাও রাজাবর্ত্ত শোধিত হইয়া থাকে।

রাজাবর্ত্ত চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গের রস ও গোমূত্রের সহিত মাড়িয়া সাতবার পুটপাক করিলে মৃত হয়। রাজাবর্ত্ত চূর্ণের সহিত মনঃশিলা চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, মহিষ দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে; তৎপরে সোহাগা ও পঞ্চগব্যের সহিত পিণ্ডিত করিয়া ইহা জারিত

করিবে। তৎপরে খদির কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা ধ্মাপিত করিলে রাজাবর্ত্তের অতি সুন্দর সত্ত্ব নিঃসৃত হয়।

এই নিয়মে গৈরিকও শোধিত হয়, এবং তাহার পাত ও রক্তবর্ণের সুন্দর সত্ত্ব নির্গত হয়।

অঞ্জন

অঞ্জন পাঁচ প্রকার। সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন, ও নীলাঞ্জন। সৌবীরাঞ্জন ধূম্রবর্ণ, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, বিষ, হিক্কা ও নেত্ররোগ নিবারক ও ব্রণের শোধন ও রোপণকারক। রসাঞ্জন পীতাভ ও পুষরোগ নাশক, শ্বাস, হিক্কা নিবারক,বর্ণবর্দ্ধক ও বায়ু. পিত্ত ও রক্তের বিনাশকারক। স্রোতোঞ্জন শীতল, স্নিগ্ধ. কষায়রস, স্বাদু লেখনকারক চক্ষুর হিতকর এবং হিক্কা, বিষ, বমন, কফ, পিত্ত ও রক্তবিকৃতির নিবারণকারক। পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশক, অতি দুর্জ্জয় হিক্কারও নিবারণকারক এবং বিষ ও জ্বরনাশক। নীলাঞ্জন গুল্ম, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন, স্বর্ণমারক ও লৌহের মৃদুতাকারক।

ভৃঙ্গরাজের স্বরস ভাবনা দিলে অঞ্জন সকল শোধিত হয়, মনঃশিলার সত্ত্বপাতন নিয়মানুসারে সকল প্রকার অঞ্জনের সত্ত্ব আকর্ষণ করিতে হয়।

স্রোতোঞ্জনের আকৃতি বল্মীক শিখরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে তাহাতে নীলোৎপলের আভা লক্ষিত হয় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটির ন্যায় বর্ণ দেখা যায় এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া স্রোতোঞ্জন গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে গোময় রস, গোমূত্র ঘৃত, মধু ও বসার সাতবার ভাবনা দিবে। এই স্রোতোঞ্জন দ্বারা পারদ শীঘ্র বদ্ধ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তের ভাবনা দিলেও রসাঞ্জন শোধিত হয়। রাজাবর্ত্ত হইতে সত্ত্বপাতনের নিয়মানুসারেও স্রোতোঞ্জনের সত্ত্বপাতন করিতে পারা যায়।

হরিতাল

সোমল ও গন্ধক সংযোগে হরিতাল প্রস্তুত হয়। হরিতাল চারি প্রকার, বংশপত্র হরিতাল, পিণ্ড হরিতাল, গোদন্ত হরিতাল, ও বকদাল হরিতাল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত গোদন্ত হরিতাল ও বকদাল হরিতাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বংশপত্র হরিতাল:—ইহা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, চাকচিক্যশীল, এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম স্তরবিশিষ্ট। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও জরানাশক এবং রসায়ন।

পিণ্ড হরিতাল:—ইহা নিষ্পত্র, পিণ্ডাকার, অল্প সত্ত্ববিশিষ্ট এবং গুরু। ইহা বিশেষরূপে স্ত্রীদিগেব রজঃনাশক এবং অন্যবিধ হরিতাল অপেক্ষা হীনগুণ সম্পন্ন।

গোদন্ত হরিতাল:—ইহা দীর্ঘ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অতি স্নিগ্ধ এবং গোদন্তের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। ইহা গুরু এবং ইহার মধ্যে হরিৎ ও নীলবর্ণের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়।

বকদাল হরিতাল:—বকদাল হরিতাল অতি মৃদু এবং অত্যন্ত হিমগুণসম্পন্নতা হেতু হিমহরিতাল নামে খ্যাত। ইহা পত্রযুক্ত, গুরু, শ্বেতকুষ্ঠ এবং অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের নিবারক।

শোধিত হরিতালের গুণ:—বিশুদ্ধ হরিতাল, শ্লেষ্মা, রক্ত-দুষ্টি, বাতরক্ত, বিষ, বায়ু প্রকোপ, ও ভূতদোষ নাশ করিয়া থাকে।

ইহা স্ত্রীপুষ্প নাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, দীপক, কুষ্ঠনাশক ও আয়ুবর্দ্ধক।

মারণযোগ্য হরিতাল:—ভস্ম করিবার নিমিত্ত বংশপত্র হরিতালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পিণ্ড হরিতাল ভস্মার্থে প্রযোজ্য নহে। কর্কটরোগ ও গলৎ-কুষ্ঠ অপহরণ করিবার নিমিত্ত গোদন্ত হরিতাল শ্রেষ্ঠ। শ্বিত্র নাশ করিবার জন্য বকদাল হরিতাল ভস্ম প্রযোজ্য।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবন জনিত দোষ:—অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক কফ, বায়ু ও প্রমেহ কারক এবং শোথ, বিস্ফোটক ও অঙ্গসঙ্কোচ কারক। যে হরিতাল যথার্থরূপে শোধিত ও ভস্মীভূত হয় নাই, তাহা সেবনে দেহ সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং হরিতালকে প্রথমে যথাশাস্ত্র শোধন করিয়া ভস্ম করিবে। ভস্মীভূত হরিতাল সর্বরোগ নাশক।

হরিতালের শোধন বিধি

১। কুষ্মাণ্ড জলে অথবা তিলক্ষার জলে অথবা চুণের জলে দোলা যন্ত্রে একদিন পাক করিলে হরিতাল শোধিত হইয়া থাকে।

২। চুনের জলে সাতদিন ভাবনা দিলে বংশপত্র হরিতাল শুদ্ধ হয়।

৩। হরিতালকে কাঁজি মিশ্রিত চুনের জলে, কুষ্মাণ্ড জলে, তিল তৈলে এবং ত্রিফলার ক্বাথে দোলা যন্ত্রে তিন ঘণ্টা পাক করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

হরিতাল ভস্মের সহজ বিধি

১। বিশুদ্ধ হরিতাল গ্রহণ করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডীভূত করিবে। তাহার পর ঐ পিণ্ডকে একটী

অন্ধ মুষায় বন্ধ করিবে। তাহার পর উহাকে বারপ্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। ছয়বার এইরূপে ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া, ছয়বার পুটপাক করিলে হরিতাল ভস্মীভূত হয়।

২। শোধিত হরিতালকে ৭ দিন অশ্ববিষ্ঠার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর উহাকে অশ্ববিষ্ঠার অগ্নিতে ৫ বার গজ পুটে পাক করিলে উহা ভস্মীভূত হয়।

৩। একটি ফাঁপা মানুষের হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে শোধিত হরিতাল চূর্ণ পূর্ণ করিবে। তাহার পর ঐ ফাঁপা নলের দুই দিক অশ্বত্থ, পলাশ অথবা পুনর্ণবার ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিবে। তাহার পর উহাকে গজপুটে একদিন তীব্রঅগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপে যে হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বরোগ নাশক। **হরিতাল ভস্মের পরীক্ষা**ঃ—হরিতাল ভস্ম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয় তবেই তাহাকে বিশুদ্ধ হরিতাল ভস্ম বলিয়া জানিবে।

হরিতাল ভস্মের গুণ ও প্রয়োগঃ—দ্বাদশ রতি পরিমিত ইক্ষুগুড় অনুপানে অর্দ্ধরতি পরিমিত হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে আশী প্রকার বায়ুরোগ, চল্লিশ প্রকার পিত্তরোগ, কুড়ি প্রকার শ্লেষ্মারোগ, যাবতীয় কুষ্ঠ, মেহ ও গুহ্যপ্রদেশস্থ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা শ্বাসে, কাসরোগে, ক্ষয়ে, কুষ্ঠে, পিত্তজ্বরোগে সান্নিপাতিক রোগে, দদ্রু, পামা, ব্রণ ও বাতরোগে প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

হরিতাল ভস্মের অনুপানবিধিঃ—সর্ব্বপ্রকার রক্ত বিকারে আমআদার রস অনুপানে হরিতাল ভস্ম সেব্য। অপস্মার রোগে বিষ ও জীরাসহ ইহা ব্যবহার্য্য। সমুদ্রফল যোগে হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জলোদর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা ঘোষালতার

রস অনুপানে ভগন্দর, মঞ্জিষ্ঠাক্বাথ সহযোগে ফিরঙ্গরোগ, ত্রিফলা ও শর্করাযোগে পাণ্ডুরোগ ও শুঁঠচূর্ণ সহ আমবাত নষ্ট করিয়া থাকে।

স্বর্ণভস্ম অনুপানযোগে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, কাঁটানটের রস সহ সেবনে অষ্টবিধ জ্বর বিনাশ হইয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, বাকুচি, চক্রমর্দ্দ, নিম্ব, হরিতকী, আমলকী, বাসা, শতাবরী, বলা, নাগবলা, যষ্টিমধু, কোকিলাক্ষ বীজ, পটোল পত্র, বেণার মূল, গুলঞ্চ এবং রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ অনুপানে হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে আঠার প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ইহা ছাড়া অনুপান ভেদে সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক।

হরিতালসেবীর পথ্য :—হরিতালসেবী অম্ল, লবণ, কটুরস অগ্নিতাপ এবং রৌদ্রসেবা পরিত্যাগ করিবেন। যিনি একান্ত লবণ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি অতি অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবেন। মিষ্ট দ্রব্য ভোজন হরিতালসেবীর পক্ষে উপকারী। প্রচুর পরিমানে ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করা কর্ত্তব্য। বিশ্রাম গ্রহণ উপকারী।

হরিতালের সত্বপাতনবিধি

১। কুলুত্থকলায়ের ক্বাথ, সোহাগা, মহিষীঘৃত এবং মধু ইহাদিগের দ্বারা হরিতাল মর্দ্দন করতঃ একটি স্থালীর মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে উক্ত স্থালীটি একটি ছিদ্র বিশিষ্ট শরারদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে স্থালীটিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত অগ্নিতে সম্যকরূপে পাক করিবে। এক প্রহরকাল আচ্ছাদিত শরাবের ছিদ্রগুলিকে গোময় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। অতঃপর তিনঘণ্টা কাল পাক করার পর আচ্ছাদিত গোময় উদ্ঘাটিত করিয়া ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিবে। যখন ঐ ছিদ্র সমূহ হইতে পাণ্ডুবর্ণ ধূম নির্গত হইতে থাকিবে তখন অগ্নির জ্বাল বন্ধ করিয়া দিবে।

পরে উক্ত স্থালীটি সম্পূর্ণ শীতল হইয়া গেলে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং অতি সাবধানে স্থালীস্থিত সত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

২। একপল হরিতাল অর্কদুগ্ধসহ একদিন মর্দ্দন করিবে এবং ইহার সহিত উহার ষোলগুণ তৈল মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ইহাকে অনাবৃত পাত্রে স্থাপন করতঃ একুশ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিবে। পরে পাত্রটী যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন উহার তলদেশ সংলগ্ন বিশুদ্ধ সত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

৩। তির্য্যক্‌যন্ত্রে হরিতালকে পাতিত করিলে উহা হইতে শ্বেত বর্ণ হরিতাল সত্ত্ব পাতিত হয়। ইহা সেবন করিলে আশ্চর্য্যরূপে জ্বর ও অজীর্ণ নিবারিত এবং কান্তি, পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়। মাত্রা ১ সর্ষপ।

৪। এরণ্ড ও জয়পাল বীজের সহিত মর্দ্দন করিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিলে হবিতালের সত্ত্ব বহির্গত হয়।

হরিতাল সত্ত্বের প্রয়োগবিধি :—এক তণ্ডুল পরিমিত হরিতাল সত্ত্ব সেবনে দুঃসাধ্য বাতরক্ত দুই সপ্তাহ মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরিতাল সত্ত্ব ব্যবহার কালে রোগী লবণ ত্যাগ করিয়া ঘৃত সংযুক্ত অন্ন ও রুটি লুচি ব্যবহার করিবেন।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবনজন্য দোষের শান্তি :—

১। অর্দ্ধতোলা জীরা চূর্ণ ও অর্দ্ধ তোলা চিনি শীতল জল সহ তিন দিন সেবন করিলে অশুদ্ধ হবিতাল সেবন জন্য দোষ নিবারিত হয়।

২। রাজহংস অথবা কুষ্মাণ্ডের বস ৭ দিন ৵০ ছটাক পরিমাণ পান করিলে উক্ত দোষ নিবারিত হয়।

মনঃশিলা

মনঃশিলা হরিতালের প্রকার ভেদ মাত্র। হরিতাল পীতবর্ণ মনঃশিলা রক্তবর্ণ। মনঃশিলা তিন প্রকার, শ্যামাঙ্গী, কণবীরকা ও খণ্ডা

রক্তগৌরযুক্ত শ্যামবর্ণ এবং ভারবহুল মনঃশিলার না শ্যামা মনঃশিলা। যাহা গৌরশূন্য, তাম্রবৎ, রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল, তাহাই কণবীরকার।' যে মনঃশিলাকে চূর্ণ করিলে অতিশয় রক্তবর্ণ ও অধিক ভার বিশিষ্ট হয় তাহাকে খণ্ড মনঃশিলা কহে। ইহারা উত্তরোত্তর অর্থাৎ শ্যামা অপেক্ষা কণবীরা এবং কণবীঁরা অপেক্ষা খণ্ড মনঃশিলা গুণবিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অধিক সত্বযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনঃশিলা একটী শ্রেষ্ঠ রসায়ণ। ইহা কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফবাত নাশক, অধিক সত্বযুক্ত এবং ভূতদোষ, বিষ, অগ্নিমান্দ্য, কুণ্ডু, কাস, ও ক্ষয়রোগের নিবারক।

অশোধিত মনঃশিলা সেবনের দোষ :—অশোধিত মনঃশিলা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য ও মলরোধ উৎপাদন করে। শুদ্ধ মনঃশিলা সর্ব্বরোগ নাশক।

মনঃশিলার শোধন বিধি :—বকফুলের পাতার রস অথবা আদার রস দ্বারা দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হয়। জয়ন্তী-পত্র, ভৃঙ্গরাজ ও রক্তবকফুলের পত্রের রস সহ এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে পুনর্ব্বার ও ছাগমূত্রের সহিত এক প্রহর দোলা-যন্ত্রে পাক করিবে এবং কাঁজি দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপেও মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে। অথবা কেবল মাত্র চুণের জলে সাত দিন ভাবন দিলেও মনঃশিলা শোধিত হয়। শুদ্ধ মনঃশিলা সকল রোগে প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলার সত্ব আকর্ষণ বিধি :—গুড়, গুগ্ গুলু ঘৃতের সহিত তাহাদের অষ্টমাংশ পরিমিত মনঃশিলা মর্দ্দন পূর্ব্বক কোষ্টিকাযন্ত্রে রুদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে আধ্মাত করিলে অর্থাৎ হাপরে পোড়াইলে, মনঃশিলার সত্ব নির্গত হয়। অথবা সীসকতুল্য সোহাগা ও মদনফলের সহিত হরিতাল মিশ্রিত করিয়া কদলীপত্রের রস সহ মর্দ্দন

করিবে এবং মুষারুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে। তৎপরে ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া দুই ঘণ্টা আঘ্রাত করিবে। এইরূপে মনঃশিলার সত্ত্ব নির্গত হয়।

ধাতু

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, দস্তা, বঙ্গ ও সীসক এই সাতটি শুদ্ধ ধাতু। পিত্তল, কাংস্য ও বর্ত্তলৌহ এই তিন প্রকার মিশ্রধাতু। ধাতু, লৌহ ও লুহ তিনটি শব্দ একার্থবাচী। ধাতুমাত্রেই বলিপলিত, খালিত্য, কার্শ্য, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও জরা নাশ করিয়া দেহ রক্ষা করে।

স্বর্ণ

প্রকৃত স্বর্ণকে গলাইলে রক্তবর্ণ ধারণ করে, ছেদন করিলে রৌপ্যবর্ণ ধারণ করে এবং কষ্টিপ্রস্তরে ঘষিলে কুঙ্কুম সদৃশ বর্ণ ধারণ করে। মল-বিহীন স্বর্ণ স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু এবং উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলযুক্ত, দলবিশিষ্ট এবং যাহা গলাইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং কষ্টিপ্রস্তরে ঘষিলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে তাহা লঘু, ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিত্যাজ্য।

স্বর্ণের প্রকার ভেদ:—স্বর্ণ প্রধানতঃ দুই প্রকার—রসেন্দ্রবেধজ ও খনিজ। রসেন্দ্রবেধজ স্বর্ণ—ষোড়শবিধ বর্ণবিশিষ্ট। খনিজ স্বর্ণ—চতুর্দ্দশবিধ বর্ণবিশিষ্ট। প্রথমবিধ স্বর্ণ—রসায়ন, জরা-নাশক ও শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়বিধ স্বর্ণকে যথাশাস্ত্র ভস্মীভূত করিলে তাহা সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

শোধিত স্বর্ণের গুণ ঃ—

১। সাধারণতঃ সকল স্বর্ণই আয়ুঃ, লক্ষ্মী, কান্তি, বুদ্ধি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকর, নিখিল রোগনাশক, পবিত্র, ভূতাবেশের শান্তিকর, রতি শক্তি

বর্দ্ধক, সুখজনক, পুষ্টিকর, জরানিবারক, মেহনাশক, ক্ষীণগণের পুষ্টি বর্দ্ধক, মেধাজনক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। রৌপ্যও প্রায় এই সকল গুণ-বিশিষ্ট।

২। রসেন্দ্র বেধজ অর্থাৎ পারদের সংমিশ্রন দ্বারা যে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রসেন্দ্র বেধজ স্বর্ণ কহে। ইহা রসায়ন, উপকারিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্র।

স্বর্ণ স্নিগ্ধ, পবিত্র, বিষদোষনাশক, পুষ্টিকর, অত্যন্ত বৃষ্য, যক্ষ্মা ও উন্মাদ প্রভৃতি শারীর রোগ নাশক, মেধাবুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধক, সুখজনক, সর্ব্বদোষ, ও সকল রোগনিবারক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, বেদনা নিবারক এবং মধুর বিপাক।

অশোধিত ও অমাড়িত স্বর্ণের দোষ—অশুদ্ধ ও অজারিত স্বর্ণ সেবনে বীর্য্য, বল ও সুখ বিনষ্ট হয় এবং বহুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্বর্ণ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণের শোধন বিধি—সম পরিমিত স্বর্ণপত্র ও লবণ একত্র শরাব মধ্যে রুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ প্রহর কাল অঙ্গারাগ্নিতে আধ্মাপিত করিলে, তাহা পূর্ণবর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

২। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, তাম্র এবং লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার তৈলে, তক্রে, গোমূত্রে, কাঁজিতে এবং কুলথ কলায়ের কাথে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

৩। সর্ব্বপ্রকার ধাতুকে সাতবার উত্তপ্ত করিয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

ধাতু মারণে পারদের আবশ্যকতা—সমুদয় ধাতুরই পারদভস্ম মিশ্রণে যে মারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মৃগ বিশেষের স্বরসাদি দ্বারা মারণ ক্রিয়া সম্পাদিত করিলে তাহা মধ্যম বলিয়া অভিহিত হয়। আর গন্ধকাদি দ্বারা যে মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদন করা হয় তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। অরি-লৌহ অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণান্বিত ধাতুদ্বারা যে কোন ধাতুর মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইলে তাহা অপকারী হইয়া থাকে।

যে ধাতুভস্ম পারদ ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা সেবন করিলে উদরে কীট জন্মিয়া থাকে—ইহা সিদ্ধ লক্ষ্মীশ্বর প্রমুখ রসাচার্য্যের বাণী।

স্বর্ণভস্ম বিধি—১। অতি পাত্‌লা স্বর্ণ পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পারদ ভস্ম ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রসে লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে যথানিয়মে পুট দিবে। এইরূপ দশবার পুট দিলেই স্বর্ণ মারিত হয়।

২। স্বর্ণ দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে স্বর্ণের সমপরিমিত পারদভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ করিয়া, মাতুলুঙ্গের রস ও হিঙ্গুলের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুট পাক করিবে। এইরূপে দ্বাদশবার পুট দিলে কুঙ্কুমবর্ণ স্বর্ণভস্ম প্রস্তুত হয়।

৩। স্বর্ণের চতুর্থাংশ পারদভস্ম কোন অম্লদ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া, তাহা স্বর্ণপত্রে লেপন করিবে এবং শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। এইরূপ আটবার পুটপাক করিলেই স্বর্ণভস্ম হয়।

বিনা অগ্নিযোগে স্বর্ণভস্ম বিধি—

এক ভাগ পারদ দুই ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া তিন ভাগ শোধিত স্বর্ণপত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৬ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক একটি তাল পাকাইবে। তাহার পর উক্ত তালটিকে

এরণ্ডপত্রে উত্তমরূপে বন্ধন করিবে। তাহার পর উহাকে একটি তামার পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া এক ঘণ্টাকাল রৌদ্রে রাখিবে। রৌদ্রে থাকিয়া উক্ত পিণ্ডটি উত্তপ্ত হইলে উহাকে শরাব সম্পুটে বদ্ধ করিয়া তিনদিন ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। চতুর্থ দিবসে উহাকে বাহির করিয়া চূর্ণ করতঃ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণই স্বর্ণের নিরুত্থ ভস্ম। ইহা এত পাত্‌লা যে জলে ভাসিয়া থাকে। এই ভস্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

স্বর্ণের দ্রুতি—১। ভেকের অস্থি ও বসা এবং সোহাগা করবীর ও ইন্দ্রগোপ কীট এই সমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণ দ্রবীভূত অবস্থার থাকে।

২। ইন্দ্রগোপকীট চূর্ণ ও দেবদালী (ঘোষাবিশেষ) ফলের স্বরস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ভাবনা দিলে স্বর্ণ জলবৎ দ্রবীভূত হয়।

স্বর্ণভস্মের অনুপান—দুইরতি পরিমিত স্বর্ণভস্ম মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস কাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণীদোষ, সর্ব্ববিধ বিষদোষ ও দূষীবিষ নিবারিত হয়। ইহা ওজোধাতু বর্দ্ধক, বলকর এবং পথ্য।

শোথে :—মৎস্যপিত্তের সহিত সেব্য।

বলবৃদ্ধি করণে :—ভৃঙ্গরাজের রস ও দুগ্ধসহ সেব্য।

চক্ষুরোগে :—পুনর্ণবার রস।

রসায়ণে :—ঘৃতসহ।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করণে :—বচচূর্ণ সহ।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে :—কুঙ্কুমসহ সেব্য।

যক্ষ্মারোগে :—দুগ্ধসহ।

বিষদোষে :—বিশল্য করণীর রস সহ সেব্য।

উন্মাদে :—শুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ সহ।

রৌপ্য

রৌপ্যের প্রকার ভেদ—

রৌপ্য তিন প্রকার ; সহজ, খনিজ ও কৃত্রিম। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অর্থাৎ কৃত্রিম অপেক্ষা খনিজ এবং খনিজ অপেক্ষা সহজ রৌপ্য অধিক গুণ বিশিষ্ট।

কৈলাসাদি পর্ব্বত হইতে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সহজ রজত কহে। এই রৌপ্য একবার স্পর্শ করিলেই মনুষ্যগণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া থাকে।

হিমালয়াদি পর্ব্বত শিখরে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয় ধাতুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে খনিজ রৌপ্য বলেন। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

যে রৌপ্য পারদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম কৃত্রিম রৌপ্য ইহা যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকে।

যে রৌপ্য ঘন, স্বচ্ছ, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, শঙ্খবৎ শুভ্রবর্ণ, মসৃণ, স্ফোটকহীন অর্থাৎ বুদবুদাকৃতি এবং দগ্ধ বা ছেদন করিলেও যাহার শুভ্রবর্ণ বিকৃত না হয়, সেই রৌপ্যই শুভফলপ্রদ।

যে রৌপ্য দগ্ধ করিলে রক্তপীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং যাহা রুক্ষ, স্ফুটন, লঘু, স্থূলাঙ্গ ও কর্কশাঙ্গ, এই অষ্টবিধ রৌপ্য পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ইহা ব্যবহারে অপকার হইয়া থাকে।

রৌপ্য অম্লকষায় রস, বিপাকে মধুর, শীতল, সারক, অত্যন্ত লেখন কারক, রুচিজনক, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মা নাশক, জঠরাগ্নির দীপ্তি কারক, অত্যন্ত বলকর, বয়ঃস্থাপক ও মেধাজনক।

পাঠান্তরোক্ত রৌপ্যগুণ, রৌপ্য, শীতল, অম্লকষায় রস, স্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, গুরুপাক এবং রসায়ন বিধানে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগ নাশক হয়।

স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পাত, এক একবার উত্তপ্ত করিয়া তিল-তৈল, তক্র (ঘোল), গোমূত্র, কাঁজি ও কুলত্থের ক্বাথ এই সকল দ্রব পদার্থে যথাক্রমে সাতবার নিষিক্ত করিলে শোধিত হয়।

অশোধিত রৌপ্য, আয়ুঃ, শুক্র ও বলনাশ করে এবং সন্তাপ ও মলরোধ রোগ উৎপাদন করে ; অতএব তাহাকে যথাশাস্ত্র শোধিত ও ভস্মীভূত করিবে।

১। সীসক ও সোহাগার প্রক্ষেপ দিয়া রৌপ্য গলাইলে সেই রৌপ্য শোধিত হয়।

রৌপ্যে, অন্যবিধ শোধন বিধি স্বর্ণশোধনের ন্যায়।

রৌপ্যভস্মবিধি—স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় রৌপ্য ভস্ম করিবে।

স্বর্ণভস্মের চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

রৌপ্যের দ্রুতি—দেবদালী (ঘোষা) ফলে সাতবার নরমূত্রের ভাবনা দিয়া সেই দেবদালী ফলের প্রক্ষেপ দিলে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই দ্রবীভূত হয়।

রৌপ্যভস্মের প্রয়োগ—সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু ও ত্রিফলা চূর্ণ এবং ঘৃত মধুর সহিত ইহা উপযুক্ত মাত্রায় লেহণ করিলে যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদর রোগ, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, নেত্ররোগ ও সর্ববিধ পিত্ত-বিকার প্রশমিত হয়।

রৌপ্য ভস্মের প্রয়োগ

শোথে—চিনির সহিত সেব্য।

বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধিতে—ত্রিফলা চূর্ণ সহ সেব্য।

প্রমেহে—ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ সহ সেব্য।

গুল্মে—যবক্ষার চূর্ণ সহ সেব্য।

কাসে—শ্লেষ্মাধিক্যে—বাসকের রস ত্রিকটু চূর্ণ সহ সেব্য।
শ্বাসে—ভার্গী ও শুঁঠ চূর্ণ সহ সেব্য।
ক্ষয়ে—শিলাজতু ভস্ম সহ সেব্য।
কার্শ্যে—মাংস রস অথবা দুগ্ধ সহ সেব্য।
প্লীহা ও যকৃতে—ত্রিফলা ও পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য।
জলোদরে—পুনর্ণবার রস সহ সেব্য।
রক্তাল্পতায়—লৌহ ভস্ম সহ সেব্য।
রসায়নে ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে এবং অগ্নিবৃদ্ধি করণে } ঘৃতসহ সেব্য

তাম্র

তাম্র দুই প্রকার, ম্লেচ্ছ ও নেপাল; তন্মধ্যে নেপাল তাম্রই উৎকৃষ্ট। নেপাল দেশ ব্যতীত অপর দেশের খনি হইতে যে সকল তাম্র উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ম্লেচ্ছ তাম্র কহে। যে তাম্র শ্বেত বা কৃষ্ণের আভাযুক্ত অরুণবর্ণ কঠিন ও অত্যন্ত বমনকারক, যে তাম্র পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে তাহাই ম্লেচ্ছ তাম্র। আর যে তাম্র স্নিগ্ধ, মৃদু, রক্তবর্ণ, গুরু আঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায় না, গুরু (ভারী) ও অবিকৃত তাহাকেই নেপাল তাম্র কহে। নেপালতাম্র উৎকৃষ্ট গুণশালী।

পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণযুক্ত অরুণবর্ণ, লঘু, স্ফুটনযুক্ত (ফাটাফাটা) রুক্ষাঙ্গ ও স্তর বিশিষ্ট তাম্র রসক্রিয়ায় প্রশস্ত নহে।

তাম্র ঈষৎ অম্লযুক্ত কষায় তিক্তরস, বিপাকে মধুর, উষ্ণবীর্য, পিত্ত-শ্লেষ্ম নাশক, উর্দ্ধ ও অধোদেহের শোধন কারক, স্থূলতা নাশক, ক্ষুধা-বর্দ্ধক, নেত্ররোগে হিতকর, লেখন এবং বিষদোষ, যকৃতের দোষ, জঠর রোগ, কুষ্ঠ, আমদোষ, ক্রিমি, অর্শ, ক্ষয় ও পাণ্ডু রোগের উপশম কারক।

অশোধিত ও অমারিত তাম্র আয়ুঃক্ষয়কারক, কান্তি, বীর্য্য ও বল নাশক এবং বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, উৎক্লেদ (বমনবেগ) কুষ্ঠ ও শূল রোগের উৎপাদক।

তাম্র সেবনে উৎক্লেদ, মলভেদ, ভ্রম, দাহ ও মোহ এই কয়েকটি দোষ অতি প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাম্র শোধিত হইলে ঐ সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রস বীর্য্য ও পাকে সুধার ন্যায় হিতকর হয়।

তাম্রের শোধন বিধি

ক্ষার ও অম্ল পদার্থ এবং গৈরিকের সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া বন-ঘুঁটের অগ্নিতে তাহা দ্রবীভূত করিবে এবং মহিষী দুগ্ধের তক্রে নিক্ষেপ করিবে। সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে তাম্রের উৎক্লেদাদি পঞ্চদোষ নষ্ট হইয়া যায়। অথবা নির্ম্মল তাম্রপাত্রে লেবুর রস ও সৈন্ধবলবণ লেপন করিয়া তাহা আধ্মাপিত করিবে ও সৌবীরক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিবে। আটবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে তাম্র শোধিত হয় তাম্রপাত্রে লেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ লেপন করিয়া উত্তপ্ত করিবে এবং নিসিন্দার রসে তাহা নিমগ্ন করিবে। এইরূপ আটবার উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিলেও তাম্র শোধিত হইয়া থাকে।

তাম্রের ভস্ম বিধি

গোমূত্রের সহিত তাম্রপত্র এক প্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করিলেও তাহা বিশোধিত হয়। পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তদ্দারা তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে এবং তাহা শরাবে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে তাম্র ভস্মীভূত হয়।

মারিত তাম্রের অমৃতী করণ

মারিত তাম্র কোন এক প্রকার অম্লরসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলক ওলের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া ওলের উপর মৃত্তিকা-লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে গজপুটে তাহা দগ্ধ করিয়া সেই তাম্র গ্রহণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার পর সেই তাম্র সেবন করিলে কদাচ বমন, ভ্রম ও বিরেচন হয় না।

সূক্ষ্ম তাম্রপত্র প্রথমতঃ পাঁচ প্রহর কাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই তাম্রপত্র একভাগ, পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ভাণ্ডে রুদ্ধ করিবে। অতঃপর সেই ভাণ্ডের নীচে এক প্রহর কাল অগ্নি জ্বাল দিলে তাম্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই তাম্রপত্র সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, হরিতাল অর্দ্ধভাগ এবং মনঃশিলা সিকিভাগ একত্রে উত্তমরূপে মসৃণ কজ্জলী করিবে। তৎপর যন্ত্রোধ্যায়োক্ত গর্ভযন্ত্র মধ্যে সেই কজ্জলী ও পারদের সমপরিমিত তাম্র পর্য্যায় ক্রমে নিহিত করিবে। অর্থাৎ প্রথমে কিঞ্চিৎ কজ্জলী রাখিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ তাম্র এবং তাহার উপর আবার কজ্জলী ও কজ্জলীর উপর আবার তাম্র এইরূপ সজ্জিত করিয়া একপ্রহর কাল তাহা যথানিয়মে পাক করিবে। পাক শেষে যন্ত্র শীতল হইলে তাহা হইতে তাম্র গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে।

এই তাম্রভস্ম দুইরতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল, উদররোগ, শূল, পাণ্ডু, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা যকৃৎ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শোরোগ ও গ্রহণীরোগ নিশ্চিত নিবারিত হয়। **ইহাকে সোমনাথ তাম্র কহে।**

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, তাম্রপত্র দুইভাগ একত্র ঘৃত-

কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহা একটি ভাণ্ডে রাখিবে এবং ভাণ্ডের মুখে একটি শরা আচ্ছাদন দিবে। সেই ভাণ্ডটি একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া লবণ দ্বারা সেই হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। এবং হাঁড়ির মুখেও একখানি শরা আচ্ছাদন দিবে। তৎপরে চারিপ্রহর কাল তাহাকে অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। সেই তাম্র চূর্ণ করিয়া দুইরতি মাত্রায় মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রযুক্ত হইলে ইহা গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, মূর্চ্ছা, ধাতুগত জ্বর, পরিণামশূল এবং ত্রিদোষ জনিত সমুদয় রোগ বিনষ্ট করে। রসক্রিয়া এবং রসায়ন কার্য্যেও উপযুক্ত মাত্রায় এই তাম্র ভস্ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আদার রস ও মধু সংযোগে দুইরতি তাম্রভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নিবারিত হয়। তাম্র সর্ব্বপ্রকার উদর রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বিনা অগ্নিযোগে তাম্রের নিরুত্থ ভস্ম

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া তিনভাগ শোধিত তাম্রের উপর নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ সকল দ্রব্য গুলিকে লেবুর রসে তিনদিন ভিজাইয়া রাখিবে। তিনদিন গত হইলে দেখিবে তাম্র গলিয়া পঙ্কবৎ হইয়াছে। তাহার পর ঐ তাম্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই প্রকার যে তাম্রভস্ম পাওয়া যায় তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বরোগ নাশক। ইহা বিশেষভাবে রসায়ন গুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ নাশক।

লৌহ

"আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা রোগাপহর্ত্তা মদনস্য ধাতা।
অয়ঃ সমানং নহি কিঞ্চিদস্তি রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং নরাণাম্॥"

লৌহ তিন প্রকার—মুণ্ড, তীক্ষ্ণ ও কান্ত।

মুণ্ড লৌহ তিন প্রকার:—মৃদু, কুণ্ঠ ও কড়ার; যাহা শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, স্ফোটকের ন্যায় বুদ বুদ যুক্ত হয় না এবং যাহা চিক্কণ তাহাই **মৃদু মুণ্ডলৌহ**। ইহা শুভ ফলপ্রদ। যে মুণ্ডলৌহে আঘাত করিয়া অনায়াসে প্রসারিত করা যায় না তাহাকে কুণ্ঠ কহে, ইহা মধ্যম, আর যাহা আহত হইলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্ন হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা কড়ার মুণ্ড। উৎকৃষ্ট মৃদু মুণ্ড লৌহ সেবনে কফ, বায়ু, শূল, মূলরোগ, আমদোষ, মেহ, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, আমবাত, উদররোগ ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, রক্তবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধি কারক।

তীক্ষ্ণ লৌহ

তীক্ষ্ণলৌহ ছয় প্রকার:—খর, সার, হৃন্নাল, তারাবট্ট, বাজির ও কাললৌহ। যে তীক্ষ্ণলৌহ পরুষ (খরস্পর্শ) পোগর শূন্য (অর্থাৎ অলকের ন্যায় কুটীল রেখাহীন) যাহা ভাঙ্গিলে পারদের ন্যায় আভা দৃষ্ট হয় এবং নমিত করিতে গেলে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে খরলৌহ কহে। যে লৌহের উপর তীব্রবেগে আঘাত করিলে তাহার প্রান্তভাগ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা সারলৌহ। সারলৌহ কুটিল রেখাযুক্ত এবং পাণ্ডু ভূমিজাত। যে লৌহ পাণ্ডু কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চু বা বীজাকৃতি, পোগর যাহার গাত্রে স্পষ্টরূপে থাকে এবং যাহা ছেদন করিতে অতি কঠিন বোধ হয় তাহাই হৃন্নাল লৌহ। বজ্রাকৃতি এবং সূক্ষ্ম ২ রেখা বিশিষ্ট পোগর দ্বারা যে লৌহের গাত্র অবিরল ব্যাপ্ত এবং যাহা শ্যামবর্ণ তাহাকে বাজির লৌহ কহে। আর যে লৌহ নীলকৃষ্ণবর্ণ, সান্দ্র, মসৃণ, গুরু, উজ্জ্বল এবং লৌহের আঘাত করিলেও ভাঙ্গিয়া যায় না তাহাই কাললৌহ বা কালায়স।

খরলৌহ রুক্ষ বিপাকে ঈষৎ মধুর, নাতিশীতোষ্ণ বীর্য্য, তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, উদর, প্লীহা ও আমদোষ এবং পাণ্ডুরোগের উপশম কারক। শূল, যকৃত, ক্ষয়, জরা মেহ, আমবাত, আর্শ, ও দাহরোগ ইহার দ্বারা সদ্যঃ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, অত্যন্ত রসায়ন ও বলকর।

কান্তলৌহ

কান্তলৌহ পাঁচ প্রকার ঃ—যথা ভ্রামক, চুম্বক, কর্ষক, দ্রাবক, ও রোমকান্ত। এই সকল লৌহের মধ্যে কোন লৌহ একমুখ, কোনও দ্বিমুখ, কেহ ত্রিমুখ, কেহ চতুর্ম্মুখ, কেহ বা পঞ্চমুখ, কেহ বা সর্ব্বতোমুখ। এই পঞ্চবিধ লৌহের পীত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিন প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পীত বর্ণ লৌহ স্পর্শবেধী কার্য্যে, কৃষ্ণবর্ণ রসায়ন কার্য্যে উৎকৃষ্ট এবং রক্তবর্ণ লৌহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ার প্রশস্ত। ভ্রামক লৌহ নিকৃষ্ট, চুম্বক মধ্যম, কর্ষক উত্তম, এবং দ্রাবক অতি উত্তম। যে কান্তলৌহ অপর লৌহসমূহ ঘূর্ণিত করে তাহাই ভ্রামক; যাহা লৌহকে চুম্বন করে অর্থাৎ লৌহের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায় তাহাই চুম্বক, যে লৌহ অপর লৌহকে আকর্ষণ করে তাহা কর্ষক; যাহা অন্যান্য লৌহকে দ্রবীভূত করিতে পারে তাহা দ্রাবক; এবং যে লৌহ গাত্রে স্ফুটিত হইলে রোমোদ্গম হয় তাহা রোমকান্ত লৌহ। একমুখ লৌহ নিকৃষ্ট, দ্বিমুখ ও ত্রিমুখ লৌহ মধ্যম, চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চমুখ উৎকৃষ্ট, এবং সর্ব্বতোমুখ লৌহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভ্রামক ও চুম্বক লৌহ ব্যাধিনাশে প্রশস্ত। কর্ষক এবং দ্রাবক লৌহ রসে এবং রসায়ন কার্য্যে হিতকর। রোমকান্ত লৌহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় অতি উৎকৃষ্ট। খনি হইতে যত্নপূর্ব্বক লৌহ সংগ্রহ করা উচিত। যে লৌহ রৌদ্রে ও বাতাসে পতিত হইয়া থাকে তাহা বর্জ্জনীয়।

কান্ত লৌহের স্বরূপ

যে লৌহের পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলবিন্দু প্রসৃত হয় না, যাহার গাত্রে হিং লেপন করিলে তাহার গন্ধ এবং নিম্বকল্ক লেপন করিলে তাহার তিক্তাস্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাতে দুগ্ধপাক করিলে দুগ্ধ শিখরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে অথচ অথচ পড়িয়া যায় না তাহাকে কান্ত লৌহ কহে। ইহা ভিন্ন অপর লক্ষণযুক্ত লৌহ কান্তলৌহ নহে। কান্তলৌহ রসায়ন কার্য্যে অতি উৎকৃষ্ট। সুস্থ ব্যক্তির দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, স্নিগ্ধ, মেহনাশক, ত্রিদোষের শান্তি-কারক, তিক্তরস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, শূল, আমদোষ, মূলরোগ (অর্শ), গুল্ম, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, যকৃত, ক্ষয়, প্রভৃতি নানারোগ নাশক। যোগবশে ইহা সমুদয় রোগেরই নাশক। সকলপ্রকার ঔষধ কল্পের মধ্যে লৌহ কল্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব সর্ব্বাগ্রে লৌহের মারণ ও শোধনক্রিয়া বিশেষ যত্নের সহিত সম্পন্ন করিবে।

লৌহের শোধন বিধি

১। লৌহ সামুদ্র লবণের দ্বারা লেপন করিবে এবং উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে লৌহের গিরিজ দোষ নষ্ট হয়।

২। তেঁতুল ফল বা পত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে অথবা গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে উত্তপ্ত লৌহ পত্র নিক্ষেপ করিলেও তাহা শোধিত হইয়া থাকে।

৩। স্বর্ণ শোধনের নিয়মানুসারেও লৌহ শোধিত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম বিধি

১। লৌহ ভস্মের বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায়। স্বর্ণ ভস্মের চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

২। তীক্ষ্ণ লৌহের চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পেষণ পূর্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিষ্ঠ তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া চাকী প্রস্তুত করিবে। চাকী গুলি শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচবার পুটপাক করিলে রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হয়।

৩। তীক্ষ্ণ লৌহের স্তরহীন পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা তীব্র অগ্নিতে আধ্মাপিত করিবে এবং জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে প্রস্তরের উদূখলে স্থূল লৌহদণ্ডের আঘাত দ্বারা সেই লৌহপাত চূর্ণ করিবে, তাহার মধ্যে যেগুলি স্থূল খণ্ড থাকিবে তাহা দুইখানি সরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবে ও জলে নিক্ষেপ করিয়া নির্বাপিত করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ স্ফুটিত করিয়া চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণ পারদ ও গন্ধকের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া বিংশতিবার পুটপাক করিবে। প্রত্যেক-বার পুটপাকের পর দৃঢ়রূপে পেষণ করিতে হইবে। এইরূপে ভস্মীভূত লৌহ সর্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

৪। লৌহচূর্ণ ও তাহার সমপরিমাণ গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিলেই লৌহ ভস্মরূপে পরিণত হইবে।

৫। লৌহ উত্তপ্ত করিয়া হিঙ্গুল মিশ্রিত জামীরের রসে নিক্ষেপ করিলে লৌহ ভস্মরূপে পরিণত হয়। একবারে না হইলে কয়েকবার ঐরূপ করিবে।

যে লৌহপাত্রস্থিত জলে তৈল বিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা বিক্ষিপ্ত হয় না, অপিচ তারাকারে আবর্ত্তিত হয়, তাহাই কান্ত লৌহ। সর্ব্বলৌহ শ্রেষ্ঠ সেই কান্ত লৌহের পাত্‌লা পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। এবং ত্রিফলার ক্বাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই শুদ্ধলৌহ কোন অম্লপদার্থের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত চতুর্থাংশ পরিমিত মৃত পারদ মিশ্রিত করিবে ও অগ্নিতে পুটপাক করিবে। অথবা

সমপরিমিত স্বর্ণ, মাক্ষিক, গন্ধক ও পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুট দিবে। অথবা কান্তলৌহে ক্ষার ও অম্ল পদার্থ লেপণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া শশকের রক্তে নির্ব্বাপিত করিবে ; ইহাতেও কান্তলৌহ শোধিত হইয়া সর্ব্বদোষশূন্য হয়। শোধিত পারদ ও তাহার দ্বিগুণ পরিমিত গন্ধক একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং সেই কজ্জলী এবং কজ্জলীর সম-পরিমিত লৌহচূর্ণ একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক কাংস্য-পাত্রে রাখিয়া এবং তাহার উপর এরণ্ডপত্র আচ্ছাদন করিয়া অর্দ্ধ প্রহর-কাল পাক করিবে। পাকের পর তিনদিন তাহা ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে লৌহের যে ভস্ম প্রস্তুত হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া থাকে। কান্ত তীক্ষ্ণ ও মুণ্ড এই ত্রিবিধ লৌহেরই এইরূপে নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। লৌহের ন্যায় স্বর্ণাদি ধাতুর চূর্ণ করিয়াও এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করা যায়। কান্ত লৌহ কমণীয় কান্তিজনক, পাণ্ডুরোগ নাশক, যক্ষ্মারোগ নিবারক, বিষ নাশক, ত্রিদোষের শান্তি কারক, বিবিধ কুষ্ঠ নাশক, বলকর, বৃষ্য, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বব্যাধি নাশক, উৎকৃষ্ট রসায়ন এবং অদ্বিতীয়, পার্থিব অমৃত স্বরূপ। ইহা সেবনে ক্রিমি বিকার, পাণ্ডু, বায়ুরোগ, ক্ষীণতা, পিত্তরোগ স্থূলতা, অর্শ, গ্রহণী, জ্বর, শ্লেষ্মবিকার, শোথ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, বিষদোষ, কুষ্ঠ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা স্বাস্থ্য জনক, রসায়ন ও অকাল মৃত্যু নাশক। মৃতলৌহ রসবৎহিতকর, যোগানুসারে ইহা মহাব্যাধি নিবারক। লৌহভস্ম সেবন অভ্যাস করিলে দেহের দৃঢ়তা লাভ হয় এবং জরাব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদ বিহীন লৌহ ভস্মের দোষ অপনয়ন

যে লৌহকে পারদ ব্যতীত ভস্ম করা হইয়াছে তাহাকে তাহার একের তিন অংশ পারদ ও পারদের দ্বিগুণ গন্ধক দ্বারা ছয়ঘণ্টাকাল ঘৃতকুমারীর

রসে মর্দ্দন করিবে। তাহার ঐ সমস্ত দ্রব্যকে লঘুপুটে পাক করিলে উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

লৌহভস্মের পরীক্ষা

ঘৃত ও মধু মিশ্রিত লৌহ ভস্মকে রৌপ্য সম্পুটে রুদ্ধ করিবে, তাহার পর তাহাকে প্রবল অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিবে, উত্তপ্ত হইলে যদি রৌপ্যের আকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লৌহ যথার্থরূপে ভস্ম হয় নাই। উহাকে পুনরায় লৌহে পরিণত করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে লৌহকে পুনরায় ভস্ম করিতে হইবে। মৃত লৌহকে পঞ্চামৃতের সহিত (মধু, ঘৃত, গুঞ্জা, সোহাগা এবং গুগ্‌গুল) ভাজিয়া লইলে আর উহা কোনরূপেই পূর্ব্ববৎ লৌহে পরিণত হইতে পারে না।

লৌহ ভস্মের অমৃতী করণ :—তুল্য পরিমাণ ঘৃতের সহিত লৌহ ভস্ম লৌহপাত্রে উত্তপ্ত করিবে। ঘৃত মরিয়া গেলে নামাইয়া রাখিবে। এইরূপে লৌহের অমৃতীকরণ সাধিত হয়। ইহা যোগবাহী।

লৌহ পুটে প্রয়োজনীয় দ্রব্য :—ত্রিফলা, শিগ্রু, হস্তিকর্ণপলাশ, ভৃঙ্গরাজের এবং পুনরায় ত্রিফলার ক্বাথে লৌহকে মর্দ্দন করতঃ পুটপাক করিলে ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায় না। ইহা পিপুলের ক্বাথে মর্দ্দন করতঃ ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে। সেইরূপ ভূমি-কুষ্মাণ্ড রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ব্যবহারে ধ্বজভঙ্গ, লেবুর রস সহ মর্দ্দনে ক্ষুধামান্দ্য, শিরিষ ছালের ক্বাথ সহ মর্দ্দনে ব্যবহার করিলে বিবর্ণতা নষ্ট হয়। লৌহ বলারস সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিলে বাত, পক্ষাঘাত ও যাবতীয় বায়ু বিকৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তবিকৃতিতে ক্ষেত্রপর্পটী রস সহ, ত্রিদোষ প্রকোপে দশমূলের ক্বাথ সহ, বিষম জ্বর (ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর) কিরাত তিক্তের রসে, মেহে গুড়চী রস সহ, পাণ্ডুরোগে মহিষীর মূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া ইহা পুটপাক করিবে। বিড়ঙ্গ

ও চালুনি জল সহ পুটপাকে ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়। ভল্লাতক ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ সহযোগে কুষ্ঠরোগ, প্লীহায় রোহীতক ছালের ক্বাথ, মূত্রাঘাতে সিন্ধু বারের রস সহ, শূলে কাঁজি, দদ্রু, পামারোগে দদ্রুমারির রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। মুসলী রসের সহিত পুটপাক করিলে অর্শ, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ সহ পুটপাকে হৃদ্রোগ, উর্চ্চটারসে আমবাত, সোমরাজী ও খদির কাষ্ঠের ক্বাথ সহ কুষ্ঠে, পাষাণভেদীর রস যোগে অশ্মরী, ত্রিবৃৎ রসে উদাবর্ত্ত, টকদাড়িম রস সহ গুল্মে, স্বরভঙ্গে ব্রাহ্মীরস এবং অশ্বগন্ধা ও জটামাংসীর রস সহযোগে লৌহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভস্মার্থে পুট প্রদান করিবে।

লৌহভস্মের অনুপান

শূলে—হিং ও মধুর সহিত লৌহ ভস্ম সেবন করিতে হয়।

পুরাতন জ্বর—যথা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে—পিপ্পলী চূর্ণসহ সেব্য ;

বায়ু বৃদ্ধি জনিত বাত ও অর্দ্ধাঙ্গে—ঘৃত ও রসুনের রস সহ।

শ্বাসেকাসে—মধু ও ত্রিকটুচূর্ণ সহ সেব্য।

শীতে—বৃশ্চিকালী ও মরিচ চূর্ণ সহ।

মেহে—ত্রিফলা ও মিছরীচূর্ণ সংযোগে।

ত্রিদোষ বৃদ্ধি জনিত যাবতীয় ব্যাধিতে—মধু ও আদার রস সহ

বায়ু বৃদ্ধিতে—মাখন সহ।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—কেবল মাত্র মধু সহ সেব্য।

কফ পিত্ত বৃদ্ধি জনিত রোগে—আদার রস সহ সেব্য।

বায়ু বৃদ্ধি জনিত গাত্র কম্পনে—নিশুণ্ডীর রস সহ।

বায়ু বৃদ্ধিতে—শুণ্ঠীচূর্ণ সহ।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—মিছরী চূর্ণ সহ।

কফ বৃদ্ধিতে—পিপুল চূর্ণ সহ।

সন্ধি রোগে—ত্রিজাতক সহযোগে সেব্য।

জরাব্যাধিতে—ত্রিফলা সহ।

শ্লেষ্ম রোগে—কজ্জলী, মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ।

রক্তপিত্তে—চতুর্জাত মিশ্রিত গুড় সহ।

বলবৃদ্ধি করণে—গোদুগ্ধ ও পুনর্ণবা রস সংযোগে।

রক্তাল্পতায়—পুনর্ণবা রস সহ।

বিংশতি প্রকারের প্রমেহরোগে ও গণোরিয়ায়—মধু মিশ্রিত হরিদ্রা রস ও পিপুল চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছে—শিলাজতু সহ।

কফরোগে—বাসক, পিপুল, দ্রাক্ষা, এবং মধু একত্র মাড়িয়া সেব্য।

অগ্নিদীপ্তি করণে, ও দেহ কান্তিজননে—ঘৃত ও মধুর সহিত।

সর্ব্বরোগ নিবারণে—ত্রিফলা ও মধু সহ।

লোহ ভস্মের মাত্রা

লৌহ ভস্মের মাত্রা দুই রতি।

লোহ সেবনে পথ্য

লৌহ সেবীর পক্ষে নিম্নলিখিত পথ্য ব্যবস্থেয়ঃ—

লাব, তিত্তির, গোধা, ময়ুর, শশক, বটক, কলবিঙ্ক, চটক, বর্ত্তক, বর্ত্তি, হরিতাল, বাজপক্ষী, বৃদ্ধলাব, সকল প্রকার মৃগ, টাটকা মদ্গুর মৎস্য, রোহিত, ও শকুল মৎস্য, পাপিতাফল, পটোল, ডিণ্ডিসি, তাল আটির শস্য, শতাবরী, বেত্রাগ্র, তাড়ক, (তাল বৃক্ষের মাথি) তণ্ডুলীয়ক, বাস্তু, ধনেশাক, খর্ণালু, পুনর্ণবা, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম, লবলীফল, শৃঙ্গাটক, পক্ক ও সুমিষ্ট আম্রফল, আঙ্গুর, জাতীফল, লবঙ্গ, সুপারি এবং পান প্রভৃতি।

লৌহ সেবীর অপথ্য

লকুচ, কোল, কর্কন্ধু, বদর, লেবু, বীজপুর, করমর্দ্দক, তিন্তিড়ি, আনূপ মাংস, কর্করপক্ষী, পুণ্ডক, হংস, সারস, দাত্যূহ, কাক, বলাহক, মাষ, কন্দ, করীর, চণক, কদম্ব, কুষ্মাণ্ড, কর্কোটি, কেবুক, কলা, কালশাক, কশেরু, সর্ব্বপ্রকার দাইল, তিলতৈল, রসোন, রাজি, মদ্য, অম্লদ্রব্য, নষ্ট মৎস্য, জীরা, বার্ত্তাকু, মাষকলাই, কারবেল্ল, সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম, সর্ব্বপ্রকার সন্ধানদ্রব্য (যথা আসব অরিষ্ট প্রভৃতি), দীর্ঘকাল অশ্বারোহণ, শ্রম, অত্যধিক বাক্য কথন, স্নান, পান, আহার, শীত ও বায়ুসেবা, অসময়ে ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, বাতপিত্তকর দ্রব্য ভোজন, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়রস ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, শারীরিক পরিশ্রম এবং সকলপ্রকার ধাতু ও রসমারক দ্রব্য সকল অপথ্য।

অনিয়মিত লৌহ সেবনের দোষ নিবারণ উপায়

লৌহভস্ম বা অন্য ধাতু ভস্ম অনিয়মিত ভাবে সেবন করিলে যে দোষ সমুত্থিত হয়, তাহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত 'সিদ্ধিসার' সেবন ব্যবস্থেয়।

সিদ্ধিসার

হরীতকী চূর্ণ, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, সাদাজীরা, সমপরিমাণে লইয়া তাহার প্রত্যেকটির দ্বিগুণ পরিমিত ত্রিবৃত গ্রহণ করতঃ লেবুর রসে ভাবনা দিতে হইবে।

মাত্রা—১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ রতি পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হয়। ইহা সেবনে যথাসময়ে মলপ্রবৃত্তি ও উদরের লঘুতা আনয়ন করে

উদ্গারের বিশুদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের অনবসাদ এবং মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

অবিশুদ্ধ লৌহ সেবনে দোষ

লৌহ মারণে শাস্ত্রোল্লিখিত যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ আছে, তদপেক্ষা কম মাত্রায় ব্যবহার করিলে কিংবা অল্পসংখ্যক পুট দিলে কিম্বা অল্পমাত্রায় গন্ধক ও পারদের সহিত মর্দ্দন করিলে লৌহ দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত লৌহ সেবন করিলে মানুষ অল্পায়ু হয়।

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত বিকারের শান্তি ঃ—

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত দোষে, বাসকের রসে বিড়ঙ্গ মর্দ্দন করিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে বাসকরস মিশ্রিত করিয়া অধিককাল রৌদ্র-ভাবিত করিয়া সেবন করিতে হয়।

লৌহ দ্রাবণ

সাতদিন যাবৎ গন্ধককে দেবদালী রসে ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে উক্ত গন্ধক শুষ্ক করিয়া অগ্নি সংযোগে দ্রাবণ করতঃ লৌহে নিক্ষেপ করিলে তাহা পারদের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দ্রাবিত হয়।

স্বর্ণ দ্রাবণ

ভেকের অস্থি এবং বসা, সোহাগা, করবীমূল, ঘোড়ার লালা ও ইন্দ্রগোপকীট ইহাদের সহিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণের জন্য ইহা দ্রাবিত হইয়া থাকে।

গন্ধক দ্রাবণ

গন্ধক এবং সোরা দগ্ধ করিয়া উভয়ের ধূমকে জলীয় বাষ্পের সহিত কোন সীসক পাত্রে একত্র মিশ্রিত করিলে গন্ধক দ্রাবক উৎপন্ন হয়। ইহা অগ্নির ন্যায় তেজঃশালী ও অতিশয় অগ্নিসন্দীপক।

মণ্ডূর (লৌহকিট্ট)

প্রদীপ্ত অঙ্গারাগ্নিতে লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করিলে চতুর্দ্দিকে যে মল নিক্ষিপ্ত হয় তাহাকে মণ্ডুর কহে। মণ্ডুর লৌহ সদৃশ গুণশালী। অতএব রোগশান্তির জন্য মণ্ডূরও সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লৌহকিট্ট অপেক্ষা মুণ্ড লৌহ দশগুণ উৎকৃষ্ট। মুণ্ড অপেক্ষা তীক্ষ্ণ শতগুণ উৎকৃষ্ট, তীক্ষ্ণ লৌহ অপেক্ষা কান্ত লৌহ সেবনে লৌহ লক্ষগুণ অধিক উপকার পাওয়া যায়। অতএব জরা মৃত্যু নাশক কান্ত লৌহই সর্ব্বদা সেবন করা উচিত। কান্ত লৌহ অভাবে তৎস্থলে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার্য্য।

মণ্ডূরের প্রকার ভেদ

মুণ্ড লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডুর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গুরু এবং কোমল ; তীক্ষ্ণ লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডুর কজ্জল সদৃশ মসৃণ ও গুরু, কান্ত লৌহ হইতে প্রাপ্ত মণ্ডূর ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, কর্কশ এবং অন্যান্য মণ্ডূর অপেক্ষা অধিকতর গুরু। ইহাকে দ্বিখণ্ড করিলে রৌপ্যের ন্যায় স্তর বিশিষ্ট দেখা যায়।

ঔষধে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর

(১) ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর কোটর বিহীন—গুরু, স্নিগ্ধ, দৃঢ়, শতবর্ষের পুরাতন ও বহু প্রাচীন গ্রাম হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত।

(২) শতবর্ষের অধিক পুরাতন মণ্ডূর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; অশীতিবর্ষের অধিক মণ্ডূর মধ্যগুণবিশিষ্ট ৬০ বৎসরের মণ্ডূর অধম। ৬০ বৎসর হইতে কম পুরাতন মণ্ডূর বিষবৎ ; তাহা ঔষধার্থে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

মণ্ডূরের শোধন ও মারণ বিধি

১। মণ্ডুর বহেড়া কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, বহেড়া কাষ্ঠের পাত্রস্থিত গোমূত্রে যথাক্রমে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই মণ্ডূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। অথবা গোমূত্রের সহিত ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে উত্তপ্ত মণ্ডূর বারংবার নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মণ্ডুর জীর্ণ হইয়া না যায়, ততক্ষণ ঐরূপ উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে।

অথবা মণ্ডুর অতি সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়া করিয়া আটগুণ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিবে। যথেষ্টরূপে সিদ্ধ হইলে পুনরায় গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিবে।

মণ্ডূরের ব্যবহার

মণ্ডূর ভস্ম নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যহ এক তোলা পরিমিত (ঐ মিশ্র) সেবিত হইলে পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, উরুস্তম্ভ, কামলা ও অর্শ আরোগ্য হয়ঃ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চব্য চিত্রক, দার্ব্বীগ্রন্থী এবং দেবদারু। এই প্রকারে ব্যবহৃত মণ্ডূরকে হংস মণ্ডূর কহে। এই ঔষধ হজম হইলে তক্র পান করা উচিত।

মণ্ডূরের দ্রাবণ

বিড়ঙ্গকে বকফুলের পাতার রসে মাড়িয়া বহুদিন যাবৎ ঐ রসে ভাবনা দিবে। লৌহ কিট্টকে ঐ রসে অল্পক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে দ্রাবিত হয়।

যশোদ (দস্তা)

যশোদ রসকের সার। ইহা বৈদ্যগণের যশ প্রদাতা। জ্ঞানী

বৈদ্যগণ ইহার ব্যবহারে সফল মনোরথ হইয়া প্রকৃতই যথেষ্ট যশ অর্জ্জনে সমর্থ হন।

ইহার গুণ

যশোদ কষায়, তিক্ত, শীতল, চক্ষুর হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু, ও শ্বাস রোগ নাশক।

যশোদ শোধন বিধি

(১) ইহাকে অগ্নিতে গলাইয়া চুণের জলে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

(২) অথবা গলাইয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়।

যশোদ ভস্ম বিধি

যশোদ মারণের বিশিষ্ট বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় ৪র্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

যশোদ ভস্ম সেবন বিধি

অতিসারে—কাঁটানটের মূল ও খেজুর একত্রজলে ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জলের সহিত সেব্য।

শীতজ্বরে—যোয়ান ও লবঙ্গ চূর্ণের সহিত।

বমিতে—চিনি ও জীরা চূর্ণের সহিত।

চক্ষুরোগে—পুরাতন ঘৃতের সহিত অঞ্জন গ্রহণ কর্ত্তব্য।

প্রমেহ রোগে—পানের রসের সহিত।

অগ্নিমান্দে—অগ্নিমন্থের (পাথরকুচি) রসের সহিত।

ত্রিদোষে—ত্রিসুগন্ধির সহিত।

যশোদের মাত্রা

হরিতাল সংযোগে জারিত যশোদ এক রতি মাত্রায় প্রত্যহ সেব্য। হরিতাল ভিন্ন জারিত যশোদ ২ রতি মাত্রায় সেব্য।

অশুদ্ধ যশোদ সেবনের দোষ

অশোধিত যশোদ এবং যাহা বিধি পূর্ব্বক ভস্মীভূত নহে এরূপ যশোদ সেবনে প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, বমি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অশুদ্ধ যশোদ সেবন জনিত দোষের শান্তি

তিনদিন বালা ও হরীতকী চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশুদ্ধ যশোদ সেবন জনিত দোষের শান্তি হয়।

বঙ্গ (টিন)

দুই প্রকারের বঙ্গ আছে যথা—খুবক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুবক বঙ্গই উৎকৃষ্ট। খুবক বঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মৃদু, স্নিগ্ধ, শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, গুরুত্ব বিশিষ্ট এবং অগ্নিতাপে ইহাতে কোনরূপ শব্দ নির্গত হয় না। মিশ্রক বঙ্গ শ্যাম মিশ্র শুভ্রবর্ণ, উভয় বঙ্গই তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ঈষৎ বায়ু প্রকোপক এবং মেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদ ও ক্রিমি নিবারক।

বঙ্গের গুণ

যথাবিধি ভস্মীকৃত বঙ্গ বল, অগ্নি, ক্ষুধা, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধকর। ইহা নিয়মিত সেবনে ক্ষয়, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি নিবারণ করে। ইহা ধাতুস্থৈর্য্যকারক ও প্রমেহ নাশক।

বঙ্গের শোধন বিধি

(১) বঙ্গ দ্রবীভূত করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার এইরূপ করিলে খুবক বঙ্গ নিশ্চিতই শোধিত হয়।

(২) পুনর্নবা, কুঁচিলা ও কটু অলাবুর (তিতলাউ) সহিত মর্দ্দন করিয়া অম্ল তক্রে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়।

(৩) বঙ্গ ও সীসককে সাতবার ঘোষাচূর্ণ ও আকন্দের আঠা লেপন করিয়া আতপে শুষ্ক করিলেও বঙ্গ ও সীসক বিশুদ্ধ হয়। নিসিন্দা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ শোধিত হইয়া থাকে।

বঙ্গ ভস্ম

(১) বঙ্গের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হরিতাল ও আকন্দের আটা লেপন করিবে। তৎপরে সেই বঙ্গ অশ্বত্থ ও তেঁতুল গাছের শুষ্ক ছালের (চটায়) ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুট পাক করিবে। পাক শেষে সেই ভস্ম চূর্ণ করিয়া লইবে এবং রসাদি ক্রিয়ায় তাহা প্রয়োগ করিবে।

(২) একটী মৃৎপাত্রে বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং, অল্প অল্প হরিতাল চূর্ণ বারংবার নিক্ষেপ করিয়া ভারদ্বাজের (বন কাপাসের) কাষ্ঠ দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহা রস ক্রিয়ার প্রয়োগ করিবে।

(৩) স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় বঙ্গ ভস্ম করিলে সেই ভস্ম বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হয়।

(৪) পলাশ রসে হরিতাল মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গের পাত লেপন করিয়া পুট পাক করিলে বঙ্গ সহজে ভস্ম হয়।

বঙ্গভস্ম সেবন বিধি

আট রতি পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) এই বঙ্গ ভস্ম গব্যতক্রপিষ্ট হরিদ্রার সহিত লেহন করিলে, ইহাদ্বারা সুন্দর রূপে রসায়ন ক্রিয়া নিষ্পন্ন

হয় এবং বিংশতি প্রকার মেহ রোগ নিশ্চিত বিনষ্ট হয়। বঙ্গ ভস্ম সেবন করিয়া শালি ধান্যের অন্ন, মুগের যুষ, নবনীত, তিল, তৈল, পটোল, তিক্ত তেলকুচা ও ঘোল এই সকল পথ্য প্রশস্ত।

বঙ্গের অনুপান

মুখের দুর্গন্ধে—কর্পূরের সহিত বঙ্গ সেব্য।

জাতী ফলের সহিত সেবনে ইহা দেহ পুষ্ট করে ও বীর্য্য ধারণ শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রমেহ রোগে—তুলসী পাতার রস।

রক্ত শূন্যতায়—ঘৃত সহ।

গুল্ম রোগে—সোহাগা সহ (শোধিত)।

অম্লপিত্ত রোগে—হরিদ্রা সহ।

মধু সহ সেবনে মল বৃদ্ধি হয়।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—মিশ্রী সহ।

পানের রসের সহিত সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হয়।

জীর্ণশক্তি লোপে—পিপুল চূর্ণ সহ।

হাঁপ ও শ্বাসে—হরিদ্রাসহ সেব্য।

চাঁপাফুলের রসের সহিত সেবন কারলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

বায়ুবৃদ্ধি জনিত পীড়ায়—মৃগনাভি সহ।

চর্ম্ম রোগে—খদির কাথের সহিত।

অজীর্ণে—সুপারি সহ।

ক্ষয় রোগে—নবনীত সহিত।

দুগ্ধ সহ সেবনে ইহা খুব পুষ্টিকারক।

ভাঙ্ (সিদ্ধি) সহ সেবনে বীর্য্য স্তম্ভন হয়।

বায়ু জনিত পীড়ায়রসুনের রস সহ সেব্য।

কুষ্ঠ ব্যাধিতে—সমুদ্র ফল ও নিগু‍র্ণ্ডী রস সহ।

ক্লৈব্যে—অপমার্গের মুল সহ বঙ্গ সেবন সুন্দর ফলপ্রদ।

জননেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধনে লবঙ্গ, সমুদ্রফল ও পানের রসের সহিত বঙ্গ মলম আকারে ব্যবহার্য্য।

ইহার তিলক কপালে ধারণ করিলে সম্মোহন শক্তি লাভ হয়।

এরণ্ড মূলের রস ও জল সহ কপালে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

সীসক

সীসক শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত ভার বিশিষ্ট, ছেদন করিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। পুতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সীসক প্রশস্ত নহে। তদতিরিক্ত সীসকই নির্দ্দোষ। সীসক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য স্নিগ্ধ, তিক্তরস, বাতশ্লেষ্মনাশক প্রমেহ ও জলদোষ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং আমবাত নাশক।

সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে নিসিন্দামূল, বারাহীকন্দ ও হরিদ্রার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। দ্রবীভূত হইলে সেই সীসক নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিন বার এইরূপ করিলে সীসক শুদ্ধ হয় এবং সেই শোধিত সীসক সেবন করিলে, মূর্চ্ছা ও স্ফোটকাদি পীড়া উৎপন্ন হয় না।

সীসকের গুণ

ভস্মীভূত সীসক জীবনীশক্তি ও শুক্র বর্দ্ধক; ইহা হজম শক্তি বর্দ্ধন করে। দীর্ঘকাল নিয়মিত ব্যবহারে প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করে।

সীসক মিষ্ট এবং তিক্ত রসযুক্ত। ইহা রৌপ্যের রঞ্জক। দীর্ঘকাল ব্যবহারে জীবনশক্তি বীর্য্য ও স্মরণ শক্তি বর্দ্ধন করে।

যথারীতি ভস্মীকৃত সীসক ক্ষয়, বায়ুজনিত পীড়া, গুল্ম, রক্তাল্পতা ক্রিমি, শূল, অতিসার ইত্যাদি অনেক ব্যাধি নষ্ট করে।

শুদ্ধ সীসকের পরীক্ষা

যে সীসক শীঘ্র গলিয়া যায়, অতি ভার বিশিষ্ট, এবং যাহা ছেদন করিলে সমুজ্জল কৃষ্ণবর্ণ দেখায় তাহা বিশুদ্ধ।

সীসক শোধন বিধি

সীসককে পাত করিয়া, নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা) মূল চূর্ণ আকন্দের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ পাতে লাগাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে, তারপর গলাইয়া নিসিন্দার রসে নিমগ্ন করিবে এই ক্রিয়া সাতবার করিলে সীসক শোধিত হয়। সীসককে দ্রবীভূত করিয়া কলার এঁটের রসে সিক্ত করিলে উহা শোধিত হয়।

সীসকের ভস্ম বিধি

১। সীসক ভস্মের বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায়। (চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য)।

২। সমপরিমিত সীসক ও যবক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রবল অগ্নিতাপে চড়াইবে ও লৌহদর্ব্বি দ্বারা নাড়িবে এবং ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত হইলে নামাইয়া বটের ঝুড়ির ক্বাথে মাড়িয়া পুটপাক করিবে।

৩। সীসক পত্রে মনঃশিলা ও আকন্দের আঠা লেপন করিয়া পুটপাক করিলে তাহার নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সীসকের অমৃত করণ

দুই পল সীসক ভস্ম সমপরিমিত হিঙ্গুল ও একতোলা গন্ধক একত্র নিম্বুরসে (লেবুররসে) মর্দ্দন করিয়া গজ পুটেপাক করিবে। এই প্রকারে সীসক অশেষ শক্তিশালী হয়।

সীসকের অনুপান

সীসক ভস্ম চিনি সহ সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত, শিরঃশূল, চক্ষুর পীড়া শুক্রদোষ, প্রলাপ, প্রদাহ অগ্নিমান্দ্য নিরাময় হয়।

অশোধিত সীসক সেবন জনিত দোষের শান্তি

হরীতকী ও চিনিসহ স্বর্ণ ভস্ম তিনদিন সেবন করিলে উক্তদোষের শান্তি হয়।

মিশ্র ধাতু

পিতল

পিতল দুই প্রকার—রীতিকা ও কাকতুণ্ডী। যে পিতল উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে, তাম্র বর্ণ হয় তাহা রীতিকা। আর যাহা উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা কাক তুণ্ডী।

পিতলের গুণ

রীতিকা পিতল তিক্তরস, রুক্ষ ক্রিমিনাশক, রক্তপিত্ত-নিবারক, কুষ্ঠ নাশক, সংযোগবশে ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য কিন্তু স্বভাবতঃ শীতবীর্য্য। কাক—তুণ্ডী পিতল—রুক্ষ, তিক্তরস, উষ্ণ, কফপিত্ত নাশক, যকৃত-প্লীহা নিবারক ও শীতবীর্য্য।

পিতল শোধন বিধি

পিতল উত্তপ্ত করিয়া, হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রসে পাঁচবার নিক্ষেপ করিলে বিশোধিত হয়।

পিতল ভস্ম বিধি

(১) পিতল ভস্মের বিধি তাম্রের ন্যায়।

(২) লেবুররস, মনঃশিলা ও গন্ধকের সহিত পিত্তল মর্দ্দন করিয়া আটবার পুটপাক করিলে পিতল ভস্মরূপে পরিণত হয়।

পিত্তলের বব্যহার

পিতল ভস্ম, কান্ত লৌহভস্ম ও অভ্র সত্ব এই তিন দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া সমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, বামনহাটীর বীজ, বনযমানী, চিতামূল, ভেলা ও তিল চুর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা পরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি, কুষ্ট, বিশেষতঃ শ্বেতকুষ্ঠ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক ও পাচক।

কাংস্য

আটভাগ তাম্র ও দুইভাগ বঙ্গ (দস্তা) দ্রবীভূত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। সৌরাষ্ট্র দেশজাত কাংস্য শুভ ফলপ্রদ। অথবা তীক্ষ্ণশব্দকারী, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঈষৎ শ্যামযুক্তশুভ্রবর্ণ, নিৰ্ম্মল ও দগ্ধ করিলে যাহা রক্তবর্ণ হয়, এই যড়বিধ গুণযুক্ত কাংস্যই প্রশস্ত। যে কাংস্য পীতবর্ণ, দগ্ধ করিলে তাম্রবর্ণ হয় এবং যাহা খরস্পর্শ, রুক্ষ, ঘন, আঘাত সহনে অসমর্থ ও মর্দ্দন করিলে যাহার জ্যোতিঃ নির্গত হয়, এই সপ্তবিধ কাংস্য পরিত্যাগ করিবে।

কাংস্যের গুণ

কাংস্য লঘু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, দৃষ্টির প্রসন্নতা সাধক ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং হিতকর। একমাত্র ঘৃত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল দ্রব্যই কাংস্য পাত্রে সেবন করিলে আরোগ্য, সুখ ও সাত্ম লাভ হয়।

কাংস্যের শোধন বিধি

কাংস্য উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিলে শোধিত হয়।

অথবা তিনঘণ্টাকাল প্রখর অগ্নিতে গোমূত্রে সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়।

কাংস্যের ভস্ম বিধি

শোধিত কাংস্য গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাঁচবার পুটপাক করিলে উহার নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তলৌহ

কাংস্য, তাম্র, পিতল লৌহ ও সীসক এই পঞ্চধাতুর সংমিশ্রণে বর্ত্তলৌহের উৎপত্তি হয়। ইহার অপর নাম পঞ্চলৌহ।

বর্ত্তলৌহের গুণ

বর্ত্তলৌহ শীতবীর্য্য, অম্লকটু-রস, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর, ক্রিমিনাশক, নেত্রের উপকারক এবং মলশুদ্ধি কারক। বর্তলৌহের পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন ও সূপাদি পাক করিলে এবং তাহাতে অম্লপদার্থের সংযোগে না থাকিলে সেই সকল পদার্থ অগ্নিবৃদ্ধিকর ও পাচক হইয়া থাকে।

বর্ত্তলৌহের শোধন বিধি

বর্ত্তলৌহ দ্রবীভুত করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়।

বর্ত্তলৌহ ভস্ম বিধি

উক্তরূপে শোধিত বর্ত্তলৌহ গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

ত্রিলৌহ

পঁচিশ ভাগ স্বর্ণ, ষোল ভাগ রৌপ্য ও দশ ভাগ তাম্র একত্র গলাইয়া ত্রিলৌহ প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্বদোষ নষ্ট করে এবং শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক ও সর্বরোগ নাশক।

ত্রিলৌহের শোধন ও ভস্ম বিধি

ইহা স্বর্ণেরশোধন ও ভস্ম বিধি অনুসারে শোধিত ও ভস্মীভূত হয়। সম্যকরূপে শোধিত ও ভস্মীভূত না হইলে ইহা বিষবৎ ক্রিয়া করে।

ত্রিলৌহ রসায়ন

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে ২ রতি করিয়া ত্রিলৌহ ভস্ম মধু, ঘৃত, ত্রিফলা ও ত্রিকটু সংযোগে সেবন করে সে সুখী, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হয়।

রত্ন

মণি সমূহও পারদের বন্ধন কারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৈক্রান্ত, সূর্য্যকান্ত, হীরক, মুক্তা, চন্দ্রকান্ত, রাজাবর্ত্ত, গরুরোদগীর্ণ, (মরকত), পুষ্পরাগ, মহানীল, পদ্মরাগ (মাণিক্য) প্রবাল, বৈদূর্য্য ও নীল, এইগুলি মণিনামে পরিচিত।

পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, মরকত, পুষ্পরাগ ও হীরক, এই পাঁচটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল, মরকত, পুষ্পরাগ, হীরক, নীলমণি, গোমেদ ও বৈদূর্য্য, এই নয়টী মনি যথাক্রমে নবগ্রহের প্রীতিপদ। পদ্মরাগ (মাণিক্য), পুষ্পরাগ, প্রবাল, মুক্তা, মরকত, হীরক, নীলমণি, গোমেদ ও বৈদূর্য্য এই একল মণি যথাক্রমে ইষ্ট সিদ্ধির জন্য মুদ্রা ধারণে প্রশস্ত।

এই সমস্ত রত্ন সুলক্ষণ ও সুজাত হইলেই তাহারা রসক্রিয়ায়, রসায়ন কার্য্যে, দানে, ধারণে ও দেবপূজায় সিদ্ধিপ্রদ।

মাণিক্য

মাণিক্য দুই প্রকার, পদ্মরাগ ও নীলগন্ধি। পদ্মদলের ন্যায় যাহার কান্তি এবং যাহা স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও অতিশয় উজ্জ্বল, তাহাই পদ্মরাগ। বৃত্ত, আয়ত, সম ও স্থূল পদ্মরাগ উৎকৃষ্ট। আর যাহা গন্ধাম্বু হইতে উৎ[illegible]

এবং নীলগর্ভ রক্তবর্ণ তাহাই নীলগন্ধি মাণিক্য। ইহাও পদ্মরাগের ন্যায় বৃত্তাদিগুণ বিশিষ্ট হইলেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

রন্ধ্র যুক্ত, কর্কশ, মলিন, রুক্ষ, অস্বচ্ছ, চ্যাপ্‌টা, লঘু ও বক্র এই আট প্রকার মাণিক্য দূষিত।

মাণিক্য অগ্নির উদ্দীপক, বৃষ্য, কফ বাতনাশক, ক্ষয়রোগ নিবারক এবং ভূত, বেতাল, পাপ ও কর্ম্মজ ব্যাধি সমূহের শান্তিকারক।

মৌক্তিক

আহ্লাদ জনক, শ্বেতবর্ণ, লঘু, স্নিগ্ধ, কিরণ বিশিষ্ট, নির্ম্মল, বৃহৎ, জল বিম্ববৎ ও গোলাকার এই নয় প্রকার গুণযুক্ত মৌক্তিক শুভ জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মুক্তা লঘু, শীতল, মধুরস, কান্তিবর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষজনক, অগ্নিদীপ্তিকর, পুষ্টিজনক, বিষনাশক, বিরেচক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। সমুদ্রে যে শুক্তিজন্মে, তাহা উজ্জ্বল এবং পরিণাম শূলের অচিরাৎ শান্তি কারক।

যে মুক্তা রুক্ষাঙ্গ, শুক্রবৎ, শ্যামবর্ণ, তাম্রাভ ও লবণ সদৃশ, অর্দ্ধাংশে শুভ্র, বিকটাকার অথবা গ্রন্থিবিশিষ্ট, সেই সমস্ত মুক্তা পরিত্যাগ করিবে।

মুক্তা, কফ পিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক; কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুঃবর্দ্ধক এবং দাহ শান্তি কারক।

মুক্তা নিম্নলিখিত বিষয় গুলি হইতে উৎপন্ন হয়:—হস্তী, ভেক, শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, শুক্তি এবং বংশ।

গজমুক্তা

হস্তী হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহাকে গজ মুক্তা বলে ইহা খুব উজ্জ্বল, জয় প্রদানকারী এবং রোগসকলের শান্তিকারক।

সর্পমণি

সর্পমণি রম্য, নীলবর্ণজ্যোতিবিশিষ্ট এবং অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা তিন প্রকার। কাঁঠালের আকৃতি সদৃশ, আমলকী সদৃশ ও গুঞ্জাবীজ সদৃশ।

মীনমুক্তা

ইহা কুঁচবীজ সদৃশ। এক প্রকার তিমি জাতীয় মৎস্যের ভিতর উৎপন্ন হয়। ইহা লঘু এবং পারুল পুষ্প সদৃশবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা গোলাকার এবং তত উজ্জ্বল নয়।

মীন মুক্তা মৎস্যাক্ষি সদৃশ পবিত্র এবং বহুগুণ বিশিষ্ট ও বৃহৎ। ইহা তিমি মুখে উৎপন্ন হয়।

বরাহ মুক্তা

কোন কোন বরাহের দন্তমূলে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহাকে বরাহ মুক্তা বলে। ইহা চন্দ্রবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল এবং বহু গুণ সম্পন্ন!

বেণু মুক্তা

বংশজাত মুক্তা (বংশের মধ্যে হয়) চন্দ্রবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল। হরিদ্রাভ বর্ণবিশিষ্ট। বংশলোচনের সহিত ইহার প্রভেদ—বংশলোচন চিনির ন্যায় দ্রব্য, কোমল ও লঘু; বেণুমুক্তা কঠিন এবং গুরু।

শঙ্খ মুক্তা

শঙ্খমুক্তা চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা বর্ত্তুলাকার উজ্জ্বল এবং মনোহর। কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সময়ে সময়ে পারাবতের অণ্ড সদৃশ বৃহৎ হইয়া থাকে।

দর্দ্দুর মুক্তা

ভেকের শিরে যে মুক্তা জন্মে তাহা সর্প-মণি সদৃশ।

শুক্তি মুক্তা

শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহাকে শুক্তি মুক্তা কহে। শঙ্খ ও শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা অন্যান্য মুক্তা অপেক্ষা হীন। যে মুক্তা সমুদ্রে জন্মে (মীন মুক্তা, শঙ্খ মুক্তা, শুক্তি মুক্তা,) তাহা বীর্য্যবান এবং রোগ বিনাশকারী।

প্রবাল

পক্ক বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, বৃত্ত ও দীর্ঘাকৃতি, অবক্র, স্নিগ্ধ, অক্ষত ও স্থূল এই সাতপ্রকার প্রবাল শুভ ফলপ্রদ।

পাণ্ডু বা ধুসরবর্ণ, সূক্ষ্ম, ক্ষতবিশিষ্ট, অভ্যন্তর কণ্ডরারার ন্যায় কোটর বা অর্ব্বুদ বিশিষ্ট, ভারশূন্য, তাম্রবর্ণ এই আট প্রকার প্রবাল প্রশস্ত নহে।

প্রবাল অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘু, ক্ষীণ, পিত্ত, রক্ত ও কাস নিবারক এবং নেত্ররোগের শান্তিকারক।

তার্ক্ষ্য

হরিদ্বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, কিরণ বিশিষ্ট, মসৃণ, উজ্জ্বল ও স্থূল এই সপ্ত বর্ণ বিশিষ্ট মরকত মণি প্রশস্ত। যে মরকত কপিল নীল পাণ্ডু বা কৃষ্ণবর্ণ; কর্কশ, লঘু, চ্যাপটা, বিকট ও রুক্ষ, তাহা অপ্রশস্ত। মরকত মণি জ্বর, বমি, বিষদোষ, শ্বাস, সন্নিপাত, অগ্নিমান্দ্য; অর্শ, পাণ্ডু ও শোথ রোগের উপশমকারক এবং ওজোবৃদ্ধিকর।

পুষ্পরাগ

গুরু, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, স্থূল, সমগাত্র, মৃদু, মসৃণ এবং কর্ণিকার কুসুমের ন্যায় পীতবর্ণ, এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত পুষ্পরাগ মণি শুভজনক। পীত, শ্যাম, কপিশ, কপিল বা পাণ্ডুবর্ণ; প্রভাহীন, কর্কশ; রুক্ষ ও অসমগাত্র পুষ্পরাগ মণি পরিত্যাগ করিবে। পুষ্পরাগ অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং বিষদোষ, বমন, কফ, বায়ু, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, কুষ্ঠ ও রক্তদোষের উপশমকারক।

বজ্র

পুং, স্ত্রী, ও নপুংসক ভেদে বজ্র (হীরক) তিন প্রকার। রসবীর্য্য ও বিপাকে ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ নপুংসক অপেক্ষা স্ত্রী এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুংজাতীয় হীরক শ্রেষ্ঠ।

অষ্ট কোন, অষ্ট ফলক বা ষট্‌কোণযুক্ত অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট এবং মেঘ, ইন্দ্রধনু অথবা স্বচ্ছ জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হীরককে পুংজাতীয় হীরক কহে। যাহা বর্ত্তুলাকার, দীর্ঘ ও চ্যাপ্‌টা, তাহা স্ত্রী-জাতীয়। আর যাহা বর্ত্তুলাকার কিন্তু কোণাগ্রে সঙ্কুচিত এবং কিঞ্চিৎ গুরু, তাহাই নপুংসক জাতীয় হীরক।

স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক ব্যক্তিকে যথাক্রমে স্ত্রীজাতীয়, পুংজাতীয়, ও নপুংসকজাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক ভিন্ন অপর কোন হীরক এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না। অর্থাৎ পুংজাতীয় হীরক স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক সকলের পক্ষেই উপকারী। এই ত্রিবিধ হীরক প্রত্যেকেই আবার শ্বেতাদি বর্ণ ভেদে চতুর্ব্বিধ। সেই চতুর্ব্বিধ বিভাগ বর্ণ ভেদানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ জাতীয়, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রজাতীয়। এই সকলের মধ্যে পীতবর্ণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর উত্তম জাতীয় হীরক অধিক ফলপ্রদ।

হীরক আয়ুবর্দ্ধক, শীঘ্র সদ্‌গুণপ্রদ, বৃষ্য, ত্রিদোষের শান্তিকারক, সকল রোগনাশক, পারদের বন্ধন, জারণ ও গুণোৎকর্ষ সম্পাদক, উদ্দীপক মৃত্যু নিবারক ও অমৃতবৎ উপকারক।

সকল রত্নেরই পাঁচটি সাধারণ দোষ আছে, যথা গৌর, ত্রাস, বিন্দু রেখা ও জল-গর্ভতা। ক্ষেত্র ও জলজাত এই সকল দোষ রত্নে সংলগ্ন হয় না।

হীরকের শোধন।

(১) কুলথের কাথ অথবা কোদধান্যের কাথ সহ এক প্রহর পর্য্যন্ত স্বিন্ন করিলে হীরক শোধিত হয়।

(২) যে কোন প্রকার রত্ন দোলাযন্ত্রে জয়ন্তী পাতার রসে ৩ ঘণ্টা পাক করিলে শোধিত হয়।

হীরকের ভস্মবিধি।

শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হীরক অশ্বত্থ, বদরী ও জয়ন্তী বৃক্ষের ছাল, মাক্ষিক ও কাঁকড়ার খোলা ও সমপরিমাণ মনসা বৃক্ষের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে হীরক ভস্মীভূত হয়।

লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হীরক করবী, মেষশৃঙ্গী, বদরী ও উডুম্বর সম পরিমিত আকন্দের আঠার সহিত মাড়িয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

পীতবর্ণবিশিষ্ট হীরক বালা, অতিবালা, গন্ধক, ও কচ্ছপের চেটো সমপরিমিত ইন্দ্রবারুণীর (রাখাল শসার) আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

কৃষ্ণবর্ণ হীরক, ওল, রশুন, শঙ্খ, মনঃশীলা সমপরিমিত বটের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

স্ত্রী জাতীয় ও নপুংসক জাতীয় হীরক পুংজাতীয়ের ন্যায় ভস্ম করা সম্ভব।

হীরকভস্ম তিনগুণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুটিকা করিবে, সেই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

হীরক ভস্ম ৩০ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, রৌপ্য ৮ ভাগ, পারদ ১১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৮ ভাগ, বৈক্রান্ত ৬ ভাগ এই ছয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে পারদের ষাড়্গুণ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

নীলা (নীলমণি)।

নীলমণি দুই প্রকার, জলনীল ও ইন্দ্রনীল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রনীল মণিই শ্রেষ্ঠ! যে নীল মণির গর্ভে শ্বেত আভা দৃষ্ট হয় এবং যাহা লঘু, তাহাই জলনীল। আর যাহার গর্ভে কৃষ্ণ আভা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা ভারবিশিষ্ট, তাহাই ইন্দ্রনীল।

একবর্ণ বিশিষ্ট, গুরু, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, পিণ্ডাকৃতি, মৃদু ও মধ্যদেশে জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট, এই সাত প্রকার নীলরত্ন উৎকৃষ্ট। জলনীলমণিও সাত প্রকার; যথা—কোমল অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ, বিহিত (অর্দ্ধাংশ একবর্ণ, ও অর্দ্ধাংশ পঞ্চবর্ণ), রুক্ষ, ভারশূন্য, রক্তগন্ধযুক্ত, চ্যাপটা ও সূক্ষ্ম। নীলমণি—শ্বাস-কাসনাশক, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং বিষমজ্বর, অর্শঃ ও পাপ নিবারক। এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার নীলমণি আছে তাহার নাম মহানীলা। এই নীল ১০০ গুণ দুগ্ধের মধ্যে রাখিলে ইহার বর্ণাধিক্য-বশতঃ ঐ দুগ্ধ নীলবর্ণ ধারণ করে।

নীলা উড়িষ্যার কতক অংশে এবং সিংহলে পাওয়া যায়।

গোমেদ।

গোমেদ মণির বর্ণ গোমেদের ন্যায়, এইজন্য ইহাকে গোমেদ বলা হয়। গোমুত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সমগাত্র, গুরু-স্তরহীন, মসৃণ ও উজ্জ্বল, এই আট প্রকার গোমেদ মণি শুভফলপ্রদ; বিকৃতবর্ণ, লঘু, রুক্ষ, চ্যাপটা, ত্বকের ন্যায় আবরণযুক্ত, প্রভাহীন ও পীত কাচের ন্যায় বর্ণযুক্ত গোমেদ শুভজনক নহে।

গোমেদ মণি কফপিত্তনাশক, ক্ষয় ও পাণ্ডুরোগনাশক এবং অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধক।

বৈদূর্য্য।

যে বৈদূর্য্য মণি শুভ আভাযুক্ত, শ্যামবর্ণ, সমগাত্র, স্বচ্ছ, গুরু ও উজ্জ্বল এবং যাহার মধ্যভাগে শুভ্র উত্তরীয়বৎ পদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে

বলিয়া বোধ হয় তাহাই শুভজনক বলিয়া কীর্ত্তিত। আর জলবৎ শ্যামবর্ণ চিপিট (চ্যাপটা), লঘু, কর্কশ ও যাহার ভিতর রক্তবর্ণ উত্তরীয়বৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রশস্ত নহে।

বৈদূর্য্য মণি রক্ত-পিত্তনাশক, প্রজ্ঞা, আয়ুঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক, পিত্তপ্রধান রোগ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক ও মলনাশক।

রত্নশুদ্ধি।

অম্লদ্রব্য দ্বারা মাণিক্য, জয়ন্তীপত্রের রস দ্বারা মুক্তা, ক্ষারবর্গ দ্বারা বিদ্রুম, গোদুগ্ধ দ্বারা মরকত, কুলত্থকাথ মিশ্রিত মদ্য বা কাঁজি দ্বারা পুষ্প-রাগ, তণ্ডুলীয় (কাঁটা নটে) রস দ্বারা হীরক, নীল বৃক্ষের রস দ্বারা নীলমণি, গোরোচনার দ্বারা গোমেদ এবং ত্রিফলার জল দ্বারা বৈদূর্য্য মণি শোধিত হয়।

রত্নসকলের ভস্ম

মান্দারের রস, মনঃশীলা, গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া আটবার পুট দিলে হীরক ব্যতীত অন্যান্য রত্নসকল ভস্ম হইয়া যায়।

হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার সাচীক্ষার, সোহাগা, মাংস দ্রব (অম্লবেতস বিশেষ), অম্লবেতস, চুলিকালবণ, পক্ব জয়পালফল, ভল্লাতক দ্রবন্তী, রুদন্তীলতা, ক্ষীরবিদারী, চিতামূল এবং মনসাসীজের আটা ও আকন্দের আটা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া তাহার একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলকের মধ্যে নির্দ্দোষ ও শুভফলপ্রদ সুজাত রত্নসমূহ নিহিত করিবে, তৎপরে সেই গোলকের উপর ভূর্জ্জপত্র জড়াইয়া সূত্র দ্বারা তাহা বান্ধিবে। পুনর্ব্বার তাহার উপর বস্ত্র বেষ্টন করিয়া, সমুদয় অম্লদ্রব্য ও কাঁজিপূর্ণ হাঁড়ীতে দোলা যন্ত্রে পাক করিবে। তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত তীব্র অগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া রত্ন সমূহ ধৌত করিয়া লইবে। অতঃপর

পুটপক্ক করিয়া সেই রত্নের ভস্ম গ্রহণ করিবে। রত্নভস্ম রত্নের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট, লঘু, দেহের দৃঢ়তাজনক এবং বিবিধ শুভফলপ্রদ।

মুক্তাচূর্ণ অম্লবেতসের সহিত এক সপ্তাহ মর্দ্দন করিয়া জামীরের মধ্যে নিহিত করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। এক সপ্তাহ পরে উহা বাহির করিয়া পুটপাক করিলে উহার ভস্ম প্রস্তুত হয়।

বজ্রবল্লীর (হাড়জোড়া) মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া অম্লদ্রব্যপূর্ণ ভাণ্ডে সপ্তাহকাল তাহা স্বিন্ন করিবে। পরে পুটপাক করিলেই হীরক ভস্মরূপে পরিণত হয়।

বৈক্রান্ত।

শ্বেতবর্ণ বৈক্রান্ত অম্লবেতসের রসে ভিজাইয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে এক সপ্তাহকাল ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে কেতকীর স্বরস, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণপুষ্পী (স্বর্ণযুথী বা বিষলাঙ্গলীয়া) ও ইন্দ্রগোপকীট এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়ীতে রাখিয়া সেই হাঁড়ীর মধ্যে দোলাযন্ত্রে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৈক্রান্ত স্বিন্ন করিবে। এইরূপে বৈক্রান্ত ভস্ম প্রস্তুত হয়। অষ্টবিধ ধাতুতে হীরক প্রক্ষেপ দিয়া স্বিন্ন করিলে, সেই যোগ প্রভাবে তাহাও নিশ্চিত দ্রবীভূত হয়।

রত্নভস্ম কুসুম্ভ বীজের তৈল মধ্যে রাখিলে তাহা চিরকাল অবিকৃত থাকে। ঐরূপে রত্নভস্ম রাখিয়া প্রয়োজন কালে তাহা ব্যবহার করিবে।

রত্ন ধারণ করিলে, সূর্য্যাদি গ্রহের নিগ্রহ নিবারিত হয়, দীর্ঘায়ু ও আরোগ্যলাভ হয়, সৌভাগ্য জন্মে, ভাগ্যাধীনবিভব ও উৎসাহপ্রাপ্ত হওয়া যায়; ধৈর্য্য বৃদ্ধি হয়, কান্তিহীনতা ও প্রস্তর ধূলি প্রভৃতির সংসর্গ-জনিত অলক্ষ্মীনাশ ও ভূতাদি নিবারিত হয়।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণস্থ খনি সমূহে বৈক্রান্ত পাওয়া যায়।

বৈক্রান্তের শোধনবিধি

কুলত্থক্কাথে তিন দিন সিদ্ধ করিলে বৈক্রান্ত শোধিত হইয়া থাকে।

বৈক্রান্তের স্বত্ত্বপাতন

বৈক্রান্তের ভস্ম, গুড়, গুগ্গুল, লাক্ষা, উষ্ফল; পিণ্যাক, রাল, লোম এবং ক্ষুদ্রমৎস্য ইহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথেষ্ট দুগ্ধসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষাবদ্ধ করিয়া উত্তপ্ত করিলে বৈক্রান্তের স্বত্ত্বনির্গত হয়।

বৈক্রান্তের ব্যবহার

বৈক্রান্ত ভস্ম তাহার এক চতুর্থাংশ স্বর্ণভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া একরতি মাত্রায় প্রতিদিন পিপ্পলিচূর্ণ, ঘৃত, ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা, পেটের যাবতীয় ব্যাধি, রক্তহীনতা, ভগন্দর, অর্শঃ, হাঁপ, কাস, পুরাতন উদরাময়, প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দেহের শক্তি বর্দ্ধক।

স্ফটিক

কয়েক প্রকারের স্ফটিক সাধারণতঃ দেখা যায়। মন্দকান্তি (লাক্ষা জ্যোতিঃবিশিষ্ট) স্ফটিক বিন্ধ্যা পর্বতের জঙ্গলে উৎপন্ন হয়। তাহাদের বর্ণ অশোকের কচি পল্লবসদৃশ অথবা দাড়িম্ববীজ সদৃশ। কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক সিংহলে উৎপন্ন হয়। পদ্মরাগ মণির খনিতে তিন প্রকার স্ফটিক উৎপন্ন হয়। উহারা প্রত্যেকে অত্যন্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ, এবং স্তরবিহীন। ইহাদের সাধারণ নাম জ্যোতিঃরস। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ স্ফটিককে রাজাবর্ত্ত, নীলবর্ণবিশিষ্টকে রাজময় এবং যে স্ফটিকের গাত্রে ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় দাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে ব্রহ্মময় স্ফটিক বলে।

স্ফটিকের গুণ

ইহা নাতিশীতল ও নাতিউষ্ণ। ইহা পিত্ত, শোথ, রক্তদুষ্টি এবং ক্ষয় রোগে পরম হিতকর।

স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্রে জল রাখিলে তাহা শীতল এবং পিত্তনাশকগুণ বিশিষ্ট হয়।

চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণি।

সূর্য্যকান্ত মণি হিমালয়ের শিখর দেশে জন্মিয়া থাকে। ইহা সূর্য্য গ্রহের প্রিয়বস্তু। সূর্য্যকিরণ ইহার উপর পতিত হইলে ইহার মধ্যদেশ হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হয়। ইহা রত্নশ্রেষ্ঠ। চন্দ্রকান্ত মণি চন্দ্রগ্রহের প্রিয়বস্তু। ইহাও হিমালয়ের শিখরদেশে পাওয়া যায়। ইহা দুর্ল্লভ। ইহার উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে ইহার মধ্যস্থল হইতে অমৃত সদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন জলকণা বহির্গত হয়।

সূর্য্যকান্ত মণির গুণঃ—ইহা উষ্ণ, নির্ম্মল, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মহর ও মেধাজনক। এই রত্নধারনে রবিগ্রহ জনিত যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়।

চন্দ্রকান্ত মণির গুণঃ—ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক। ইহা মহাদেবের প্রিয়বস্তু এবং গ্রহদোষ ও দুর্ভাগ্যনাশক চন্দ্রকান্ত-মণি হইতে যে জলকণা নির্গত হয়, তাহা অতিশয় বিশুদ্ধ এবং পিত্তপ্রশমক।

প্রবাল সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

(১) উৎকৃষ্ট প্রবাল রক্তশ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মৃদু ও মসৃণ, এবং ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায়।

(২) তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণসম্পন্ন প্রবাল জবাপুষ্প, সিন্দূর অথবা দাড়িমপুষ্পবৎ। ইহা কঠিন, মসৃণ নহে এবং ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায় না।

(৩) ইহা অপেক্ষা হীনগুণসম্পন্ন প্রবাল পলাশ বা পারুল পুষ্প সদৃশ রক্তহরিৎবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধ কিন্তু মসৃণ নহে।

(৪) ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রবাল রক্তকৃষ্ণবর্ণ। ইহা কঠিন এবং জ্যোতিঃবিশিষ্ট নহে। ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায় না।

ব্যবহারযোগ্য প্রবালের লক্ষণ :—বিশুদ্ধ প্রবাল রক্তবর্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, বিদারণযোগ্য, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, গোলাকার ও স্থূল।

অব্যবহার্য্য প্রবালের লক্ষণ—পাণ্ডু, ধূসর, দাগবিশিষ্ট তাম্রাভ ও লঘু।

প্রবালের গুণ :—প্রবাল ক্ষয়, পিত্ত, রক্তস্রাব, কাস, চক্ষুরোগ বিষদোষ ও ভূতদোষ নাশক। ইহা লঘু এবং পাচক।

কর্কেত

কর্কেতমণি শ্লীপদ এবং যাবতীয় স্পর্শজদোষনাশক। ইহা বর্ণভেদে সাতপ্রকার। তন্মধ্যে নীল ও শ্বেতবর্ণ কর্কেত হীনগুণ বিশিষ্ট।

ভীষ্মরত্ন

ইহা হিমালয় পর্বতে পাওয়া যায়। ইহা সর্ববিধ বিষনাশক। এই মণি হস্তে ধারণ করিলে ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর কোন ভয় থাকে না। ইহা জল, অগ্নি, দস্যু ও শত্রুভয় নিবারক। যে ভীষ্মমণি শৈবালসদৃশ এবং বলাকাপক্ষবর্ণবৎ কর্কশ, প্রভাহীন, পীতবর্ণ বিশিষ্ট এবং মলিন তাহা ব্যবহার্য্য নহে।

নীলমণির বিশেষ গুণ

নীলমণি শ্বাস, কাস ও ত্রিদোষ নাশক, বৃষ্য, দীপন, বিষমজ্বর, অর্শঃ এবং পাপনাশক।

উপরত্ন

নানা প্রকারের উপরত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাতপ্রকার প্রধান। যথা পালঙ্ক, রুধির, পুত্তিকা, তার্ক্ষ্য, পীলু, উপল, সুগন্ধিক। রত্নে যে সমস্ত গুণ আছে, উপরত্নে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বরত্ন শোধন ও জারণের নিয়মানুসারে ইহাদিগকে শোধিত ও মারিত

করিবে। জারিত উপরত্ন সকল রসসংস্কারে এবং ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রহরত্ন

সূর্য্যগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে বৈদূর্য্যমণি, চন্দ্র হইলে নীলকান্ত; মঙ্গল হইলে প্রবাল; বুধ হইলে পদ্মরাগ, বৃহস্পতি হইলে মুক্তা, শুক্র হইলে হীরক, শনি হইলে ইন্দ্রনীল, রাহু হইলে গোমেদ, এবং কেতু হইলে মরকত মণি ধারণ করিতে হয়।

গ্রহধাতু

সূর্য্যের তাম্র, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের গন্ধক, মনঃশীলা ও হরিতাল, বুধের পারদ, ও স্বর্ণ, বৃহস্পতির হরিতাল ও গন্ধক, শুক্রের বঙ্গ, তাম্র ও রৌপ্য, শনির, লৌহ ও সীসক, রাহুর লৌহ, কেতুর রাজপট্ট প্রশস্ত ধাতু।

গ্রহ ঔষধি

সূর্য্য বিরুদ্ধ হইলে বিল্বমূল, চন্দ্রে ক্ষীরুই মূল, মঙ্গলে অনন্ত মূল, বুধে বৃদ্ধদারকের মূল, বৃহস্পতিতে ব্রহ্মযষ্টির মূল, শুক্রে সিংহপুচ্ছ (রাম বাসক) মূল, শনির বেড়েলা মূল, রাহুতে চন্দন ও কেতুতে অশ্বগন্ধা মূল ধারনীয়।

ক্ষার

ক্ষার মাত্রেই মলনিকাশক।

ক্ষারত্রয়

যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার ও সোহাগা।

ক্ষার চতুষ্টয়

সর্জ্জিক্ষার. ঔষরক্ষার যবক্ষার ও সোহাগা।

পঞ্চক্ষার

পলাশক্ষার; ঘণ্টাপারুলক্ষার; যবক্ষার; সর্জিক্ষার ও তিলক্ষার। এই ক্ষারপঞ্চকের মধ্যে সোহাগা; সর্জিক্ষার; ঔষরক্ষার ভুমি হইতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলি বৃক্ষভস্ম হইতে গ্রহণ করা হয়। নিশাদল ও ক্ষার বলিয়া অভিহিত। আমরা উপরস বর্ণনা কালে ইহা বর্ণনা করিয়াছি ইহাতে পারদের কতকাংশ বিদ্যমান আছে।

নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলির ক্ষার ঔষধে ব্যবহৃত হয় যথা :—

পলাশ; অশ্বত্থ; ঘণ্টাপারুল; ধব, মনসাসীজ; অপমার্গ; ছোলার গাছ, আকন্দ; তেঁতুল; তিলঝাটী; (তিলের গাছ) যব; বাসক; দুরালভা; কণ্টকারি; মূলা; চিতা; পুনর্ণবা, আর্দ্রক।

উপর্যুক্ত ক্ষারগুলির মধ্যে যবক্ষার, সর্জিক্ষর, নিশাদল ঔষর ক্ষার ও সোহাগা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষারের গুণ

ক্ষারসকল তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণ, লঘু, দীপক, ক্লেদক, দাহকর, শোথ ক্ষারক, শ্লেষ্মানাশক, ব্রণনাশক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

ক্ষারসকল পারদের মুখ উৎপাদনকারী, গুল্ম, অর্শ, শূল, বহুমূত্র, অশ্মরী, ও গ্রহণীনাশক। ক্ষারসমূহ পাচক কিন্তু রক্তপিত্ত কারক। অনেক সময় অস্ত্রপ্রয়োগ অপেক্ষা ক্ষারপ্রয়োগে অধিক সুফল লাভ হয়। অধিক ক্ষার সেবনে বীর্য্যক্ষয় হয়।

ক্ষার প্রস্তুতের সাধারণবিধি

যে সকল বৃক্ষ বা পত্র হইতে ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা দিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে হইবে, পরে ঐ ভস্ম ষোলগুণ জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া মোটা কাপড়ে ৭ বার ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে থাকিবে, পরে জল অদৃশ্য হইলে নিম্নস্থ শ্বেত অংশ গ্রহণ করিবে।

যবক্ষারপ্রস্তুত বিধি

যবের শুয়াগুলি পোড়াইয়া ১৬ গুণ জলে ভিজাইয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে যবক্ষার কহে।

যবক্ষারের গুণ

যবক্ষার কটু, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ, সূক্ষ্ম, পাচক, সারক, মূত্রকারক, বাত শ্লেষ্মানাশক, আনাহ, গ্রহণী, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, শ্বাস, শূল, প্লীহা, হৃদ্‌রোগ, ও আমদোষনাশক। ইহা বহ্নিগুণবিশিষ্ট ও শুক্রনাশক।

যবক্ষারের গুণ (পাকিমক্ষার বা নবসার)

ইহা মেদনাশক ও বস্তিশোধক। ইহা বায়ুনাশক, ক্লেদক, বলনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, বিরেচক, কোমল, শীঘ্র শরীরের মধ্যে সর্ব্বস্থানে বিসর্পিত হয়, অম্ল পিত্তবর্দ্ধক, লঘু পাচক ও উর্দ্ধগত বায়ুপ্রশমক। ইহা যক্ষ্মা, উদর, আনাহ, শূল, গুল্ম উদ্গার, আম, ও ক্রিমিনাশক।

মিশ্রক্ষার

ক্ষারব্যবসায়িগণ কথন কথন ক্ষাব অধিক উৎপন্ন করিবার জন্য কর্দ্দমের সহিত ঘাসের ছাই মিশ্রিত করে এবং ঐ কর্দ্দম মিশ্রিত ভস্ম রাশি জলে গুলিয়া উপরিস্থিত তরল পদার্থ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করে। ইহাকে মিশ্রক্ষার কহে।

সর্জ্জিক্ষার

কোন কোন পর্ব্বতে বা সন্নিহিত স্থান সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার মিশ্রিত মৃত্তিকাস্তর দৃষ্ট হয়। ইহাকে সর্জ্জিমাটি কহে। ইহাতে সর্জ্জিমৃত্তিকা ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এই মৃত্তিকা চতুগুণ জলে গুলিয়া ঘন বস্ত্রখণ্ডে ছাঁচিয়া পরিস্কৃত করিতে হয়; পরে ঐ তরল পদার্থ অগ্নিতে জাল দিয়া ক্ষার গ্রহণ করা হয়। ইহাকে সর্জ্জিক্ষার কহে।

সর্জ্জিক্ষারের গুণ

যবক্ষারের ন্যায় সর্জিক্ষারের ও বহ্নি আছে। ইহা, কটু, উষ্ণ, ও তীক্ষ্ণ, কফ ও বায়ুপ্রশমক। ইহা গুল্ম, আধ্মান, উদররোগ, ব্রণ, ক্রিমি, আনাহ, প্লীহা বৃদ্ধি ও যকৃৎ নিসূদনকারী। ইহা শুক্র দোষনাশক।

কৃত্রিম সর্জ্জিক্ষার

উল্লিখিত সর্জিক্ষার অভাবে চিকিৎসকগণ কখনও কখনও দুরালভা বা ক্ষুদ্র দুরালভার ছাই হইতে সর্জিক্ষার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন।

টঙ্কন

উত্তর ভারতে ও তিব্বত দেশে শুষ্ক জলাশয়ের গর্ভে একপ্রকার মৃত্তিকামিশ্রিত ক্ষার দৃষ্ট হয় ইহাকে টঙ্কন কহে। ইহাকে জলে গলাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাঁকিয়া অগ্নিতাপে শুষ্ক করিলে পাত্রের তলদেশে পতিত হয়।

টঙ্কনের ভেদ

টঙ্কন দুইপ্রকার পিণ্ড ও দানাবিশিষ্ট। পূর্বটি অপেক্ষা শেষোক্তটি অধিক শ্বেতবর্ণ। পূর্বটি তাদৃশ শ্বেতবর্ণ নহে।

টঙ্কনের গুণ

পিণ্ড টঙ্কন কটু, উষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও বায়ু পিত্তবর্দ্ধক। ইহা কাস, শ্বাস, রজোরোধ, স্থাবরবিষ নষ্ট করে। ইহা দানা বিশিষ্ট টঙ্কন হইতে অল্পগুণ সম্পন্ন। শ্বেতবর্ণ বা দানা বিশিষ্ট টঙ্কন—কটু, উষ্ণ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সাদা, বিরেচক ও বলপ্রদানকারী, পাচক, শ্লেষ্ম ও বায়ু নাশক, ক্ষয় আমদোষ ও বিষদোষনাশক। শ্বেত টঙ্কন, পিণ্ডটঙ্কন অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

টঙ্কনশোধন বিধি

টঙ্কনকে দগ্ধ করিয়া ফোটিত করিলে বিশোধিত হয়।

ক্ষার দুই প্রকার তরল ও কঠিন

দুইপ্রকার ক্ষার দেখা যায়, কঠিন ও তরল। কঠিন ক্ষার বাহ্য প্রয়োগ ও ঔষধের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। এবং তরল ক্ষার কতিপয় রোগে কাকঞ্জি, মস্ত, দধি, দুগ্ধ, তক্র ও ত্রিফলা ক্কাথের সহিত পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়ের গুণ

সর্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষার দ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটি ক্ষারের যে যে গুণ পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে দুইটি অথবা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই সেই গুণ প্রকাশ করে। বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগনাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

ক্ষারাষ্টক

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং সর্জিকাক্ষার এই আটটিকে ক্ষারাষ্টক বলে। ক্ষারাষ্টক—অগ্নিগুণবিশিষ্ট। ইহা গুল্ম ও শূলবিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

লবণ

ছয় প্রকার লবণ সাধারণতঃ দেখা যায়—সামুদ্রলবণ, সৈন্ধব, বিড়, সৌবর্চল, রোমক ও চুল্লিকা।

লবণের সাধারণ গুণ

লবণ শোধক ও রুচিকারক, পাচক, কফপিত্তবর্দ্ধক, পুরুষত্ব ও বায়ুনাশক। ইহা দেহের শৈথিল্য ও মৃদুত্বকারক, বলদ, মুখে জলোৎপাদনকারী, কপোল ও গলদাহকারী।

অতি লবণসেবনের দোষ

অতিরিক্ত লবণ সেবন করিলে চোখউঠা, রক্তপিত্ত, অস্ত্রক্ষত; বলি পলিত, কুষ্ঠ; বিসর্প ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

সামুদ্রলবণ

ইহা পাচক, তীক্ষ্ণ; লঘু; রোচক ও সারক, ক্ষারগুণযুক্ত, কফপিত্ত বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

সৈন্ধব

সৈন্ধব পর্ব্বতজাত লবণ; পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহা পাওয়া যায়। ইহা পাচক, শীতবীর্য্য; লবণমধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক; রোচক, চক্ষুর হিতকর; শুক্রবর্দ্ধক; ত্রিদোষনাশক, সূক্ষ্মস্রোতগামী; কোষ্ঠকাঠিন্য ও ব্রণ নাশক।

বিড়

ইহা এক প্রকার কৃত্রিম লবণ। ইহা লবণরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ ক্ষারযুক্ত, লঘু, পাচক, রুক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী, উর্দ্ধগত কফ এ অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, ক্ষুধা পিত্তবর্দ্ধক ও রেচক। ইহা শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্ম, হৃদরোগে ও মেহরোগে শুভফলপ্রদ।

বিড়লবণ প্রস্তুতপ্রণালী

(১) ৮২ ভাগ সমুদ্র লবণ, একভাগ হরিতকী, একভাগ আমলকী ও একভাগ সর্জ্জি (শোধিত) একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃৎপাত্রে তীক্ষ্ণ অগ্নিতে যে পর্য্যন্ত পিণ্ডাকৃতি না হয় সে পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়।

(২) আটভাগ সামুদ্রলবণ একভাগ আমলকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃৎপাত্রে তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে বিড়লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চল

সচল লবণ—রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকারক সূক্ষ্ম স্রোতগামী এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূল নিবারক। উষর ক্ষার ও এই লবণ প্রায় একই দ্রব্য। ইহাকে ক্ষার এবং লবণ উভয়ই বলা চলে। প্রস্তুতিবিধি ঔষর ক্ষারের বিধির ন্যায়।

রোমক

রোমক—শাম্ভারি লবণ—লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্মস্রোতগামী, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

রাজপুতনার জয়পুরে শাম্ভরী নামে লবণ হ্রদ আছে। সমুদ্র জলের ন্যায় ইহার জল লবণাক্ত। এই জল হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক বলে।

চূলিকা লবণ

নবসার ও চুলিকা লবণ একই দ্রব্য।

আরও তিন প্রকার লবণ দৃষ্ট হয়; কাচ লবণ বা কাল লবণ, দ্রোণী লবণ ও ঔষর লবণ।

কাল লবণ

ইহা শূল, গুল্ম, কফ ও বায়ুবিনাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দ্রোণী লবণ

ইহা ভেদক, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শূলঘ্ন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক এবং বিদাহী।

ঔষর লবণ

ঔষর লবণ—পিত্তজনক, মলসংগ্রাহক, ক্ষার, তিক্তরস, মূত্রকারক, বিদাহী, শোষকারক এবং কফবাতবিনাশক।

বিষ

বিষ তিন প্রকার যথা—স্থাবর, জঙ্গম ও গরবিষ।

প্রথমটি হইতে দশ প্রকার ও দ্বিতীয়টি হইতে ষোল প্রকার বিষ উদ্ভূত হইয়াছে। তৃতীয়টি বিরুদ্ধ ভোজনজনিত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা দুগ্ধ ও মৎস্য, মাংস বা দুগ্ধ ও টক দ্রব্য একত্র ভোজন।

স্থাবর বিষ

স্থাবর বিষ দশ প্রকার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যথা, শিকড়, পত্র, ফল, ফুল, ত্বক, বৃক্ষ বা গুল্মের আঠা, কাষ্ঠ, নির্য্যাস, ধাতু ও কন্দ। এই সকল বিষগুলির মধ্যে কন্দ বিষই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার বিষ আঠার প্রকার যথা—সক্তুক, মুস্তক, শৃঙ্গী, বালুক, সর্ষপ, বৎসনাভ, কুর্ম্ম, শ্বেত শৃঙ্গী, কালকুট, মেষশৃঙ্গী, হলাহল, দর্দ্দুর, কর্কট, মর্কট, গ্রন্থী, হরিদ্রা, রক্তশৃঙ্গ ও কেশর। এই আঠারটীর প্রথম আটটি নির্দ্দেশ অনুসারে ব্যবহৃত হয় অপর দশটী বর্জ্জনীয়।

সক্তুক

সক্তুক বা পুণ্ডরীক বিষ:—যে কন্দ বিষের মধ্যভাগ সক্তু নির্ম্মিত এবং শ্বেতবর্ণ তাহাকে সক্তু বিষ বলে। ইহা খুব উগ্র ও কার্য্যকরী।

মুস্তক

ইহার ক্রিয়া মন্দগতিতে হয়। ইহা দ্বারা ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

শৃঙ্গী

এই বিষকন্দ গোশৃঙ্গে বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধের বর্ণ রক্তবর্ণ হয়। এই কন্দ কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট।

বালুক (সৈকত)

বালুক বিষ কন্দের অভ্যন্তর বলুকাপূর্ণবৎ। ইহা দ্বারা জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

সর্ষপ

সর্ষপকন্দ হরিদ্রাবর্ণ এবং জ্বরঘ্ন। ইহার চুলের ন্যায় রোমরাজিই বিষাক্ত।

বৎসনাভ

এই বিষকন্দ দেখিতে গোবৎসের নাভির ন্যায়। ইহা পাঁচ অঙ্গুলী পরিমিত হয়। ইহা দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। প্রথম প্রকার শীঘ্র কার্য্যকরী, লঘু ও রেচক। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টটি বিপরীতগুণবিশিষ্ট। উভয় প্রকারই ঔষধ ও রসায়নে প্রযুক্ত হয়।

বৎসনাভের গুণ

অবসাদজনক, শূলঘ্ন ও অভিঘাত নাশক, বিসর্প ও বায়ুকফবৃদ্ধিজনিত রোগসবল, ত্রিদোষজ জ্বর, বাত ও হৃদ্‌রোগ সমূহে হিতজনক।

কূর্ম্ম

যে বিষকন্দ কূর্ম্মাকৃতি বিশিষ্ট তাহাকে কূর্ম্মকন্দ বলে।

শ্বেত শৃঙ্গ

শ্বেত শৃঙ্গ বা দার্ব্বিক দেখিতে শ্বেত বর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় অথবা সাপের ফণার ন্যায়। ইহা গরুর শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধের রং রক্তের ন্যায় হয়।

কালকূট

অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বিষতরু আছে। এই বৃক্ষের নির্য্যাসকে কালকূট বলে। ইহার আকৃতি ও বর্ণ কাকের চক্ষের ন্যায়। এই

বৃক্ষের কন্দ কৃষ্ণবর্ণ ও লেবুর ন্যায় গোলাকার। এই বিষ এত তীক্ষ্ণ যে কেবলমাত্র ইহার আঘ্রাণ করিলে মানবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গবেড়, মালয় এবং কঙ্কনের পাহাড়ে এই বিষ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

মেষশৃঙ্গী

ইহার আকার মেষের শৃঙ্গের ন্যায়। গরুর শৃঙ্গে এই বিষ বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

হলাহল

হলাহল বৃক্ষের ফল গরুর বাঁটের ন্যায়। ইহার একগোছা দল দেখিতে তাল পত্রের ছাতার ন্যায়। এই বিষবৃক্ষের নিকটে কোনপ্রকার বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। ইহা সাধারণতঃ কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয় ভারতবর্ষের দক্ষিণোপকূলে ও কঙ্কণে পাওয়া যায়। ইহার কন্দ অতিবিষের কন্দের ন্যায়। ইহার বহির্ভাগ শ্বেতবর্ণ এবং অন্তর্ভাগ নীলবর্ণ।

দার্দ্দূর

মলয় পর্ব্বত সন্নিধানে দার্দ্দূর নামক বিসবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মপুত্র ও কর্দ্দম নামেও অভিহিত হয়। ইহা কর্দ্দমের ন্যায় কপিলবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় বিষাক্ত।

কর্কট

কর্কট বিষ বানরের বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং আকৃতি কর্কটের ন্যায়। ইহার উপরে কতকগুলি রেখা দেখা যায় ঐ রেখার নিম্ন অংশ মৃদু এবং অন্য অপর অংশ কঠিন।

মূলক

ইহা একপ্রকার শ্বেতকন্দ বিষ। ইহার আকৃতি মূলা এবং কুকুরের দন্তের ন্যায়। ইহাকে যম দংষ্ট্রা এবং সৌরাষ্ট্র দেশজাত বলিয়া সৌরাষ্ট্রী বলা হইয়া থাকে।

গ্রন্থি

ইহা হরিদ্রাবর্ণের একপ্রকার কন্দ বিষ। ইহার বর্ণ কাল এবং ইহা অতিশয় বিষাক্ত।

হরিদ্রা

ইহা এক প্রকার কন্দ বিষ—ইহার কন্দ হরিদ্রার ন্যায়। বিরাট দেশে জন্ম বলিয়া ইহাকে বৈরাট ও বলা হইয়া থাকে। এই কন্দ বিষের উভয় প্রান্তভাগ গোলাকার। ইহার অন্তর্ভাগ হরিদ্রাবর্ণ।

রক্তশৃঙ্গী

এই কন্দবিষ গরুর নাসিকায় দিলে তাহার নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়। এবং ইহার আকৃতি গরুর স্তনের ন্যায়।

প্রদীপন

ইহা এক প্রকার কন্দ বিষ, ইহার আকার শুষ্ক আদ্রকের ন্যায় রক্তবর্ণ, ইহা শরীরে কোন স্থলে স্পর্শ করিলে সে স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠে।

বিষের ব্যবহার

কালকূটাদি দশপ্রকার বিষ রসকার্য্যে, বিষ প্রস্তুতে এবং লৌহ তাম্রাদি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণতকরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা কখনও ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। সক্তুক, মুস্তক, শৃঙ্গী, কালকূট, সর্ষপ, বৎসনাভ, কূর্ম্ম, শ্বেতশৃঙ্গ এই কয়েকটি বিষ, বিশেষরূপে শোধিত করিয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

বিষ বর্ণভেদে চারিপ্রকার—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ। ইহারা যথাক্রমে পরপর হীন গুণযুক্ত যথা শ্বেত হইতে রক্ত হীন ইত্যাদি।

শ্বেতবর্ণ বিষ রসায়ন, রক্তবর্ণ বিষ রসকার্য্যে প্রয়োজনীয়, পীতবর্ণ বিষ কুষ্ঠনাশক, কৃষ্ণবর্ণ বিষ মৃত্যুপ্রদ।

শ্বেতবর্ণ বিষ ঔষধে প্রয়োগ করিবে। রক্তবর্ণ বিষ বিষভক্ষণ জনিত বিকার নিবারণ জন্য প্রয়োগ করিবে। পীতবর্ণ বিষ ক্ষুদ্র রোগে প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ বিষ সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিবে।

বিষের সাধারণ দোষ।

বিষ—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম আশু, ব্যবায়ী, বিকাসী, বিসর, দুষ্পাচ্য। রুক্ষগুণ হেতু ইহা বায়ু প্রকোপক, উষ্ণ গুণ হেতু পিত্ত প্রকোপক এবং রক্তদুষ্টিকারক, তীক্ষ্ণ গুণ হেতু ইহা মোহ উৎপাদক এবং দেহ বন্ধন শিথিলকারী, সূক্ষ্মগুণ হেতু অতি শীঘ্র শরীরের সমস্ত অংশে ব্যাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে বিকল করে। আশুগুণ হেতু শীঘ্র প্রাণ নাশ করে। ব্যবায়ীগুণ হেতু পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়াই সমস্ত শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। বিকাসী গুণ হেতু ত্রিদোষ, সপ্ত ধাতু এবং মলকে নষ্ট করে। বিসর গুণ হেতু অধিক বিরেচণ করিয়া থাকে এবং লঘুপাকীগুণ হেতু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন ফললাভ হয় না। অবিপাকী গুণ হেতু বিষ দুর্জ্জর, এবং চিরকাল ক্লেশদায়ী। স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম এই তিন প্রকার বিষই এই সকল গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শীঘ্র প্রাণ নাশ করে।

স্থাবর বিষ সেবনজনিত দোষ।

স্থাবর বিষ সেবন করিলে জ্বর, হিক্কা দন্তহর্ষ, গলগ্রহ, লালাস্রাব, বমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

সহসা বিষ সেবনের ফল ঃ—সহসা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে

প্রথমে চর্ম্মের বিবর্ণতা তৎপর কম্পন উপস্থিত হয়, তৎপরে দাহ উপস্থিত হয়, তৎপর সর্বাঙ্গ বিকৃত হয়, তাহার পর মুখ হইতে ফেন, নির্গত হয়, তাহার পর স্কন্ধদ্বয় ভগ্ন হয়, তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ নিস্তব্ধ হয় এবং সর্ব্বশেষে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

বিষ সেবন জনিত বিকারের চিকিৎসা।

(১) বিষ ভক্ষণের পর বিকার উপস্থিত হইলে চিকিৎসক সর্ব প্রথমে রোগীকে বমন করাইবার চেষ্টা করিবেন। এই বমন কার্য্যে ছাগদুগ্ধ সেবন প্রশস্ত। যে পর্য্যন্ত না বমন আরম্ভ হয় সে পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। প্রত্যেকবার বমির পর পুনরায় ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না বমি বন্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। এইরূপে যখন দেখা যাইবে যে আর বমি হইতেছে না, তখন জানিবে যে রোগী বিষ বিমুক্ত হইয়াছে।

(২) বিষক্রিয়া হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবার চেষ্টা করিবে এবং বমন করাইতে করাইতে যে পর্য্যন্ত না পিত্ত নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত বমন করাইবে। এই বমন কার্য্যে শিলাপিষ্ঠ ময়নাফল সৈন্ধব লবণ ও রাই সরিষা বাঁটা, ছাগদুগ্ধ, মাছধোয়া জল সেবন করান প্রশস্ত। এইরূপ বমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রোগীকে বিরেচন করান আবশ্যক। বিরেচন কালে যে পর্য্যন্ত না আম নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত বিরেচন করাইবে। এইরূপে বিরেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে গব্য ঘৃত পান করাইবে। কারণ গব্য ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা বিষঘ্ন এবং জীবনীশক্তি বর্দ্ধক।

(৩) **নিম্নলিখিত যোগগুলি ব্যবস্থা করিলে সত্বর বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।** কাঁটা নটের রস ও হরিদ্রার (কাঁচা) রস একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

গন্ধনাকুলী (সর্পাক্ষি) অথবা সোহাগা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

পুত্রঞ্জীবের (জিয়াপুতা) রস লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। অথবা উক্তদ্রব্যদ্বয়কে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বিষ ক্রিয়া নষ্ট হয়।

(৪) **নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিষক্রিয়া নাশক।** ভার্তী, নীলী, ঈশ্বরীমূল, কাকমাচি, অপরাজিতা, ত্রিফলা, করবী, কুষ্ঠ, যষ্টিমধু, জীরা, সকল ক্ষীরবৃক্ষের ছাল, এলাচি, এবং গব্য ঘৃত।

(৫) অতিরিক্ত বিষ ক্রিয়া হইলে গব্যঘৃতের সহিত ভৃঙ্গরাজ, দধি, বজ্রক্ষার (বাজবৃক্ষের ক্ষার), অনন্তমূল, কাঁটানটের মূল, ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সেব্য। অথবা ঘৃতমধু সহ অর্জ্জুনছাল চূর্ণ সেব্য। অথবা সোহাগা ও কাঁটানটের মুলের রস মধুসহ সেব্য।

প্রশস্ত বিষের গুণ।

বিষ যথাশাস্ত্র প্রয়োগ করিলে মুমূর্ষু রোগীরও প্রাণ দান করে। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহণ ও বীর্য্যবর্দ্ধক। প্রশস্ত বিষে যে দোষ আছে তাহা শোধন করিলে অপগত হয়। সুতরাং সকল প্রকার বিষকে শোধন করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

কন্দ বিষের সংগ্রহকাল।

ফল পাকিলে কন্দবিষ গ্রহণ করিবে। ইহা টাট্‌কা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ কিছুদিন রৌদ্র বাতাস লাগিলে ইহার গুণ নষ্ট হয়।

সুতরাং ইহাকে সুপক্ক অবস্থায় গ্রহণ করিয়া, রাই সরিষার জলে বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া তদ্বারা জড়াইয়া রাখা আবশ্যক।

কন্দবিষের শোধন বিধি

(১) প্রথমতঃ কন্দবিষের ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ২৪ ঘণ্টা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে তাহাকে প্রবল রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই শোধিত হয়। শুষ্ক হওয়ার পর উহা গুঁড়া করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া ঔষধে ব্যবহার করা হয়।

(২) দোলাযন্ত্রে উক্ত বিষ ২৪ ঘণ্টা পাক করিলেও শোধিত হয়।

কন্দবিষের মারণ বিধি

সমপরিমিত শোধিত সোহাগার সহিত মর্দ্দন করিলে কন্দবিষ মারিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে সোহাগার শোধন বিধি

সোহাগাকে অগ্নিতাপে ফুটাইয়া খৈ করিয়া লইলে শোধিত হয়। সোহাগার সহিত মর্দ্দিত বিষ সেবন করিলে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

বিষ সেবন-যোগ্য পাত্র

বিষ যোগবাহী এবং রসায়ন। যে ব্যক্তি নিয়মিত রূপে ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করেন ও মিতাচারী এবং রসায়ন সেবনের নিয়মগুলি যথার্থরূপে পালন করেন, তিনি শোধিত বিষ সেবনের উপযুক্ত পাত্র।

বিষ সেবনের অযোগ্যপাত্র

যে ব্যক্তি ক্রোধশীল, যাহার পিত্তাধিক্য আছে, যিনি ক্লীব এবং ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত ও রুক্ষশরীরবিশিষ্ট, যাহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে, যিনি গর্ভিণী, এবং বালক ও বৃদ্ধ ইহারা সকলেই বিষ সেবনের অযোগ্য পাত্র।

বিষসেবনের নিয়ম

বিষসেবন করিবার পূর্ব্বদিবস রোগী অশ্বগন্ধা, গোজিহ্ব ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পারদভস্ম অথবা বদ্ধ পারদ (গন্ধকের সহিত) সেবন করিবে। পরদিবস হইতে বিষভক্ষণ আরম্ভ বিধেয়।

বিষসেবীর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়,—

(১) তিনি স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবেন—

(২) সুস্থচিত্তে ও চিন্তাশূন্য হৃদয়ে ভোজন করিবেন—

(৩) গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সংযুক্ত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবেন ও শীতলজল পান করিবেন।

(৪) তিনি ছাগরক্ত, জাঙ্গল্যপশুর মাংস, মদগুর মৎস্য ও চিনি, মধু, দুগ্ধ এবং যাবতীয় শীতবীর্য্য দ্রব্য এবং শাস্ত্রোক্ত হিতকর দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিবেন।

নিয়মিত রূপে নিত্য বিষসেবনে শরীর জরা ও ব্যাধি মুক্ত হইয়া সবল ও সুস্থ হয়। বিষসেবী সংযত হইয়া উল্লিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিবেন। শীত ও বসন্ত কালই বিষ সেবনের পক্ষে প্রশস্ত। বর্ষাকালে এবং দুর্য্যোগাদির দিনে কদাপি বিষ সেবন করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলে গ্রীষ্মকালেও বিষ সেবন করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে ইহা কদাপি সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

বিষসেবনের মাত্রা

শোধিতবিষ প্রথমদিবস এক সর্ষপ মাত্রায় সেব্য, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসের মাত্রা তিন সর্ষপ। নবমদিবসের মাত্রা চার সর্ষপ। দশম দিবস হইতে এক সর্ষপ করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ছত্রিশ সর্ষপ অর্থাৎ ১ রতি পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রা ব্যবহার বিধেয়। সুস্থ ব্যক্তি ১ যব বা ছয় সর্ষপ পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। কুষ্ঠরোগী প্রত্যহ ১ গুঞ্জা বা ছত্রিশ সর্ষপ

পরিমিত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রা সেবন করিবে। নিয়মিতরূপে এই বিষ ১ মাস সেবন করিলে অষ্টপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

বিষ এইরূপে ছয় মাস সেবন করিলে মানব পরম সৌন্দর্য্যবান হয়। ইহা এক বৎসর সেবনে সর্ব্বরোগ নাশ ও দুই বৎসর সেবনে দিব্য দেহ লাভ হয়।

বিষসেবনে পথ্য

বিষসেবন কালে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল হিতকর যথা :—ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, গোধূম, সিদ্ধ তণ্ডুল, মরিচ, সৈন্ধব, মিষ্টদ্রব্য ও শীতলজল। বিষ সেবীর শীতপ্রধান দেশ শীতঋতু ও শীতলজল উপকারী।

বিষসেবনে অপথ্য

বিষসেবী নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন যথা :—কটু, অম্ল, লবণ, তৈল, দিবানিদ্রা, অগ্নি ও রৌদ্র সেবা। বিষ সেবন কালে ঘৃত বিহীন অন্ন সেবন করিলে চক্ষুরোগ, চর্ম্মরোগ ও নানা প্রকার বায়ুরোগ জন্মে।

বিষের প্রয়োগ

বাতজ্বরে—দধি মস্তুরসহিত শোধিত বিষ সেব্য।

পিত্তজ্বরে—দুগ্ধের সহিত।

কফজ্বরে—ছাগমূত্রের সহিত।

ত্রিদোষজজ্বরে—ত্রিফলার জলের সহিত।

জীর্ণজ্বরে—লোধ, চন্দন, বচ, চিনি, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত।

সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, প্রমেহ ও চর্ম্ম রোগে—দন্তীমূল, ত্রিবিৎ, ত্রিফলা, ঘৃত ও মধু সহ।

বিষমজ্বরে (ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বরে)—শিখিকর্ণের (নীলকণ্ঠ বাসক) রসের সহিত।

রক্তপিত্তে—যষ্টিমধু, রাস্না, উশীর, উৎপল, এই সকল দ্রব্য একত্রে চাল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া বিষ সেবন করিবে। শ্বাস ও কাসে —রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও ত্রিকটু সহ সেব্য।

হিক্কায়—চিনি, দুগ্ধ, পারদভস্ম, প্রবালভস্ম ও যষ্টিমধুর সহিত সেব্য।

বমনেচ্ছায় বা ছর্দ্দিতে—দুগ্ধ, উশীর, মধু, যবক্ষার, হরিদ্রা ও কুটজের সহিত।

যক্ষ্মায়—চ্যবনপ্রাশের সহিত সেব্য।

গ্রহণী রোগে—মুথা, ইন্দ্রযব, পাঠা, চিতা, ত্রিকুট, অতিবিষা ধাইফুল, মোচরস, আমের আঁটির শস্য সহযোগে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—হরীতকী, চিতামূল, দ্রাক্ষা, বাসক, ও হরিদ্রা সহ।

অশ্মরী ও উদাবর্ত্তে—শিলাজতু ও ত্রিকটু সহযোগে এবং গোমূত্র সৈন্ধব লবণ ও পাথরকুচির পাতার রসের সহিত বিষ মর্দ্দন করিয়া সেব্য।

গুল্মে—সর্জ্জিক্ষার ও ত্রিফলার সহিত।

শূলে—পিপুল চূর্ণের সহিত।

প্লীহা বৃদ্ধিতে—দন্তী, রাস্না, দ্রাক্ষা, শঠী, পিপ্পলী, অতিবিষা, বিড়ঙ্গ, মৌরি ও যবক্ষারের সহিত অথবা, গুলফা বিড়ঙ্গ ও দুগ্ধের সহিত।

কুষ্ঠে—কাকমাছির রসের সহিত।

জঙ্গম বিষ।

সর্ব্ব প্রকার জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্প বিষই ঔষধার্থে সমধিক প্রযোজ্য। একটি বলবান—যুবা কৃষ্ণ সর্প (কেউটে) হইতে বিষ গ্রহণ করিবে। বৃদ্ধ কৃষ্ণসর্প বা অন্য সর্পের বিষ ঔষধার্থে গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণ সর্প বিষ ত্রিদোষ নাশক, অগ্নি বর্দ্ধক, সন্নিপাত, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে মুমূর্ষু ব্যক্তির ইহা জীবন দান করে।

জঙ্গম বিষের শোধন বিধি।

১) তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে সর্প বিষ শোধিত হয়।

(২) খাটি সরিষার তৈলে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিলেও সর্পবিষ শোধিত হয়।

(৩) তাম্বুল, বকফুল, তুলসী পত্র এবং কুষ্ঠের ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিলে সর্পবিষ শোধিত হয়।

জঙ্গম বিষ সেবন জনিত বিকার।

জঙ্গমবিষ সেবন করিলে নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লম, দাহ, ফেননির্গম, শোথ, লোমহর্ষ, অতিসার প্রভৃতি বিকার উপস্থিত হয়।

সর্প দংশনের প্রতিকার।

জয়পাল বীজের শস্যকে ২১ দিন লেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। সেই বটিকা মনুষ্যের লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি জীবন লাভ করে। (মৎ প্রণীত বিষ চিকিৎসা নামক গ্রন্থে এ বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে)।

উপবিষ।

স্নুহী, অর্ক, লাঙ্গলী, করবী, গুঞ্জা বিষমুষ্টি, ধুতুরা, জয়পাল, ভল্লাতক, নির্ব্বিষা, অতিবিষা, অহিফেন, জয়া (ভাঙ্গ) এই গুলির নাম উপবিষ। অতিমাত্রায় সেবিত হইলে ইহারাও প্রাণ নাশ করে।

সর্ব্ব প্রকার বিষ ও উপবিষের দ্বারা মর্দ্দিত হইলে পারদ পঙ্কহীন হয় অর্থাৎ তাহার ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে। **এরূপ পারদ দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত হইলে স্বর্ণ পারদের সহিত নিঃশেষরূপে মিশিয়া যায়।**

কেবলমাত্র শোধিত পারদের দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত হইলে উহার সহিত স্বর্ণ মিশ্রিত হয় না। কারণ কেবলমাত্র শোধিত পারদের ধাতুগ্রাসন শক্তি থাকে না।

উপবিষ শোধনের সাধারণ বিধি।

(১) পঞ্চগব্যের ভাবনা দিলে সর্ব্বপ্রকার উপবিষ শোধিত হয়। (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র, ইহাদিগকে পঞ্চগব্য বলে)।

(২) দোলাযন্ত্রে দুগ্ধসহ এক প্রহর পাক করিলে সর্ব্বপ্রকার উপবিষ শোধিত হইয়া থাকে।

স্নুহী।

স্নুহী (বাজবৃক্ষের আঠা) বিরেচক, তীব্র, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠিলা, বাতোদর, কফ, গুল্ম, উন্মাদ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, স্ফোটক, জ্বর, প্লীহা, বিষ, ব্রণ ও দূষীবিষ নষ্ট করে।

স্নুহীক্ষীর উষ্ণবীর্য্য, কটু, লঘু, এবং স্নিগ্ধ। গুল্ম, কুষ্ঠ এবং উদর-রোগেও বিরেচন ক্রিয়ায় প্রশস্ত।

স্নুহীক্ষীরের শোধন।

এক তোলা তেঁতুল পাতার রসে আট তোলা স্নুহীক্ষীর মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে উহা শোধিত হইয়া থাকে। এইরূপে অর্কক্ষীর ও শোধিত হইয়া থাকে।

অর্ক।

অর্ক দুইপ্রকার শ্বেতপুষ্প ও রক্তপুষ্প। উভয় প্রকারের অর্কই বিরেচক, বায়ু, কুষ্ঠ, দদ্রু, বিষ, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ উদররোগ এবং ক্রিমিনাশক। শ্বেত অর্কপুষ্প বৃষ্য, লঘু, পাচক, অরুচি, শ্লেষ্মা, অর্শ, কাস, ও শ্বাসনাশক।

রক্ত অর্কপুষ্প মধুর-রস, তিক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, অর্শ, বিষ ও রক্ত পিত্তনাশক। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, গুল্মে এবং জলোদরে বিশেষ উপকারক।

লাঙ্গুলী

লাঙ্গুলী বিরেচক, কুষ্ঠ, জলোদর, অর্শ, স্ফোটক এবং শূলরোগে উপকারক। ইহা ক্ষার বিশিষ্ট, ক্রিমি ও কাস নাশক। ইহা তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকর এবং গর্ভনাশক।

লাঙ্গুলীর শোধন

গোমূত্রে একদিন ভিজাইয়া রাখিলে লাঙ্গুলী শোধিত হয়।

গুঞ্জা

শ্বেত ও রক্তভেদে গুঞ্জা দুই প্রকার। উভয় প্রকার গুঞ্জাই কেশের পক্ষে হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত ও জ্বরনাশক। উহারা মুখশোষ, শীরো-ঘূর্ণন, শ্বাস, মদাত্যয়, এবং চক্ষুরোগ নাশক। উহারা স্ফোটক, দদ্রু, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠনাশক। উভয় প্রকার গুঞ্জার মূল এবং শ্বেত গুঞ্জার বীজ বমিকারক। উভয় প্রকার গুঞ্জাই শূলে এবং বিষদোষে উপকারক।

গুঞ্জার শোধন

উভয় প্রকার গুঞ্জাই ৩ ঘণ্টা কাঁজিতে সিদ্ধ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

শ্বেত গুঞ্জার ব্যবহার

বিষাক্ত শস্ত্রঘারা উৎপন্ন ব্রণ, শ্বেতগুঞ্জার পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিলে এবং ঐ পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

করবী

পুষ্পের বর্ণভেদে করবী পাঁচ প্রকার যথা :—শ্বেত, রক্ত, পীত, পাটল ও কৃষ্ণ। সর্ব্বপ্রকার করবীই তিক্ত, কষায়, কটু, ব্রণনাশক, নেত্ররোগ,

কুষ্ঠ ও কণ্ঠরোগে হিতকারী। তাহারা উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি ও রক্তরোগে হিতকর। শ্বেত, পীত ও রক্ত করবী ঘোটক মারক। পাটল বর্ণের করবী শিরোরোগ নাশক এবং বায়ু ও কফ নাশক। পূর্বদিকে জাত শ্বেত করবীর মূল সর্পবিষনাশক। গোদুগ্ধে দোলাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিলে করবী শোধিত হয়।

বিষমুষ্টি। (কুঁচিলা)

কুঁচিলা শীতবীর্য্য, তিক্ত, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক মত্ততাজনক, লঘু, অতিশয় বেদনার শান্তি কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও রক্তপিত্তঘ্ন।

বিষমুষ্টির শোধন বিধি

দুই প্রহর দোলাযন্ত্রে কাঁজিতে বা গোময় জলে পাক করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে বিষমুষ্টি শোধিত হয়।

ধুস্তুর

ধুস্তুর মত্ততাকারক, বর্ণ, ক্ষুধা ও বায়ু বৃদ্ধিকারক। ইহা জ্বর ও কুষ্ঠনাশক। ইহা কষায়মধুর, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহা উৎকুন, ফোড়া, শ্লেষ্মা, দদ্রু, ক্রিমি, কণ্ডু ও বিষনাশক।

ধুস্তুরের শোধন

চারপ্রহর কাল গোমূত্রে স্থির করিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা খলে নিস্তুষ করিলে ধুস্তুর শোধিত হইয়া থাকে।

জয়পাল

জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক, পিত্তকফনাশক। অশুদ্ধ অবস্থায় বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে ইহা প্রাণ নাশ করে।

জয়পালের শোধন

জয়পালের খোসা ছাড়াইয়া দুগ্ধে বা মহিষের বিষ্ঠা মিশ্রিত জলে দোলা যন্ত্রে ১ দিন সিদ্ধ করিয়া লইয়া [illegible] অংশ ফেলিয়া দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহা শোধিত হইয়া থাকে। [illegible]

জয়পালকে লেবুর রসে ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

ভল্লাতক

ভল্লাতক ফল বিপাকে মধুর, লঘু, কষায় রস, পাচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ছেদি, বিরেচক, মেদনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধিকর, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মা, বায়ু, ব্রণ, উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম, গ্রহণী, জলোদর, বদ্ধবায়ু, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। ভল্লাতকের বোঁটা (বৃন্ত) মধুর, পিত্ত নাশক, কেশ প্রসাধক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর। উহা উষ্ণ, শুক্র বৃদ্ধিকর, কফ ও বায়ুনাশক, সর্বপ্রকার উদররোগ, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী গুল্ম, জ্বর, শ্বেতকুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণনাশক।

ভল্লাতক কে থেৎলা করিয়া সুর্কীর মধ্যে দুই দিন রাখিয়া ধুইয়া লইলে শোধিত হয়।

নির্ব্বিষা

ইহা মুথার ন্যায় একপ্রকার ঘাস। ইহা জমির আইলের ধারে ধারে জন্মায়। ইহা কটু, শীতল, ব্রণ রোপক, শ্লেষ্মা, বায়ু, রক্তদুষ্টি এবং নানাপ্রকার বিষদোষ নাশক।

ইহার মুল গ্রহণ করিয়া কপালে তিনবার বুলাইলে তৎক্ষণাৎ শিরোব্যথা দূর হয়।

অতিবিষা

ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, পাচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্ত, অতিসার বিষ, আম ও বমি নাশক। অতিবিষা ও নির্বিষা দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

অহিফেন

ইহা তিক্ত, মত্ততা, ও নিদ্রা কারক, বেদনা নাশক ও আক্ষেপন (খিল ধরা) নাশক, স্পর্শশক্তি বিনাশক, কফ ও শ্বাস নিবারক, ক্ষুধা

বর্দ্ধক, এবং বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধি কারক, ধাতু শোষক, রুক্ষতা কারক; দাহ এবং মেহ বর্দ্ধক। অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গ্রহণী ও অতিসারে হিতকর। স্বাস্থ্য ও সুখ ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে হইলে অধিক দিন অহিফেন সেবন করা উচিত নয়।

আদার রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ইহা শোধিত হয়।

জয়া (সিদ্ধি)

জয়া কফ নাশক, তিক্ত, ক্ষুধাবর্দ্ধক, লঘু, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্দ্ধক, প্রমেহ, মত্ততা, বাক্‌শক্তি, মৈথুনেচ্ছা, নিদ্রা ও হাস্য কারক। ইহা ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, মদাত্যয়, অতিরজঃ ও সুতিকা রোগে হিতকর।

জয়ার শোধন

বাবলা ছালের ক্কাথে সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিয়া গোদুগ্ধে ভাবনা দিলে ইহা শোধিত হয়। অথবা গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিলে শুদ্ধ হয়।

উপবিষ বিকারের শান্তি

অহিফেন—(১) ৪ তোলা কাঁটানটে মূলের রস সেবন করিলে অহিফেন সেবন জনিত বিকারের শান্তি হয়।

(২) সৈন্ধব লবণ পিপুল ও মদনফল বাঁটিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে উক্ত বিকার নষ্ট হয়।

(৩) সোহাগা ও তুঁতে ঘৃতসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রচুর পরিমাণে বমি হইয়া অহিফেন সেবন জনিত বিষের শান্তি হয়।

ধুতুরা—(১) ৪ তোলা বেগুণের রস সেবন করিলে ধুতুরা সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

(২) কার্পাস বীজ ও ফুলের ক্কাথ অথবা লবণ মিশ্রিত জল পান

করিলে অথবা /১ দুগ্ধ ৮ তোলা চিনি সহ পান করিলে ধুতুরা বিষ নষ্ট হয়।

ভল্লাতক—মাখনের সহিত মেঘনাদের রস মালিস করিলে অশুদ্ধ ভল্লাতক সেবন ও স্পর্শ জনিত শোথ নষ্ট হয়। অথবা দেবদারু, মুথা সর্ষপ ও মাখন একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে ভল্লাতক সেবন জনিত বিকার শান্তি হয়। অথবা মাখন, তিল বাঁটা, দুধ ও ঝোলাগুড় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অশুদ্ধ ভল্লাতক সেবন ও স্পর্শ জনিত শোথের শান্তি হয়।

জয়া—শুঁঠচূর্ণ দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সিদ্ধি সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

গুঞ্জা—চিনি ও দুগ্ধের সহিত মেঘনাদের রস সেবন করিলে গুঞ্জা সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয় অথবা মধু, খর্জ্জুর, তেঁতুল, দ্রাক্ষা, অম্ল-দাড়িম ও আমলকী একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উক্ত বিকার নষ্ট হয়।

করবী—আকন্দের ছাল, দধি ও মিছরী একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে করবী বিষ নষ্ট হয়।

স্নুহী—(১) মিছ্‌রী ভিজান শীতল জল পান করিলে অথবা তেঁতুল পাতা বাঁটিয়া সেবন করিলে স্নুহী বিষ নষ্ট হয়।

(২) গিরিমাটি জলে ঘষিয়া সেবন করিলে আকন্দ ও স্নুহী বিষ নষ্ট হয়।

জয়পাল—চিনি ও দধির সহিত ধনে বাঁটিয়া সেবন করিলে জয়পাল সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

গুগ্‌গুলু—গুগগুলুর কেশ মলাদি বিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে উষ্ণ দশমূলের কাথে নিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য তাপে শুকাইয়া ঘৃতাক্ত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ইহাতে গুগ-

গুগ্‌গুল বিশোধিত হয়। অথবা গুলঞ্চের কাথে নিষিক্ত করিয়া সূর্য্য তাপে শুষ্ক করিয়া লইলেও ইহা শুদ্ধ হয়। কিংবা গুগ গুলুকে গোদুগ্ধে বা ত্রিফলা ক্কাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

বিদ্ধড়ক বীজ ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে অথবা অপামার্গের ক্কাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। অথবা দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বিদ্ধড়ক বীজ শোধিত করিবে। লেবুর বীজ, সজিনা বীজ, কার্পাস বীজ, অপমার্গ বীজ ও অপ-মার্গের ক্কাথে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। কিন্তু ইহাতে লবণ দিতে হইবে না। কটুকী, শ্বেতঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখাল শশার বীজ, তিক্তলাউবীজ, কাকঠটীবীজ ও মাকালফল ইহারা আমলকীর রসে এবং করঞ্জবীজ ও নাটাকরঞ্জবীজ ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত হইয়া থাকে।

যন্ত্র পরিচয়

দোলা যন্ত্র—একটী হাঁড়ির অর্দ্ধভাগ দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখের দুই পার্শ্বে ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্র পথে একটী দণ্ড প্রবেশ করাইয়া, সেই দণ্ডে দ্রব্য পোটলী ঝুলাইয়া বাঁধিবে, এইরূপ স্বেদন যন্ত্রকে দোলা যন্ত্র বলে।

স্বেদনী যন্ত্র—একটী জলপূর্ণ হাঁড়ির মুখে একখণ্ড বস্ত্র বাঁধিবে এবং তাহার উপর পাকের বস্তু রাখিয়া, সর্ব্বোপরি একখানি সরা আচ্ছা-দন দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদনী যন্ত্র বলা হয়।

ঊর্দ্ধ পাতন যন্ত্র—দুইটী ভাণ্ড দ্বারা পাতনা যন্ত্র প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে উপরের ভাণ্ডটী জলাধার; ইহার গলদেশের নিম্নভাগ আট অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট, দশ অঙ্গুলি বিস্তার ও চারি অঙ্গুলি উচ্চ হওয়া

আবশ্যক। এই ভাণ্ডটী যোড়ষাঙ্গুলি বিস্তৃত পৃষ্ঠ দেশ বিশিষ্ট অপর একটী ভাণ্ডের মুখে বসাইয়া উভয়ের সন্ধিস্থল মহিষী দুগ্ধ, মণ্ডুর চূর্ণ ও মাৎগুড় দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ঐ নিম্নের ভাণ্ডটীর মধ্যে পারদ রাখিতে হয় এবং উপরের ভাণ্ডে জল থাকে। এই যন্ত্র চুল্লীতে বসাইয়া জাল দিলে, নিম্ন ভাণ্ডস্থ পারদ ঊর্দ্ধ গত হইয়া উপরের ভাণ্ড তলে সংলগ্ন হয়। ইহাকেই পাতনা যন্ত্র বলে। (উপরিস্থ ভাণ্ডের জল উত্তপ্ত হইলেই তাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক)।

অধঃ পাতন যন্ত্র—এইয যন্ত্রের উপরিস্থ পাত্রের মধ্য দেশে পারদ লিপ্ত করিতে হয়, এবং সেই পাত্রটী আর একটী জলপূর্ণ পাত্রের উপর উবুড়ভাবে বসাইয়া সংযোগ স্থল পূর্ববৎ বদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই উপরিস্থ পাত্রের উপর বন ঘুটে জ্বালিয়া তাপ দিলে, উপরের পারদ নিম্নস্থ হাঁড়ির জলে পতিত হয়। ইহার নাম অধঃপাতন যন্ত্র।

কচ্ছপ যন্ত্র—একটী জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একখানি খাপরা রাখিয়া, তাহার উপরে বিড় মিশ্রিত পারদ কোষ্ঠীকাযন্ত্রে করিয়া স্থাপন করিবে এবং তাহার উপর একখানি পাতলা লৌহ কটোরা আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থলে ছয় বার উত্তম রূপে লেপ দিবে। তৎপরে পূর্বোক্ত জল-পাত্রের চারিধারে খদির বা কুল কাঠের অঙ্গার জ্বালিয়া দিবে। মর্দ্দিত পারদ এইরূপে কচ্ছপ যন্ত্র মধ্যে সিন্ন হইয়া জারিত হয়। অন্যান্য সত্ত্বও এইরূপ প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হয়।

দীপিকা যন্ত্র—কচ্ছপ যন্ত্রের মধ্যদেশে একট প্রদীপ রাখিয়া সেই প্রদীপে পারদ রাখিবে। তৎপরে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে, সেই পারদ কচ্ছপ যন্ত্র মধ্যে পতিত হইবে। ইহাকে দীপিকা যন্ত্র বলে।

ঢেকী যন্ত্র—একটি ভাণ্ডের কণ্ঠদেশের নিম্নে একটি ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্রে একটি বাঁশের নলের এক মুখ প্রবেশ করাইবে। দুইটি কাংস্য পাত্রের মধ্যে জল পুরিয়া সম্পুট করতঃ তাহাতেও একটি

ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্রপথে পূর্বোক্ত নলের অপর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। যথোপযুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত পারদ সেই ভাণ্ডে রাখিবে এবং উভয় পাত্রের সংযোগস্থল গুলি দৃঢ় রূপে বন্ধ করিতে হইবে। তৎপরে সেই ভাণ্ডের নীচে অগ্নিতাপ দিলে ভাণ্ডস্থ পারদ ঐ নল দ্বারা কাংস্য পাত্রস্থ জলে আসিয়া পতিত হইবে। কাংস্য পাত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ বোধ হইবে, ততক্ষণ তাহার মধ্যে পারদ পতিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই যন্ত্র ডেকী নামে বর্ণিত হয়।

জারণা যন্ত্র—দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি লৌহের মুষা প্রস্তুত করিয়া, তাহার একটিতে অল্প ছিদ্র করিবে। সেই ছিদ্রযুক্ত মুষাতে গন্ধক এবং অপরটিতে পারদ রাখিবে। গন্ধকের মুষাটি পারদের মুষার উপর স্থাপন করিয়া সন্ধি বন্ধ করিবে। পারদ ও গন্ধক উভয় দ্রব্যই বস্ত্র গালিত রসুন রস দ্বারা আপ্লাবিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই মুষাদ্বয় রুদ্ধ করিয়া একটি জলপূর্ণ হাঁড়ীতে রাখিবে ও তাহার উপর আর একটী হাঁড়ী আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকা ও বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে লিপ্ত করিবে। অতঃপর কপোত পুটের মধ্যে সেই যন্ত্র নিহিত করিয়া তাহার নীচে ও উপরে বন ঘুটের আগুণ জ্বালিয়া দিবে। অথবা চুল্লীর উপর বসাইয়া নীচে তীব্র জ্বাল দিতে থাকিবে। তিন দিন জ্বাল দেওয়ার পর, যখন চুল্লী ও হাঁড়ীর জল আপনা হইতে শীতল হইবে, সেই সময়ে যন্ত্র উন্মুক্ত করিতে হইবে। চুল্লী ও জল উত্তপ্ত থাকিতে শীতল ক্রিয়া করিবে না। উহা আপনা হইতে শীতল হইলে যন্ত্রস্থিত পারদ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বা তাহা উড়িয়া যায় না; এই নিয়মে গন্ধকেরও জারণ হয়।

বিত্তাধর যন্ত্র ও কণ্ঠীকা যন্ত্র—একটী হাঁড়ীর উপর আর একটি হাড়ী উপুড় করিয়া দিয়া সন্ধিস্থল প্রলিপ্ত করিলে তাহাকে বিত্তাধর যন্ত্র বলে। ইহা চতুর্ম্মুখ চুলীর উপর বসাইয়া জ্বাল দিতে হয়। নিম্নস্থ ভাণ্ডে ঔষধ

রাখিয়া, উভয় ভাণ্ডের মুখবন্ধ করিবে। ইহাকে কোষ্ঠীকাযন্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়।

সোমানল যন্ত্র—উপরে অগ্নি ও নীচে জল রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে পারদ পাক করিলে, তাহা সোমানল যন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অভ্রাদিও জারিত হয়।

গর্ভযন্ত্র—পিষ্টিকা ভস্ম করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকা দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত মুষা প্রস্তুত করিয়া তাহার মুখটি গোলাকার করিতে হইবে। কুড়ি ভাগ লৌহ ও একভাগ গুগগুলু মসৃণ রূপে মর্দ্দিত করিয়া, তাহার দ্বারা মুষাটি বার বার লিপ্ত করিবে। পরিশেষে অর্দ্ধভাগ লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা ও জল দ্বারা লেপ দিবে। অতঃপর সেই মুষার মধ্যে পারদাদি রুদ্ধ করিয়া, ভূমিগর্ভে তুষাগ্নি দ্বারা মৃদু স্বেদ দিতে হইবে। অহোরাত্র বা তিনরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ স্বিন্ন করিলে, পারদ ভস্মে পরিণত হয়।

হংসপাক যন্ত্র—একখানি খাপড়া বালুকা পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর আর একখানি খাপরা বসাইবে। তাহাতে পঞ্চক্ষার, মূত্র, লবণ বা বিড় দ্রব্য সহ পাচ্য পদার্থ স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। বার্ত্তিক-কারগণ ইহাকে হংস যন্ত্র কহেন।

বালুকা যন্ত্র—একটি গূঢ়মুখ কাচকুপীর গাত্রে মৃত্তিকার ও বস্ত্র দ্বারা এক অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। এই কারচুপীর দুই তৃতীয়াংশ পারদাদি পাচ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই কাচ কুপি বিতস্তি গভীর বালুকা পূর্ণ একটি ভাণ্ডে নিহিত করিবে এবং ভাণ্ডের শূন্য বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, ভাণ্ডের উপরে একখানি আচ্ছাদন দিবে ও সন্ধিস্থল মৃত্তিকা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ড চুল্লীতে স্থাপন করিয়া জাল দিতে হইবে, উপরের আচ্ছাদনের পৃষ্ঠে তৃণ নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ তাহা দগ্ধ না হইবে ততক্ষণ জাল দেওয়া আবশ্যক, ইহাকেই বালুকা যন্ত্র বলে।

বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ পূর্ণ করিলে তাহা লবণ যন্ত্র নামে অভিহিত হয়। ভাণ্ডে পাঁচ আঢ়ক বালুকাপূর্ণ করিয়া তাহাতে রস গোলকাদি পাক করিলে, তাহাকেও বালুকা যন্ত্র বলা যায়।

লবণ যন্ত্র—বালুকা যন্ত্রে বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ পূর্ণ করিলে তাহাকে লবণ যন্ত্র বলা হয়।

তাম্র পাত্র মধ্যে পারদ প্রলিপ্ত করিয়া, সেই পাত্রের মুখে আচ্ছাদন দিয়া মত্তিকা ও লবণ দ্বারা তাহার সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ তাম্র পাত্র একটি ভাণ্ডে নিহিত করিয়া, ভাণ্ডটি লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে তাহার নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। ইহার লবণ যন্ত্র। পারদ সংস্কার কার্য্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নালিকা যন্ত্র—একটি লৌহ নির্ম্মিত নলের মধ্যে পারদ নিহিত করিয়া তাহা লবণ পূর্ণ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ পাককরিবে। ইহাকে নালিকা যন্ত্র বলে।

ভুধর যন্ত্র—একটি গর্ত্ত বালুকাপূর্ণ করিয়া সেই বালুকার মধ্যে রসযুক্ত মূষা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর বন ঘুঁটের আগুণ জ্বালিয়া দিলে তাহা ভুধর যন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

পুট যন্ত্র—একখানি শরায় পাচ্য দ্রব্য রাখিয়া তাহার উপর আর একখানি শরা উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রোধ করিবে। ইহারই নাম পুট যন্ত্র। চুল্লী মধ্যে বন ঘুটের আবরণ দিয়া পুট যন্ত্র স্থিত পারদ দুই প্রহর কাল পাক করিতে হয়!

কোষ্ঠী যন্ত্র ও খলচরী (খেচরী) যন্ত্র—ধাতু সমূহের সত্ত্ব পাতনার্থ কোষ্ঠী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা একহস্ত দীর্ঘ ও ও ষোল অঙ্গুলি বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। দুইটি লৌহময় পাত্র প্রস্তুত

করিয়া তাহাতে একটি বলয় (বেড়) করিতে হইবে। একটি পাত্রের বলয় মধ্যে আর একটি পাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ ভাবে পাত্র দুইটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র পাত্রটিতে মুর্চ্ছিত পারদ রাখিয়া, সেই পাত্র বড় পাত্রটির মধ্যে বসাইবে এবং বড় পাত্রটি কাঁজির দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহারই নাম কোষ্ঠীকাযন্ত্র। দুই প্রহর কাল এই যন্ত্রে স্বিন্ন করিলে, পারদ উত্থাপিত হয়। ইহা খেচরী যন্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রপাক দ্বারা পারদের বড়গুণতা সম্পাদিত হয়। সূক্ষ্ম কান্ত লৌহেব হইলে পারদ অধিকতর গুণশালী হইয়া থাকে।

তির্য্যক পাতন যন্ত্র—একটী কলসের মুখে বক্রীকৃত নলের একমুখ সংযুক্ত করিবে এবং সেই নলের অপর মুখ আর একটি কলসের কুক্ষি দেশ ছিদ্র করতঃ তাহাতে প্রবিষ্ট করাইবে। ঘটদ্বয়ের মুখও নল সংযুক্ত স্থানগুলি মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহারই নাম তির্য্যকপাতন যন্ত্র। ইহারই একটি কলসে পারদ এবং অপর কলসে স্বাদু শীতলজল রাখিতে হয়। পারদের কলসের নীচে তীব্র তাপ দিলে সেই পারদ উত্থিত হইয়া নল দ্বারা অপর কলসে জল আসিয়া পতিত হয়।

পালিকা যন্ত্র—একটি লৌহনির্মিত গোলাকার পান পাত্রে উর্দ্ধভাবে একটি অবনতাগ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলে, তাহা পালিকা যন্ত্র নামে বর্ণিত হয়। গন্ধক জারণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ঘট যন্ত্র—চারিপ্রস্থ জলধারণের উপযুক্ত এবং চারি অঙ্গুলি পরিমিত মুখবিশিষ্ট ঘট বিশেষের নাম ঘট যন্ত্র। ইহা আপ্যায়ন যন্ত্র নামেও অভিহিত হয়।

ইষ্টকা যন্ত্র—একটি গোলাকার গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে এক খানি শরা বসাইবে। গর্ত্তের চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া একটি

বেড় দিতে হইবে। একটী ইষ্টক খণ্ডের মধ্য স্থলে একটী গর্ত্ত করিয়া সেই ইষ্টক খানি ঐ শরার মধ্যে নিহিত করিবে। ইষ্টক মধ্যস্থ গর্ত্তে পারদ রাখিয়া তাহার উপর একখণ্ড বস্ত্র এবং বস্ত্রের উপর গন্ধক দিতে হইবে। তৎপরে আর একখানি শরা উপুড় করিয়া আচ্ছাদন দিবে এবং শরার ও গর্ত্তপার্শ্বস্থ বেড়ের সংযোগ স্থল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম ইষ্টকা যন্ত্র বনঘুটের আগুণে কাপোত পুটে (মৃদু জ্বালে) ইহা পাক করিতে হয়। এই যন্ত্রে গন্ধক জারণ ও সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধর যন্ত্র—একটী হাঁড়ীতে হিঙ্গুল রাখিয়া তাহার উপর আর একটী বসাইয়া সংযোগ স্থল রুদ্ধ করিবে। উপরের হাঁড়ীতে জল এবং নীচের হাঁড়ীতে জাল দিতে হইবে। ইহাকে হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধর যন্ত্র বলে। উপরের হাঁড়ীর জল উত্তপ্ত হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া শীতল জল পূর্ণ করা আবশ্যক।

ডমরু যন্ত্র—একটী হাঁড়ীর উপর আর একটী হাঁড়ী উপড় ভাবে বসাইয়া সংযোগস্থল রুদ্ধ করিলে ডমরু যন্ত্র বলা যায়। ইহা পারদ ভস্ম করিতে ব্যবহৃত হয়।

নাভি যন্ত্র—একখানি শরার অভ্যন্তরে চারিদিকে মৃত্তিকা দিয়া মধ্যস্থলে গর্ত্তাকার করিবে, তন্মধ্যে পারদ ও গন্ধক রাখিয়া তাহার চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ বেড় দিবে এবং তাহার উপর গোস্তনাকৃতি একটী মূষা আচ্ছাদন করিয়া জল ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। বাবলার ক্বাথ লেহবৎ ঘন করিয়া তাহার সহিত জীর্ণ কিট্টের (মণ্ডুরের) সূক্ষ্ম চূর্ণ, গুড় ও চুণ এই সকল পদার্থ মর্দ্দন করিলে তাহা জলমৃৎ নামে অভিহিত হয়। এই পদার্থের প্রলেপ দিলে

তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। খড়ি, লবণ ও মণ্ডুর মহিষী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিলে, তাহাকে বহ্নি মৃৎস্না বলে।

এই বহ্নি মৃৎস্না দ্বারা প্রলেপ দিলে, তাহা তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারে। এই বহ্নি মৃৎস্না দ্বারা রুদ্ধ হইলে পারদ নির্গত হইতে পারে না। উক্তরূপে মূষার সংযোগস্থল রুদ্ধ করিয়া, সেই শরায় জল নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার নিম্নে তাপ দিবে (অগ্নিজ্বাল দিবে)। ইহাকে নাভি যন্ত্র বলে। এই যন্ত্র দ্বারা পারদ জীর্ণ হয় এবং গন্ধক ধূমহীন ও শুদ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রস্তযন্ত্র—একটী মূষা অপর একটী মূষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে ; উভয় মূষারই আদ্যন্ত অবয়ব গোলাকার হইবে। কেবল তলভাগ চ্যাপ্টা করিতে হইবে। ইহাকে গ্রস্তযন্ত্র বলা হয়। পারদ বন্ধনার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্থালীযন্ত্র—একটা হাঁড়ীতে তাম্রাদি ধাতু নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মুখে আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিবে এবং হাঁড়ীর নিম্নদেশে অগ্নি জ্বাল দিবে। ইহার নাম স্থালীযন্ত্র।

ধূপযন্ত্র—আট অঙ্গুলি পরিমিত এবং আট অঙ্গুলি উন্নত একটী লৌহ পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার কণ্ঠদেশের অধোভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জলাধার স্থাপন করিয়া তদুপরি কয়েকটী সূক্ষ্ম লৌহশলাকা তির্য্যগভাগে স্থাপিত করিবে এবং সেই জলাধারের নিম্নে ধূপন পদার্থ নিহিত করিবে। সেই সকল শলাকার উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র স্থাপন করিয়া, আর একটী পাত্র উপুর ভাবে আচ্ছাদন দিবে এবং সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে লৌহ পাত্রের তলদেশে অগ্নি জ্বাল দিতে হইবে। এইরূপ বিধানে সমুদয় স্বর্ণপত্র জারিত হইবে। অর্থাৎ তৎ সংলগ্ন পারদ উড়িয়া যাইবে এবং স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়া পাত্রগর্ভে পতিত হইবে।

গন্ধক, হরিতাল, ও মনঃশিলার কজ্জলী অথবা জারিত সীসক, এই কয়েকটী পদার্থ স্বর্ণপত্রের ধূপনার্থ প্রশস্ত। রৌপ্য জারণার্থ রৌপ্যের পত্রে জারিত বঙ্গের অথবা উপযুক্ত মত অন্য উপরস সমূহের ধূপ প্রদান করিতে হয়। ইহাকে ধূপযন্ত্র কহে। জারণ ক্রিয়া সাধনের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

কন্দুক যন্ত্র—একটী স্থূল হাঁড়ী জলপূর্ণ করিয়া মুখে একখণ্ড বস্ত্র দৃঢ়রূপে বান্ধিবে। সেই বস্ত্রখণ্ডের উপরে স্বেদ্য বস্তু স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী আচ্ছাদন দিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে। তৎপরে হাঁড়ীতে অগ্নির জ্বাল দিবে। ইহার নাম কন্দুক যন্ত্র। কেহবা ইহাকে স্বেদনী যন্ত্রও বলিয়া থাকেন। অথবা জলপূর্ণ হাঁড়ীর উপর তৃণ নিক্ষেপ করিয়া সেই তৃণের উপর স্বেদ্য দ্রব্য স্থাপন পূর্ব্বক আচ্ছাদন দিবে, এবং হাঁড়ীর নীচে পূর্ব্ববৎ অগ্নি জ্বাল দিবে। ইহাকেও কন্দুক যন্ত্র বলা যায়।

খল্বযন্ত্র—নীল বা শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, দৃঢ় ও গুরু প্রস্তর খল্ব প্রস্তুতের উপযুক্ত। খলের পরিমাণ উচ্চতায় ষোড়শ অঙ্গুলি, বিস্তারে নয় অঙ্গুলি এবং দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুলি করিতে হইবে। খলের ঘর্ষণী (নোড়া) দ্বাদশ অঙ্গুলি অথবা খল বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং দশ অঙ্গুলি উচ্চ অর্থাৎ বেধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এইরূপ খলই পারদ মর্দ্দনে শ্রেষ্ঠ। পারদাদি মর্দ্দনে সুবিধার জন্য দুই প্রকার (দীর্ঘাকৃতি ও গোলাকৃতি খল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সকল খল ও তাহার পুত্রিকা নিরুদ্গার (যাহা হইতে দ্রব্য ছটকাইয়া পড়ে না) এবং মসৃণ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

মতান্তরে—দশ অঙ্গুলি উচ্চ, ষোড়শ অঙ্গুলি দৈর্ঘ্য, দশ অঙ্গুলি বিস্তৃত তলদেশ সাত অঙ্গুলি এবং স্থূলতায় দুই অঙ্গুলি পরিমিত খল প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মসৃণ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়া উচিত। ইহার নোড়া দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রস্তুত করিবে; ইহা কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রশস্ত।

মর্দ্দন বিষয়ে গোলাকার খলই অধিক সুবিধাজনক তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি নিম্ন হওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত মসৃণ প্রস্তরে এই খল প্রস্তুত করাইয়া তাহার মধ্যভাগ ভালরূপে মসৃণ করিবে, ইহার নোড়ার নিম্নভাগ চ্যাপ্টা এবং ধরিবার স্থান সুখকর করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

লৌহ খল নয় অঙ্গুলি বিস্তৃত, ছয় অঙ্গুলি নিম্ন করিতে হয়। নোড়া আট অঙ্গুলি দীর্ঘ হওয়া উচিত। খলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটী চুল্লী অঙ্গার পূর্ণ করিয়া উপরোক্ত লৌহ খল তাহাতে স্থাপন করিয়া হাপর দ্বারা আধ্মাপিত করিলে তাহা তপ্ত খল্ব নামে অভিহিত হয়। মর্দ্দিত পারদ পিষ্টীক্ষার ও অম্ল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঐ তপ্ত খল্লে স্বিন্ন করিলে তাহা অতি শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। লৌহ খল কান্ত লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, পারদ কোটীগুণ অধিক গুণশালী হইয়া থাকে।

মূষা পরিচয়

রসশাস্ত্রবিৎপণ্ডিতগণ মূষাকে ক্রৌঞ্চিকা, কুমুদী, করভাদিকা, পাচনী ও বহ্নিমিত্রা এইকয় নামে অভিহিত করেন। মৃত্তিকা ও লৌহ এই দুইটি পদার্থ মুষার উপাদন। মূষা ও তাহার আচ্ছাদন উভয়ের মিলন স্থান রুদ্ধ করাকে বন্ধন, সন্ধিলেপন, অন্ধ্রণ রন্ধ্রণ, সংশ্লিষ্ট ও সন্ধি বন্ধন কহে।

পাণ্ডু, রক্তবর্ণ, স্থূল, শর্কর হীন ও বহুক্ষণ অগ্নিতাপ সহনক্ষম মৃত্তিকা মূষা নির্ম্মাণার্থ প্রশস্ত। অভাবে বল্মীক মৃত্তিকা (উঁয়ীমাটী) বা কুম্ভকার গণের নির্ম্মিত মৃত্তিকা মূষার্থ গ্রহণ করিবে।

মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ তুষ, শণ, গোবর বা ঘোড়ায় নাদ মিশ্রিত করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা তাহা কুট্টিত করিবে। এরূপে সাধারণ মূষার মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

শ্বেত প্রস্তর চূর্ণ, দগ্ধতুষ, গোবর, শণ, ছিন্নবস্ত্র, অশ্বাদির বিষ্ঠা ও লৌহমলাদি পদার্থ, উপযুক্ত পরিমাণে মূষা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

মৃত্তিকা তিনভাগ, শণ ও অশ্বাদির বিষ্ঠা দুইভাগ দগ্ধ তুষ ও প্রস্তর চূর্ণাদি একভাগ এবং লৌহমল অর্দ্ধভাগ এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বজ্রমূষা প্রস্তুত করিতে হয়।

বজ্রমূষা—সত্বপাতন ক্রিয়ার ব্যবহৃত হয়।

যোগ মূষা—মসৃণ বল্মীক মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ অঙ্গার, দগ্ধ তুষ ও যথা নির্দিষ্ট বিড় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহার মূষা প্রস্তুত করিবে এবং যথা নির্দ্দিষ্ট বিড় দ্রব্য তাহাতে লেপন করিবে। এইরূপে যে মূষা প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোগ মূষা কহে। এই যোগ মূষায় পারদ পাক করিলে তাহা অত্যধিক গুণ শালী হয়।

বজ্রদ্রাবণিকা মূষা—গার সীসক সত্ব, শণ, ও দগ্ধ তুষ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির সমান মূষোপযোগী পূর্বোক্ত মৃত্তিকা। এই সকল দ্রব্য মহিষী দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বজ্রদ্রবণার্থ বিবিধাকৃতি মূষা নির্ম্মিত করিবে।

বরমূষা—বজ্র (লৌহচূর্ণ) অঙ্গার ও তুষ প্রত্যেক সমপরিমিত, মৃত্তিকা চতুর্গুণ, গার মৃত্তিকার সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বরমুষা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা এক প্রহর কাল অগ্নিজ্বাল সহ্য করিতে পারে।

গারমুষা—মহিষীদুগ্ধ, ছয়গুণ গার, লৌহকীট্ট, অঙ্গার ও শণ এই সকল দ্রব্যের সহিত কৃষ্ণমৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা যে মূষা নির্মিত হয়, তাহাকে গার মূষা বলে। এই মূষা দুই প্রহর কাল অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহা নষ্ট হয় না।

বর্ণমূষা বা রূপ্য মূষা—প্রস্তর চূর্ণ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা রক্তবর্গোক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া তাহা দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে এবং সেই মূষায় খদির ও হীরাকস লেপন করিবে। ইহাকে বর্ণ মূষা বলে। ধাত্বাদির বর্ণোৎকর্ষ সম্পাদনার্থ এই মূষা ব্যবহৃত হয়। শ্বেত বর্গোক্ত পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া এই মূষা প্রস্তুত করিলে তাহাকে রৌপ্য মূষা বলা যায়।

বিড় মূষা—যথা নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাদ্বারা মূষা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নির্দ্দেশানুসারে সেই সেই বিড় বস্তু লেপন করিবে, সেই মূষা বিড় নামে অভিহিত হয়। দেহের দৃঢ়তা সাধক ঔষধ প্রস্তুত করিতে এই মূষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গার (জলে বহুক্ষণ ভিজান মৃত্তিকা) ও সীসক সত্ত্ব এক এক ভাগ, তুষ আট ভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির সমান মৃত্তিকা, এই সমস্ত একত্র মহিষী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বহুপ্রকার ক্রৌঞ্চিকা যন্ত্র (মূষা) প্রস্তুত হয়। এই মূষায় মৎকুনের রক্ত এবং বালা ও কাঁটানটের মূল লেপন করিলে ইহা বজ্র দ্রাবণ মূষায় পরিণত হয়। ইহা দ্রব পদার্থ পূর্ণ করিয়া অগ্নি তাপে রাখিলে, চারি প্রহর কাল অগ্নিতাপ সহ্য করে।

মূষা মধ্যে কোন পদার্থ দ্রবীভূত হইবার সময়ে কিছু ক্ষণের জন্য যদি তাহার আধ্মাপন ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া মূষা নামাইয়া লওয়া হয়, তবে তাহাকে মূষার আধ্মাপন ক্রিয়া বলে।

বৃন্তকা মূষিকা—বেগুণের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বার অঙ্গুলি পরিমিত একটি নাল সংযুক্ত করিবে। তাহার উপরি ভাগ ধুতুরা ফুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে হইবে।

মূষার পরিমাণ আট অঙ্গুলি হইবে ও তাহাতে ছিদ্র থাকিবে। ইহাকে বৃন্তকা মূষিকা কহে। এই মূষা দ্বারা খর্পরাদি মৃদু দ্রব্যের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়।

গোস্তনীমূষা—যে মূষা গোস্তনের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং শিখাযুক্ত ও আচ্ছাদনযুক্ত তাহাকে গোস্তনী মূষা বলা যায়। ধাত্বাদির শুদ্ধি ও সত্ব দ্রাবণ কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মল্লমূষা—একখানি শরার উপর আর একখানি শরা উপুড় করিয়া দিয়া যে মূষা প্রস্তুত হয় তাহাকে মল্লমূষা কহে। ইহা পর্পটাদি রস পদার্থ স্বেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পক্কমূষা—কুম্ভকার নির্ম্মিত ভাণ্ডের ন্যায় আকৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহা দগ্ধ করিয়া লইলে, পক্কমূষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পোট্‌লী প্রভৃতি পাক করিতে এই মূষার প্রয়োজন হয়।

একটি গোলাকার মূষার মধ্যে পুটন দ্রব্য নিহিত করিয়া তাহার মুখবন্ধ করিলে, তাহাকে **গোলমূষা** কহে। ইহাদ্বারা পুটল দ্রব্য সত্বর দ্রবীভূত এবং শোধিত হইয়া থাকে।

তলভাগ কূর্পরের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তৎপরে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া, স্থূল বৃন্তাকের ন্যায় যে স্থূল মূষা প্রস্তুত করা যায় তাহা **মহামূষা** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লৌহ অভ্র প্রভৃতির পুট পাক ও দ্রাবণ ক্রিয়ার জন্য এই মূষা ব্যবহৃত হয়।

মণ্ডুকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং তলভাগে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ছয় অঙ্গুলি পরিমিত যে মূষা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে **মণ্ডুক** মূষা বলে। এই মূষা ভূমিতলে নিহিত করিয়া উপরিভাগে পুট দিতে হয়।

যে মূষার স্থলভাগ চিপিটাকৃতি (চ্যাপটা) ও অপর অবয়ব গোলাকৃতি, এবং আট অঙ্গুলি যাহার উচ্চতা, তাহাকে **মুষল** মূষা বলে। চক্রী বন্ধ রস অর্থাৎ পারদের চাকী পাক করিতে এই মূষা উপযোগী।

পুট

পুট বিধানই রসাদি দ্রব্য পাকের জ্ঞাপক, অর্থাৎ রসাদি দ্রব্যের পাক

সম্যক হইয়াছে কিনা, পুটানুসারেই তাহা অবগত হইবে। নির্দ্দিষ্ট পাক অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক পাক হিতকর নহে। যে ঔষধের পাক সম্যক বিহিত হয়, তাহাই হিতকর হইয়া থাকে। লৌহাদি ধাতু সমুহের নিরুত্থ ভস্ম, গুণের আধিক্য ও ক্রমশঃ উৎকর্ষ, জলে নিমগ্ন না হওয়া এবং অঙ্গুলি রেখার প্রবেশ এই সমস্ত কেবল পুট ক্রিয়া দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পুট ক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তর ও ধাতু সমুহের লঘুত্ব, শীঘ্র দেহ ব্যাপ্তি, অগ্নিদীপন, এবং জারিত পারদ অপেক্ষাও অধিক গুণশালী হইয়া থাকে।

বহিঃস্থ পুট সংযোগ দ্বারা, ধাতু সমুহে যতবার অগ্নি প্রবেশ করে এবং যতই তাহা চুর্ণরূপে পরিণত হয়, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইয়া থাকে।

মহাপুট

দুই হস্ত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া কুণ্ডের নিম্নভাগ ক্রমশঃ বিস্তৃত করিতে হইবে। তৎপরে সেই কুণ্ডের মধ্যে এক সহস্র বন ঘুঁটে দিয়া তাহার উপর মূষাবদ্ধ পুট পাকোপযোগী ঔষধ স্থাপন করিবে এবং ঔষধের উপরে আরও অর্দ্ধ সহস্র বনঘুঁটে দিবে। অতঃপর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। ইহাকে মহাপুট কহে।

গজপুট—এক হস্ত পরিমিত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, সহস্র বনঘুটের দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। বনঘুঁটের উপর পুটন দ্রব্য পুর্ণ পাত্র স্থাপন পুর্ব্বক তাহার উপর আর অর্দ্ধ সহস্র বনঘুটে দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে। ইহার নাম গজপুট। গজপুট ঔষধের মহাগুণ প্রদান করে।

বরাহ, কুক্কুট ও কপোতপুট

ঐরূপ নিয়মে অরত্নি পরিমিত কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পুটপাক করিলে, তাহাকে বরাহ পুট বলা হয়।

দুই বিতস্তি পরিমিত গভীর ও দুই বিতস্তি বিস্তৃত কুণ্ডে পুটপাক করাকে কুক্কুট পুট বলে।

পারদ ভস্ম করিবার জন্য মুষারুদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে আট খানি বন-ঘুঁটে দ্বারা পাক করিলে তাহাকে কপোত পুট বলে।

গোবর পুট

গোচারণ স্থানে পতিত, গোখুর দ্বারা কুটিত ও শুষ্ক গোময় চূর্ণকে গোবর বলে। ইহা রস সাধন কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। রসভস্ম সাধনার্থ উক্তরূপ গোবর ও তুষ দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহাকে গোবর পুট কহে।

ভাণ্ড পুট

একটি স্থূল ভাণ্ডের মধ্যে তুষ পরিপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে মূষা নিহিত করিবে এবং সেই তুষে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহা দগ্ধ করিবে। ইহাকে—ভাণ্ডপুট বলে।

বালুকাপুট—পাচ্য পদার্থ পূর্ণ মূষার নীচে ও উপরে উত্তপ্ত বালুকা দিয়া সেই মুষা আচ্ছাদিত করিয়া পাক করিবে। ইহার নাম বালুকা পুট।

ভূধর পুট- ভূমিতলে দুই অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মূষা নিহিত করিবে এবং তাহার উপরে বনঘুটের অগ্নিদ্বারা পুট দিতে হইবে। ইহাকে ভূধর পুট বলে।

লাবক পুট--মূষার উপরে ষোড়শ গুণ তুষ অথবা গোবর দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহার নাম লাবকপুট। অতি মৃদু দ্রব্য পুটপাক করিতে ইহা উপযোগী।

যে স্থলে পুটের অর্থাৎ বনঘুটে প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমান নির্দ্দিষ্ট ন

থাকে, সেই সকল স্থলে পাচ্য পদার্থের বলাবল বিবেচনা করিয়া পুটের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হয়।

কোন দ্রব পদার্থ না দিয়া, কেবল ধাতু সমূহ এবং গন্ধকাদির সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ মসৃণ চূর্ণ করিলে তাহা কজ্জলী নামে অভিহিত হয়। আর যদি ঐ সকল দ্রব্য দ্রব পদার্থের সহিত মর্দ্দিত হয় তবে তাহা **রসপঙ্ক** নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক দ্বাদশ ভাগ এবং অভ্র চারি আনা একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া নবনীতের ন্যায় প্রস্তুত হইলে তাহাকে **রসপিষ্টি** বলা যায়।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন গন্ধক ও দুগ্ধের সহিত পারদ খলে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টবৎ প্রস্তুত করিলে তাহাই পিষ্টি নামে অভিহিত হয়।

চতুর্থাংশ স্বর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া যে পিষ্টি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে **পাতন পিষ্টি** কহে। ইহা পারদের উত্তম সিদ্ধিপ্রদ।

রৌপ্য বা স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধকাদির সহিত মারিত করিয়া তাহা বারংবার উর্দ্ধপাতনে উত্থাপিত করিলে তাহাকে স্বর্ণ বা **রৌপ্যের কৃষ্টী** কহে।

এই কৃষ্টী বা কৃষ্ণী স্বর্ণমধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহা দ্বারা স্বর্ণের বর্ণহানী হয় না। বিশেষতঃ এই স্বর্ণকৃষ্টী পারদের রঞ্জন কার্য্যে বীজ স্বরূপ।

তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ বারংবার দ্রবীভূত করিয়া গন্ধক মিশ্রিত মান্দারের রসে নিক্ষেপ করিলে তাহা শ্রেষ্ঠ লৌহরূপে নির্গত হয়। ঐরূপে স্বর্ণের সংস্কার করিলে তাহা **হেমরক্তী** নামে অভিহিত হয়। দ্রবীভূত স্বর্ণে ঐ হেমরক্তী নিক্ষেপ করিলে, স্বর্ণের বর্ণোৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। রৌপ্যেরও এইরূপ সংস্কার করিয়া মনোহর রৌপ্য রক্ত বা বীজ প্রস্তুত

করিতে হয়। ইহার নাম **তাররক্তী**। তাররক্তী রৌপ্যের এবং রৌপ্য রঞ্জক বীজেরও রঞ্জক।

মৃত বা বদ্ধ পারদ কিংবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া যদি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা চন্দ্রদল এবং যদি পীতবর্ণ হয়, তবে তাহা **অগ্নিদল** নামে অভিহিত হয়।

গ্রন্থান্তরেও এইরূপ বর্ণিত আছে বদ্ধ পারদ অথবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া শ্বেত বা পীতবর্ণ হইলে তাহা **শ্বেতদল** বা পীতদল নামে কীর্ত্তিত হয়।

স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাম্র দশবার পুটপাক করিয়া সেই মারিত তাম্র এবং ঐরূপ বিশোধিত সীসক, উভয়ে চারিপল একত্র মিশ্রিত করিয়া নীলাঞ্জনের সহিত শতবার মারিত করিলে তাহা শুল্বনাগ নামে অভিহিত হয়। ইহা বিশুদ্ধ। এই শুল্বনাগের সহিত সাধিত পারদ একমাস কাল মুখে ধারণ করিলে মনুষ্যদিগের মেহ রোগ সমূহ নিবারিত হয়। পথ্য ভোজী হইয়া এক বৎসরকাল মুখে ধারণ করিলে, বলি ও পলিত নষ্ট হয়, গৃধ্রের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি প্রখরা, শরীর পরিপুষ্ট এবং সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

এক ধাতু অপর ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎপরে তাহা দগ্ধ করিয়া দ্রবপদার্থ বিশেষে নির্ব্বাপিত করিলে. যদি তাহা পাণ্ডু পীতবর্ণ হয়, তবে পিঞ্জরী নামে অভিহিত হয়।

রৌপ্য ষোলভাগ ও তাম্র দ্বাদশ ভাগ, একত্র আবর্ত্তিত করিলে, তাহা চন্দ্রার্ক নামে কথিত হয়।

যে কোন একটি সাধ্য ধাতুতে অপর ধাতু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বাঁক নলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিলে, বৈদ্যগণ তাহাকে নির্ব্বাহন কহেন। ইহাতে যে ধাতু নির্ব্বাহিত করিতে হইবে, তাহার যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট

থাকে, নির্ব্বাচন দ্রব্য অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ব্বাপন করিতে হয়, সেই দ্রব্যও তাহার সমপরিমাণে প্রদান করিতে হয়।

যে মৃত ধাতুভস্ম জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহা জলের উপরই ভাসিয়া উঠে তাহাকে বারিতর কহে। আর যে ধাতুভস্ম অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মর্দ্দিত করিলে, অঙ্গুলির রেখা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহা রেখা-পূর্ণ নামে অভিহিত হয়।

গুড়, গুঞ্জা, সুখস্পর্শ (সোহাগা), মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ধাতুভস্ম আধ্মাপিত করিলে সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে অপুনর্ভব ধাতুভস্ম বলা যায়। সেই ধাতুভস্মের উপরে ধাণ্যাদি গুরুদ্রব্য স্থাপন করিয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে যদি হংসবৎ ভাসিতে থাকে, তবে তাহাকে উনম কহে।

কোন ধাতুভস্মের সহিত রৌপ্য মিশ্রিত করিয়া তাহা আধ্মাপিত করিলে যদি সেই ভস্ম রৌপ্যপাত্রে লাগিয়া যায়, তবে তাহা নিরুত্থ বা অপুনর্ভব ধাতুভস্ম নামে অভিহিত হয়।

নির্বাপণ দ্রব্য বিশেষের সংশ্রবে ধাতুভস্ম যখন সেই সেই বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মৃদু ও বিচিত্র সংস্কার হয়, তখনই তাহা বীজ নামে কীর্ত্তিত হয়। এই বীজ সংস্কারকে বৈদ্যগণ উত্তরণ ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সংসৃষ্ট ধাতুদ্বয়ের মধ্যে একটি ধাতু বাঁকনলের ফুৎকার দ্বারা দগ্ধ করিলে তাহাকে তাড়ন বলা যায়।

অভ্রের চূর্ণ শালিধান্য ও কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া, বস্ত্রে বন্ধন করিয়া মর্দ্দন করিলে, বস্ত্র মধ্য হইতে যে অভ্রকণা পতিত হবে, তাহাকে ধান্যাভ্র কহে।

ক্ষার অম্ল ও দ্রাবক পদার্থের সহিত ধাতু দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া

কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আধ্মাপিত করিলে, যে সার পদার্থ নির্গত হয় তাহারই না। সত্ব।

কোষ্ঠিকাযন্ত্রে শিখরাকারে কোকিল (কয়লা) পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে মূষা-স্থাপন পূর্ব্বক তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সেই কয়লাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আধ্মাপিত করাকে এককোলীসক কহে। কার্য্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কয়লা ব্যবহার করিতে হয়। যথা—শ্রাবণ ও সত্ব পাতন কার্য্যে মউল কাষ্ঠের ও খদির কাষ্ঠের কয়লা প্রশস্ত। দ্রব পদার্থহীন দ্রব্য আধ্মাপিত করিতে বাঁশের কয়লা উপযোগী। আর স্বেদন কার্য্যে কুলকাষ্ঠের কয়লা উৎকৃষ্ট।

হিঙ্গুল আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া বিদ্যাধর যন্ত্রদ্বারা তাহা হইতে পারদ আকর্ষণ করিলে সেই পারদকে হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস বলা যায়। কাংস্যের সহিত অল্প হরিতাল মিশ্রিত করিয়া বাঁকানলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে। এইরূপ কাংস্যের রঙ্গ ভাগ (দস্তাভাগ) অপগত হইলে অবশিষ্ট তাম্রভাগকে ঘোষাকৃষ্ট কহে।

তীক্ষ্ণলৌহ নীলাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তীব্র অগ্নিতে বহুবার আধ্মাপিত করিলে, যখন তাহা কোমল কৃষ্ণবর্ণ ও শীঘ্র শ্রাবণশীল হয়, তখন তাহা বরনাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মৃত (জারিত) দ্রব্যের পুনরুদ্ভুতি অর্থাৎ পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তিকে উত্থাপন কহে। দ্রব পদার্থে দ্রবীভূত দ্রব্য নিক্ষেপ করাকে ঢালন বলা যায়।

ত্রিশপল পরিমিত সীসক আকন্দের আঠার সহিত মর্দন করিয়া ক্রমশঃ আবার পুটপাক করিতে হইবে। পুটপাকে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যখন এক কর্ষ (২ তোলা) মাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন পুটপাক বন্ধ করিতে হইবে। ইহার পর সহস্রবার পুটপাক করিলেও আর তাহার ক্ষয় হইবে না। বার্ত্তিককারগণ ইহাকে নাগ সম্ভূত চপল বলিয়া থাকেন।

ঐরূপ প্রক্রিয়ায় বঙ্গেরও চপল প্রস্তুত করিতে হয়। সেই চপল হস্তে লইয়া সেই হস্তে পারদ স্পর্শ করিলে পারদ বদ্ধ হইয়া থাকে। এই পারদ ধাতু ক্রিয়ায় প্রশস্ত, কিন্তু রসায়ন কার্য্যে উপযোগী নহে। আচার্য্য লোক নাথ এই বঙ্গের চপলকে খর্পর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সীসকের মল জলদ্বারা ধৌত করিয়া, তদ্গত রজঃ প্রভৃতি অপহৃত করিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয়। রসবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৌত নামে অভিহিত করেন।

সম পরিমিত দুইটি ধাতু দ্রব্য একত্র মর্দ্দিত ও আধ্মাপিত করিলে তাহাকে দ্বন্দ্বান কহে। আর সেই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্য অপর দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভাগ হইলে, তাহাকে অনুবর্ণ এবং ন্যূন হইলে সুবর্ণক কহে। অন্য কোন পদার্থ দ্বারা বর্ণের হ্রাস ঘটিলে ধাতুবিদ্‌গণ তাহাকে ভঞ্জনী কহিয়া থাকে।

ধাতু বিশেষে পারদাদির কল্ক দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণোৎপাদন করিলে তাহা যদি অল্প দিন থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাকে চুল্লকা (গিলটি) কহে, আর যদি সেই রঞ্জিত বর্ণ চিরস্থায়ী হয় এবং দগ্ধ করিলেও নষ্ট হইয়া না যায়, তবে তাহা পতঙ্গী রাগ নামে অভিহিত হয়।

দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতুতে যে অন্য দ্রব্যের প্রক্ষেপ দেওয়া যায়, তাহাকে আবাপ, প্রতীবাপ ও আচ্ছাদন কহে।

কোন ধাতু অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া অষ্টনিমেষ কাল অপেক্ষা পূর্ব্বক তাহাতে অল্প অল্প করিয়া জল নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে অভিষেক বলা যায়। উত্তপ্ত ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে অভিষেক বলা যায়। উত্তপ্ত ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে নির্বাপন ও স্বপন কহে।

ধাতু দ্রবীভূত হইয়া যখন নির্ম্মল হয়, তখনই তাহাকে প্রতীবাপাদি অর্থাৎ অপর দ্রব্যের প্রক্ষেপাদি করিবে। ধাতু পদার্থ আধ্মাপিত করিবারা

করিবার সময় যখন তাহা হইতে শুভ্রবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হয় তখন তাহাকে শুদ্ধাবর্ত্ত কহে। তাহাই সত্ত্ব নির্গমের কাল। আর যখন আধ্মাপন কালে দ্রবীভূত দ্রব্যের ন্যায় শিখা নির্গত হয় এবং দ্রব পদার্থে উন্নত হইয়া (উথলিয়া) উঠে তখন তাহা বীজাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে কোন পদার্থ অগ্নিতে জ্বাল দেওয়ার পর সেই অগ্নিতে থাকিয়াই ক্রমশঃ আপনা হইতে শীতল হইয়া যায় তাহাকে স্বাঙ্গশীতল কহে। সেই দ্রব্য অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া লওয়ার পর শীতল হইলে তাহাকে বহিঃ শীতল বলা যায়।

ক্ষার, অম্ল বা অপর কোন ঔষধের সহিত কোন দ্রব্য দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহাকে স্বেদন কহে। মর্দন দ্বারা সেই পদার্থের বহির্গত মল বিনষ্ট হয়।

নির্দ্দিষ্ট ঔষধ অথবা অম্ল পদার্থ কিংবা কাঁজির সহিত কোন দ্রব্য পেষণ করিলে তাহাকে মর্দন কহে। মর্দন দ্বারা সেই পদার্থের বহির্গত মল বিনষ্ট হয়।

যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধের সহিত মর্দন করিয়া কোন দ্রব্যকে নষ্ট পিষ্ট করিলে তাহাকে মূর্চ্ছন বলা যায়। মূর্চ্ছন ক্রিয়া দ্বারা বঙ্গাদি দ্রব্যান্তর সংযোগ ও কঞ্চুকাদি দোষ নিবারিত হয়।

স্বেদ ও আতপাদির যোগে ভস্মীভূত ধাতুর পুনর্বার স্বাভাবিক অবস্থা উৎপাদন করাকে উত্থাপন ক্রিয়া কহে। ইহার দ্বারা মূর্চ্ছন ক্রিয়া জনিত ব্যাপত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদাদির স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া তাহা পিষ্টাকারে পরিণত হইলে তাহা বন্ধন ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়। এইরূপ নির্জ্জিত পারদকে পণ্ডিতগণ নষ্টপিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যথানির্দ্দিস্ট ঔষধের সহিত মর্দ্দিত পারদ যথাযথ যন্ত্রে নিহিত করিয়া

ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক ভাবে পাতিত করিয়া নির্ব্বাপিত করার নাম পাতন ক্রিয়া। ইহাদ্বারা বঙ্গ ও সীসক সংসর্গ জনিত কঞ্চুক দোষ বিনষ্ট হয়।

জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত পারদ সংযুক্ত করিয়া তিন দিন একটি কলসী মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিলে, তাহাকে আস্থাপনী ও রোধন ক্রিয়া কহে।

এইরূপ রোধন ক্রিয়া দ্বারা পারদ লব্ধবীর্য্য হইলে, তাহার চপলতা দোষ বৃদ্ধি পায়; সেই চপলতা নিবৃত্তির জন্য যে স্বেদ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাকে নিয়ামন কহে।

ধাতু পাষাণ ও মূলাদি ঔষধের সহিত (পারদ) সংযুক্ত করিয়া তাহা ঘটমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তিনদিন গ্রাসার্থ যে স্বেদ দেওয়া যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে দীপন কহে।

এই পরিমিত পারদ এই পরিমিত দ্রব্য গ্রাস করিতে পারিবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পারদের এবং গ্রাসার্থ দ্রব্যের যে পরিমাণ নিশ্চয় করা হয়, তাহাকে গ্রাসমান বলা যায়।

প্রসিদ্ধ বার্ত্তীকারগণ জারণ ক্রিয়া তিন প্রকার বলিয়া নির্দেশ করেন যথা—গ্রাসচারণ, গর্ভদ্রাবণ ও জারণ। তন্মধ্যে গ্রাসচারণ, তিন প্রকার, যথা—গ্রাস, পিণ্ড ও পরিণাম। আর জারণ ক্রিয়া সমুখা ও নির্ম্মুখা ভেদে দুই প্রকার। যে জারণ ক্রিয়ায় নির্দ্দিষ্ট ভাগ পরিমিত বীজ গৃহীত হয়, তাহাকে নির্ম্মুখা জারণ কহে। শোধিত স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটি ধাতুকে বীজ বলা যায়। চতুঃষষ্টি অংশ পরিমিত বীজ প্রক্ষেপের নাম মুখ. সেই মুখের সহিত জারণ করা হইলে, পারদ গ্রাস লোলুপ মুখবান হয়, অর্থাৎ কঠিন ধাতু সমূহকেও গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বনবাসী সিদ্ধ পুরুষগণ ইহাকেই সমুখা জারণ বলেন।

মনঃশিলা মিশ্রিত পারদ, কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আঘাত হইবার সময় যদি সমস্ত ধাতুই গ্রাস করিতে সমর্থ হয় তবে সেই পারদ রাক্ষসবক্ত্র নামে পরিচিত হয়।

পারদগর্ভে গ্রাসোপযোগী পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ সেই পদার্থ পারদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে তাহাকেই গ্রাসচারণ কহে। গ্রস্ত পদার্থ পারদগর্ভে দ্রবীভূত হইলে তাহাকে গর্ভদ্রুতি বা গর্ভ দ্রাবণ বলা যায়।

পারদ জারণকালে ঘন সত্ত্বাদি পদার্থ যদি বাহিরেই অর্থাৎ পারদের সহিত মিশ্রিত না হইয়াই দ্রবীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে বাহ্যদ্রুতি কহে।

নির্লেপত্ব, দ্রুতত্ব, তেজত্ব লঘুতাও পারদের সহিত অসংযোগ এই পাঁচপ্রকার দ্রুতি লক্ষণ। পারদ আঘাপিত করিবার সময় যদি ঔষধ অথবা লৌহাদি ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তবে তাহা দ্রুতি নামে কীর্ত্তিত হয়।

বিড় এবং যন্ত্রাদি যোগে দ্রুতি, গ্রাস, পরিণাম প্রভৃতি যে সকল সংস্কার হইয়া থাকে, সেই সমস্তেরই নাম জারণ। জারণ ক্রিয়ার কোটি কোটি প্রকার ভেদ আছে।

রসগ্রাস কালে জীর্ণার্থ ক্ষার, অম্ল, গন্ধাদি পদার্থ মূত্র ও লবণাদি যে সকল পদার্থ প্রদত্ত হয়, তাহাকে বিড় কহে।

সুসিদ্ধ বীজ ধাতু প্রভৃতির সহিত রসের জাবণ দ্বারা যে পীতাদি বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহাকে রঞ্জন কহে।

তৈলযুক্ত যন্ত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া তাহাতে স্বর্ণাদি নিক্ষেপ করিলে তাহাকে সারণা কহে। ইহা ধাতু সংস্কার বিষয়ে বেধকর্ম্ম অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকর।

ব্যবায়ী (যাহা জীর্ণ না হইয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে) ঔষধ সমূহের

সহিত পারদ মিশ্রিত করিলে বেধ নামে অভিহিত হয়। লেপ, ক্ষেপ, কুন্ত, ধূম ও শব্দ নামভেদে বেধক্রিয়া বহুবিধ।

পারদ বিশেষ লৌহে প্রলিপ্ত করিয়া, যে স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদন করা হয়, তাহাকে লেপবেধ কহে। উহাতে যেরূপ পুটপাক করিতে হয়, তাহা অনায়াস সাধ্য। দ্রবীভূত লৌহে পারদ বিশেষ প্রক্ষেপ দিয়া যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে ক্ষেপবেধ কহে।

একটি সন্দংশে (সন্নায়) পারদ বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক সেই সন্দংশে দ্রবীভূত লৌহাদি গ্রহণ করিয়া স্বর্ণাদি প্রস্তুত করিলে তাহাকে কুন্তবেধ কহে।

অগ্নিমধ্যে কোন ধাতু নিহিত করিয়া সেই অগ্নিতে পারদ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে ধূম নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধূমবেধ বলা হয়।

মুখমধ্যে পারদ বিশেষ ধারণ করিয়া অল্প পরিমিত ধাতুতে সেই মুখের ফুৎকার পূর্বক যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা শব্দবেধ নামে অভিহিত হয়।

পারদ সংমিশ্রণ দ্বারা রসসিদ্ধ ঔষধ সমূহের মলিনতাদির নিবারণ করিয়া স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ করিলে তাহা উদ্ঘাটন নামে কীর্ত্তিত হয়।

ক্ষার ও অম্ল ঔষধের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক ভাণ্ডমধ্যে পারদ নিহিত করিয়া তাহা ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাকে স্বেদন ক্রিয়া বলে।

ঔষধ সংযুক্ত পারদ ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া মন্দাগ্নিপূর্ণ চুল্লীর মধ্যে নিহিত করাকে সন্ন্যাস কহে।

স্বেদন ও সন্ন্যাস এই দুইটি ক্রিয়া পারদের গুণোৎকর্ষজনক এবং শীঘ্র ব্যাপ্তিকারক।

রসসেবনের মাত্রা

ঔষধ সেবনের মাত্রার কোন স্থিরতা নাই। রসসিদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেই রসসেবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোগীর বয়স, বল ও শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ঔষধের মাত্রা নির্দ্দেশ করিবেন। চিকিৎসকগণের সুবিধার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত রসসেবন মাত্রা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পারদভস্মের মাত্রা প্রতিদিন ১ রতি, স্বর্ণভস্মের মাত্রা ১ রতি, রৌপ্য ভস্মের ৩ রতি, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, সীসকভস্ম, বঙ্গভস্ম, পিত্তল ও কাংস্য ভস্ম প্রতিদিন ২ রতি, মুক্তাভস্মের মাত্রা ২ যব, হরিতাল ভস্মের মাত্রা ১ সর্ষপ হইতে সিকি রতি।

রসসেবনের নিয়ম

যে সকল রস মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত, সেই সকল রস সেবনের পর জল সেচন ও অবগাহন ক্রিয়া করিলে ঔষধের বলবৰ্দ্ধিত হয়। রস সেবনে বিদাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদির অনুলেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সংযুক্ত টাটকা দধি সেবন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীত ক্রিয়া হিতকর।

রসেন্দ্রবেধজ স্বর্ণ প্রস্তুতি বিধি

(১) গন্ধক, হিঙ্গুল, লৌহচুর্ণ ও মনঃশিলাকে তিনদিন অম্লরসে মৰ্দ্দন করিবে। তাহারপর তাহাদিগকে একটি সুদৃঢ় লৌহ কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভাজিয়া চুর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ চুর্ণ একটি কাঁচ কূপীতে পূর্ণ করিয়া ৯ ঘণ্টা বালুকা যন্ত্রে তীব্রাগ্নিতে পাক করিবে। ইত্যবসরে অপর একটি মূষায় কিঞ্চিৎ রৌপ্য গালিত করিবে। তাহার পর উক্ত বালুকা যন্ত্র হইতে উত্তপ্ত অবস্থায় ঐ মিশ্রিত দ্রব্যগুলি কতক বাহির করিয়া গালিত

রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহা হইলে দেখিবে যে ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের সমপরিমিত রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। এই স্বর্ণের অর্দ্ধেক অংশ বাজারে বিক্রীত বিশুদ্ধ স্বর্ণের তুল্য।

(২) তাম্রকে হিঙ্গুলের সহিত তিনবার জারিত করিয়া তিন বার পুনর্জ্জীবিত করিবে। তাহা হইলে তাম্র বিশুদ্ধ, পীত, ও অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট হইবে। তাহার পর উক্ত তাম্রকে খর্পর পাত্রে ত্রিফলার জলে ভাবন দিয়া সেহুণ্ডের আঠায় মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ তাম্রকে তীব্র অগ্নিতে মূষা মধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহা রাজভোগ্য বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হইবে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ বৃদ্ধি করণ

তুঁতে /০, রসক ভস্ম /০, মনঃশিলা ৵০, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা নিকৃষ্ট স্বর্ণের সহিত গলাইলে উহার বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

রৌপ্য প্রস্তুত বিধি

(১) ১২ ভাগ তীক্ষ্ণ লৌহচুর্ণ, ৩ ভাগ বঙ্গচুর্ণ, ৩ ভাগ সীসকচুর্ণ, ৩ ভাগ হরিতাল চুর্ণ, কাঁটা নটের রস ও সোহাগা চুর্ণের সহিত ১ দিন অন্ধ মূষায় পাক করিবে। পাক শেষে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য সমপরিমিত রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত দ্রব্য বিশুদ্ধ রৌপ্য পরিণত হয়।

(২) ছয় পল শোধিত চুর্ণীকৃত হরিতাল, ২ পল ভূনাগ স্বত্ত্ব, ১ পল সোহাগা, একত্রে কদলী ও ওলের রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া একটি বোতলে তিনদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবে তাহার পর স্বত্ত্বপাতন করিবে। উক্ত আবদ্ধ দ্রব্যের সত্ত্বের ১৬ গুণ তাম্র উহার সহিত মিশ্রিত হইলে উহা বিশুদ্ধ রৌপ্যে পরিণত হয়।

মল্লিখিত "ভারতীয় রসবিদ্যা" নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

রসশালা নির্ম্মাণ

মহানগরীর মধ্যস্থিত চতুর্দ্দিক প্রাচর বেষ্টিত বাধাবিঘ্ন বিবর্জ্জিত স্থানে রসশালার নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। ইহার মনোরম উদ্যানটি সর্ব্বপ্রকার ঔষধি সমন্বিত এবং স্বচ্ছতোয় কূপবিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এখানে উপযুক্ত সময়ে শিব-দুর্গার পূজার্চ্চনা হওয়া উচিত। প্রাকারটি এরূপভাবে নির্ম্মান করিতে হইবে যেন তস্করাদি দুর্বৃত্তেরা ইহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। এই রসশালায় উপযুক্ত সংখ্যায় দ্বার এবং গবাক্ষ থাকিবে। এইরূপ রসশালাতে বিজ্ঞ চিকিৎসক অতিনির্জ্জনে শান্ত মনে রসক্রিয়া সমাধান করিবেন।

রসশালার পূর্ব্বদিকে গবাক্ষের সন্নিকটে রবিরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত স্থানে স্ফটিক পাথরে ন্যায় সমুজ্জল সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত মৃত্তিকার বেদী রচনা পূর্বক উহাতে, রসলিঙ্গ স্থাপন করিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রীর মতে উহার পূজা করিবেন।

রসশালার অগ্নিকোণে অগ্নিকার্য্য, দক্ষিণে পাষাণ কার্য্য, নৈঋতে শস্ত্রকার্য্য, পশ্চিমে প্রক্ষালণ কার্য্য, বায়ুকোণে শোষণ কার্য্য, উত্তরে বেধকর্ম্ম এবং ঈশান কোণে সিদ্ধ বস্তু সমুহ স্থাপন করিবে। রসশালার মধ্যভাগ রসসাধনার দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে।

রসশালার উপকরণ

সত্বপাতন কোঠী, সুশোভন ঝরৎ কোষ্ঠী, ভূমি কোষ্ঠী, চলৎ কোষ্ঠী প্রভৃতি কোষ্ঠিকা যন্ত্র, নানাপ্রকার জলদ্রোণী (গামলা), দুইটি হাপর, বংশ নির্ম্মিত ও লৌহনির্ম্মিত দুইটী নল, স্বর্ণ, লৌহ, কাংস্য, তাম্র ও প্রস্তরের কুম্ভ, চর্ম্মকারগণের নানাবিধ যন্ত্রাদি পদার্থ, উদূখল পেষণী (শিল), দ্রোণীবৎ খল, বর্ত্তুলাকৃতি খল, লৌহময় খল, তপ্ত খল ও তদুপযোগী মর্দ্দক (নোড়ী) সকল, ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম চালনী, কষায়িত চর্ম্মখণ্ড, শলাকা ও কণ্ডনী দ্রব্য সমূহ। এই গুলি রসশালার উপকরণ।

মূষা (মৃত্তিকার সর), মৃত্তিকা, তুষ, কার্পাস,বনঘুঁটে, পিষ্টক, ধাতুময়, মূলময় এবং জীবময় ঔষধ, শিখিত্র (জ্বলন্ত অঙ্গার), গোবর, শর্করা ও সিতোপলা এই সমস্ত দ্রব্যও রসশালায় রাখিতে হইবে। কাচ, লৌহ মৃত্তিকা এবং কড়ি নির্ম্মিত বোতল এবং পানপাত্র সংগ্রহ রাখিতে হইবে। কুলা প্রভৃতি বংশ নির্মিত দ্রব্য, খুন্তি, ক্ষিপ্র, শঙ্কিকা (লৌহদণ্ড) ক্ষুরপ্র (লৌহের হাতা), পাক্য, পালিকা কণিকা (কুর্ণি), শাকচ্ছেদন শস্ত্র, গৃহ সম র্জ্জনী এবং রসপাকের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য ও সংগ্রহ রাখিতে হইবে।

[জ্বলন্ত অঙ্গারকে শিখিত্র এবং অঙ্গারে জল না দিয়া নির্বাপিত করিলে তাহাকে কোকিল (কয়লা) বলে। শুষ্ক গোময়ের নাম পিষ্টক।

আচার্য্য লক্ষণ

রসশাস্ত্রজ্ঞ, নিঘণ্টুজ্ঞ (আভিধানিক) ও সর্বদেশের ভাষাবিদ বাত্তিক বৈদ্যগণকে রসপাক কালে সাধকের সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাঁহারা রসপাকের অবসান পর্য্যন্ত নিয়ত কাল অঘোর মন্ত্রজপ করিলেন। রসকার্য্য সাধনার্থ উদ্যমশীল, শুচি, শৌর্য্যশালী ও বলিষ্ঠ পরিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, বিদ্বান, শিব-বিষ্ণু পূজক, দয়াবান ও হস্তে পদ্মচিহ্ন বিশিষ্ট বৈদ্যকে রসপাকার্থ নিযুক্ত করিবে। যাঁহার হস্তে পতাকা, কুম্ভ, পদ্ম, মৎস্য ও ধনুর চিহ্ন অঙ্কিত থাকে এবং অনামিকার অধোভাগ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ রেখা অঙ্কিত দেখা যায়, সেই বৈদ্যকে অমৃত হস্তবান কহে। অমৃত হস্ত বৈদ্য রসকার্য্য সাধনে অধিক প্রশস্ত। ইহার তাৎপর্য এই যে, সুলক্ষণাক্রান্ত বৈদ্য রসক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাব সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আর যে বৈদ্য ভাগ্যহীন, নির্দ্দয়, লুব্ধ গুরু জ্ঞান বর্জ্জিত ও হস্তে কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত, তাহাকে দগ্ধ হস্ত বলা যায়, এরূপ বৈদ্য রসক্রিয়া সাধনে পরিত্যজ্য।

ভূত নিবারক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিধিসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। বলবান্, সত্যবাদী, রক্তনেত্র, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও ভূতগণের ভয়োৎপাদক, বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে বলিসাধনার্থ নিযুক্ত করিবে। লোভহীন, সত্যবাদী, দেব ব্রাহ্মণ পূজক, সংযমী ও পথ্য ভোক্তা ব্যক্তিদিগকে রসায়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ধনবান, বদান্য, সর্ব উপকরণবান্ ও গুরুবাক্যরত ব্যক্তি ধাতুসাধনে প্রশস্ত। আর ঔষধ আহরণের জন্য, সকল ঔষধের নামজ্ঞ, শুচি, বঞ্চনাহীন ও নানাবিষয়, ও ভাষাজ্ঞানশালী ব্যক্তিই উপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

শুচি, সত্যবাদী, আস্তিক, বুদ্ধিমান্ ও নিঃসংশয় চিত্ত ব্যক্তির রসক্রিয়া সর্বদাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সাধক পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সুসিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাকেই রসসিদ্ধ বলা যায়। রসসিদ্ধ মানব দাতা, ভোগী, অযাচক, জরামুক্ত, জগৎপূজ্য, দিব্যকান্তি ও নিত্যসুখী হইয়া থাকে।

রাজবৈদ্যের লক্ষণ

যিনি সমগ্র রস শাস্ত্র সম্যগ্ রূপে অধ্যয়ন করিয়া পারদের অষ্টাদশ সংস্কার, যাবতীয় রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ প্রভৃতি রস চিকিৎসার উপকরণ সকলের শোধন, জারণ, মারণ, ভস্মীকরণ দ্রাবণ ও স্বত্বপাতনাদি কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া উহাদের প্রয়োগ দ্বারা রোগাক্রান্ত জনগণের রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ তিনিই যথার্থ রাজবৈদ্য-পদবাচ্য।

রসসিদ্ধ

(১) নন্দিরাজ, (২) শুক্রাচার্য্য (৩) আদিম (৪) চন্দ্রসেন (৫) রাবণ, (৬) রামচন্দ্র (৭) কপালী (৮) মত্ত (৯) মাণ্ডব্য, (১০) ভাস্কর (১১) সুরসেন (১২) রত্নকোষ (১৩) শম্ভু (১৪) সাত্বিক (১৫) নরবাহন (১৬) ইন্দ্রদ (১৭) গোমুখ

(১৮) কাম্বলী (১৯) ব্যাড়ি (২০) ব্রহ্মজ্যোতি (২১) দণ্ডী (২২) সোমদেব (২৩) নাগার্জ্জুন (২৪) সুরানন্দ (২৫) নাগবোধী (২৬) যশোধন (২৭) খণ্ড (২৮) কাপালিক (২৯) ব্রহ্মা, (৩০) গোবিন্দ (৩১) লম্বক (৩২) হরি (৩৩) মন্থানভৈরব (৩৪) নৃত্যনাথ (৩৫) বাগভট (৩৬) অনন্তদেব (৩৭) ভুদেব (৩৮) প্রভাকর (৩৯) জীবরাম কালিদাস (৪০) ঘনানন্দ (৪১) নরেন্দ্র নাথ (৪২) সদানন্দ। ইহারা সকলেই রসসিদ্ধ অর্থাৎ ইহারা রসের সকল প্রকার সংস্কার বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

মকরধ্বজ পাক বিধি

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে মকরধ্বজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মহৌষধ। বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রকৃতভাবে প্রস্তুত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এবং সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে যে সমস্ত আয়ুর্বেদীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারি কোনটীতেও প্রকৃত পাকবিধি লিখিত হয় নাই। অধিকাংশ চিকিৎসাব্যবসায়ী ইচ্ছাসত্ত্বেও পাকবিধির অজ্ঞতাহেতু উহা পাক করিতে কৃতকার্য্য হন না। মকরধ্বজ পাকশিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য নিম্নে রসসিন্দুর ও মকরধ্বজের পাকবিধি লিখিত হইল।

রসসিন্দুর পাক বিধি

মকরধ্বজ প্রস্তুতের বোতলের তলদেশ সমতল হওয়া আবশ্যক। বাজারে সচরাচর যাহাকে গেঁটে বোতল কহে তদ্রূপ বোতলই মকরধ্বজ পাকে প্রশস্ত। অনেক বোতলের তলদেশ সমান নহে কুব্জভাবে উত্থিত। এতদৃশ বোতলে রসসিন্দুর পাক করা উচিত নহে। যে বোতলের গলদেশ দীর্ঘ্যগ ভাবে উত্থিত হইয়া মুখনলের সহিত মিলিত হয়, তাদৃশ বোতল মকরধ্বজ পাকের উপযোগী নহে। এবং যে বোতলের গলদেশ সরল রেখা ক্রমে উত্থিত হইয়া মুখনলের সহিত মিলিত হইয়াছে সেইরূপ বোতল

মকরধ্বজ পাকের উপযোগী। মোটের উপর বোতলটি যেন বেশ দৃঢ় হয়। তাহার পর ঐ বোতলে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হইবে। মৃত্তিকা যেন বেশ আঁঠাল হয়। অল্প পরিমাণে তুষ ও পাটের কুচির সহিত মৃত্তিকাকে সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিতে হইবে। বোতলের তলদেশে সামান্য প্রলেপ দিয়া উহার সর্বাঙ্গে দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপের উপর সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহার উপর পুনরায় প্রলেপ দিবে। বোতলের গলার ও গলদেশের সন্ধিস্থলে পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দেওয়া শেষ হইলে প্রলেপটিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ সময়ে যদি প্রলেপ ফাটিয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় অল্প মৃত্তিকা দ্বারা ঐ ফাটলগুলি পূর্ণ করিয়া দিবে। পারদ ও গন্ধকের সুসিদ্ধ কজ্জলী এইরূপ মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে রাখিবে। ইহার পর একখানি খড়ির দ্বারা ছিপি প্রস্তুত করিয়া উহার মুখে লাগাইবে। ছিপিটি এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন বোতলের মুখে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে। তাহার পরে এরূপ একটি হাঁড়ি গ্রহণ করিবে যাহার মধ্যে বোতলটি রাখিলে ঐ বোতলের চারি পার্শ্বে অন্ততঃ চারি আঙ্গুলি ফাঁক থাকে। অতঃপর ঐ হাঁড়িটির তলদেশের ঠিক মধ্যস্থলে কনিষ্ঠ অঙ্গুল প্রবেশ করিতে পারে এরূপ একটি গোলাকার ছিদ্র করিবে ঐ কর্দ্দমলিপ্ত বোতলটী ছিদ্রের উপর বসাইয়া হাঁড়িটী সুশুষ্ক বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। এই যন্ত্রের নাম বালুকা-যন্ত্র। তাহার পর এই বালুকাযন্ত্রটী চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া কাষ্ঠাগ্নিতে মৃদু জ্বালে পাক করিবে এবং কজ্জলী দ্রবীভূত হইলে জ্বালের মাত্রাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ছিপিটি খুলিলে কজ্জলী দ্রবীভূত হইয়াছে কি না দেখিতে পাইবে। কজ্জলী উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছিপির পার্শ্ব দিয়া অল্প অগ্নি বাহির হইতে থাকিলে একটি লৌহনির্ম্মিত শলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দারা উক্ত বোতলের গলদেশে সঞ্চিত দ্রবীভূত অংশ মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিয়া ছিপিটী শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে বোতলের তলদেশ প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়াছে, তখনি একটি পরিষ্কার শীতল লোহার শলকা বোতলের তলদেশ পর্য্যন্ত দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া উঠাইয়া দেখিবে যে উহার তলদেশে কালি ধরিয়াছে কিনা যদি শলাকায় কালি ধরিয়া থাকে তবে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিবে। এই সময়ে জ্বালের পরিমাণ কিছু মৃদু হওয়া উচিত। তাহার পর পুনরায়

উক্ত শীতল শলাকাটিকে বোতলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উঠাইয়া দেখিবে যে উহার প্রান্তদেশে ছাই লাগিয়াছে কি না। উক্ত ছাই এর রঙ যদি সাদা হয় তাহা হইলে আর জ্বাল দিবে না। ইহার পর যন্ত্রটীকে নামাইয়া যাবৎ সুশীতল না হয় তাবৎ রাখিয়া দিবে। পাত্রটি শীতল হইলে বোতলটি বাহির করিয়া ভাঙ্গিবে এবং উহার উর্দ্ধ সংলগ্ন বাসার্কসদৃশ রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়।

মকরধ্বজের কজ্জলী

মকরধ্বজ পাক বিধি রসসিন্দুর পাকের ন্যায়। কিন্তু রসসিন্দুর অপেক্ষা মকরধ্বজ পাক দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। ইহা পাক করিতে অন্ততঃ তিন দিন সময় ক্ষেপণ আবশ্যক। ইহার পাক প্রথমে মৃদু জ্বালে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জ্বালের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া পাকের শেষ অবস্থায় জ্বাল পুনরায় মৃদু করিতে হয়।

মকরধ্বজ পাক বিধি

গ্রাসন শক্তিবিশিষ্ট পারদ, স্বর্ণের নিরুত্থ ভস্ম ও শোধিত গন্ধক একত্রে প্রস্তর খলে নিক্ষেপ করিয়া মাড়িয়া কজ্জল সদৃশ মসৃণ করিয়া উহার সহিত ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মর্দ্দন করিবে উহা তাহার পর শুষ্ক করিয়া বোতল মধ্যে পুরিবে।

স্বর্ণ-ভস্মের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতও কজ্জলী প্রস্তুত কালে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, সীসক, দস্তা, বঙ্গ

পিতল ও কাংস্যের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া মতে বিশুদ্ধ করিবে। তাহার পর উখা দ্বারা ঘসিয়া উহাদের চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতুসকলের খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ পাওয়া যায়। উক্ত চূর্ণ সকলকে ১ দিন ত্রিফলার ক্বাথে ভাবনা দিয়া লইয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর স্বর্ণ ভস্মের ৪র্থ বিধি অনুসারে উহাদের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া ১ বার গজপুটে পাক করিলেই উহাদের অতি বিশুদ্ধ নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

ইতি রসচিকিৎসা নামক মহাগ্রন্থের
প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ভারতের মাসিক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শীঘ্রই ঐগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

(১৬) আয়ুর্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬৲

(১৭) বৈদ্যকবৃত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৲ —ঐ হিন্দি ভাষায় ২৲

(18) A short history of Ayurvedic Bengal. Rs I0/-

(19) A short history of Ayurvedic Ceylone. Rs 6/-

(20) Natuιe of Ayurvedic Research. Rs. I0/-

21. A short history of Ayurvedic Education and Practice in India. Rs 10/-

22. A short history of Prevιdic Ayurveda. Rs. I0/-

23. A short history of Ayurveda from Bharadwaj to Bhattara Harichandru. Rs 10/-

24. A short history of Ayurveda from Bhattara Hari Chandra to Bhudeb Mukherjee. Rs. I0/-

25. A short history of Ayurveda from Bhudeb Mukherjee up to the death of Jadabji Trikamji. Rs. 10/-

26. Ayurvedic Luminaries of India vol. 1 Rs. I0/-

27. A Treatise on Ayurvedic Materia Medica. vol. I Rs. 10/-

28. Science of Pulse. Rs. 10/-
2.9 Science of Piognosis. Rs. I0/-
30. Principles of Indian Hygiene Rs. I0/-
3I. Essays & Thoughts on Ayurveda. vol I. Rs. I0/-
৩২। ভারতীয় রসবিদ্যা—১০৲
৩৩। সরল আয়ুর্বেদ শিক্ষা ৪৲
৩৪। ভারতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসার ইতিহাস ৪৲
৩৫। আয়ুর্বেদস্য শিক্ষায়াঃ ইতিহাসঃ—৮৲
৩৬। ম্যালেরিয়া জ্বরস্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ২৲
৩৭। তমলুকে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনে রস-তন্ত্র বিভাগের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণ মূল্য ১৲
৩৮। নিখিল বঙ্গীয় অষ্টম আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের মূল সভাপতির প্রদত্ত ভাষণ—।০
39. Kaviraj Gangadhar Roy. Rs. 4/-
40. Chakrapani Datta. Rs. 2/-
৪১। আধুনিক রোগের আয়ুর্বেদীয় নিদান ১ম খণ্ড ৩৲
42. Dhanvantariya Sampradaya Rs. 6/-
43. Atreya Samprayadaya Rs. I0/-
৪৪। বৈদ্যক জ্যোতিষ—৩৲
৪৫। প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান—৩৲
৪৬। জ্যোতিষ কূট—১৲
৪৭। অষ্টোত্তরীয় রাজযোগ—৩৲
৪৮। অষ্টোত্তরীয় দুর্যোগ—৩৲

৪৯। ভারতীয় সামুদ্রিক বিজ্ঞান—৬৲
৫০। শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা ও ফলিত জ্যোতিষ মতে তাহার বিচার ৪৲
৫১। জ্যোতিষ প্রবেশ ৪৲
৫২। ফলিত জ্যোতিষের নবগ্রহ—৩৲
৫৩। অষ্টোত্তরীয় দশা বিচার পদ্ধতি—২৲
৫৪। বিংশোত্তরীয় দশা বিচার পদ্ধতি—২৲
৫৫। "সুশ্রুতীয় সুশ্লোকশতকম্"—২৲
৫৬। চরকীয় সুশ্লোকসহস্রম্—৬৲
৫৭। বাগভটীয় সুশ্লোকশতকম্—২৲
৫৮। সরল সিদ্ধান্ত নিদান—৬৲
৫৯। দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান ১ম খণ্ড, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রতি খণ্ড— ৪৲
৬০। চরকামৃতবর্ষিণী টীকা ৫০৲
৬১। সুশ্রুতামৃতবর্ষিণী টীকা ২৫৲
৬২। সরল চরক সংহিতা—৬৲

রসচিকিৎসায় কথিত রসৌষধি সকল রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবনের "আয়ুর্ব্বেদ গবেষণা মন্দিরের ও রসশালায় অতিশয় বিশুদ্ধরূপে নির্ম্মিত হইয়া বিক্রিত হয়। নিম্নে উহাদের মূল্য তালিকা প্রদত্ত হইল। বিশুদ্ধ ঔষধের অভাবে অনেকে রসচিকিৎসায় শাস্ত্রোক্ত সুফল লাভ করিতে পারেন না। সেইজন্য আমাদের এই উদ্যম। আশাকরি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট এই বিজ্ঞাপনকে পাঠকবর্গ অন্য দৃষ্টিতে দেখিবেন না।

১। মকরধ্বজ (সাধারণ)	৮৲	৭। তাম্রসিন্দুর	১৬৲
২। ঐ ষড়গুণ বলি জারিত	১৬৲	৮। রসতালক	১৬৲
৩। ঐ সিদ্ধ	৩২৲	৯। শ্বেতরস	১৬৲
৪। স্বর্ণসিন্দূর	৮৲	১০। পীতরস	১৬৲
৫। রসসিন্দূর	৪৲	১১। কৃষ্ণ রস	১৬৲
৬। তালসিন্দূর	১৬৲	১২। রসভস্ম	১৬৲

১৩। রসপুষ্প ১৬৲
১৪। রস মাণিক ২৲
১৫। রস মাণিক্য ৩৲
১৬। শোধিত পারদ ২৲
১৭। হিঙ্গু লোথ পারদ ২৲
১৮। কজ্জলী ৪৲
১৯। গন্ধক কজ্জলী ৮৲
২০। স্বর্ণবঙ্গ ৪৲
২১। গন্ধক ॥০
২২। শোধিত বংশপত্র হরিতাল ১৲
২৩। ঐ বকদাল ॥০
২৪। গোদন্ত ॥০
২৫। ঐ বংশপত্র হরিতাল ভস্ম ১৬৲
২৬। ঐ বকদাল ৮৲
২৭। গোদন্ত ৮৲
২৮। বংশ পত্র তাল সত্ব ৬৪৲
২৯। শোঃ লাল দারুমুজ ১৲
৩০। ঐ শ্বেত ১৲
৩১। বঙ্গভস্ম ৪৲
৩২। তাম্রভস্ম ৪৲
৩৩। ঐ অমৃতীকৃত নিরুত্থ ৮৲
৩৪। যশোদ ভস্ম ৪৲
৩৫। কাংস্য ৩৲
৩৬। পিত্তল ৩৲
৩৭। লৌহভস্ম সাধারণ ১৲
৩৮। পাঁচশতপুটি ৪৲
৩৯। ঐ সহস্র পুটি ৮৲
৪০। কান্তলৌহ সাধারণ ৮৲
৪১। ঐ বহুপুটিত ১০৲
৪২। অভ্র সাধারণ ২৲
৪৩। ঐ ১০০ পুট ৪৲
৪৪। ঐ ৫০০ পুট ৮৲
৪৫। সহস্র পুট ১৬৲
৪৬। ঐ এক পুটি ১৲
৪৭। শঙ্খ ১৲
৪৮। নাভি শঙ্খ ১৲
৪৯। কড়ি ॥০
৫০। মুক্তা সাধারণ ৬৪৲
৫১। ঐ শ্রেষ্ঠ ৮০৲
৫২। প্রবাল ২৲
৫৩। সমুদ্র শুক্তি ১৲
৫৪। বৈক্রান্ত ৬৪৲
৫৫। হীরক (প্রয়োজনানুসারে) রতি ২০০৲
৫৬। হিঃ শোধিত ১৲
৫৭। কস্তুরী ১৬৲
৫৮। স্বর্ণ ২০০৲
৫৯। স্বর্ণ মাক্ষিক ২৲
৬০। রৌপ্য ৮৲
৬১। রৌপ্য মাক্ষিক ২৲
৬২। মণ্ডুর ২৲
৬৩। হীরাকস ১৲
৬৪। রসাঞ্জন ১৲
৬৫। শিলাজতু ১৲
৬৬। অমৃত ১৲
৬৭। শোঃ জয়পাল ৪৲